আমাদের প্রথম যৌবনের দিনগুলিকে স্মরণ করে'

মৃণাল সেন

প্রীতিভাজনেষু

১

প্রত্যূষ

গ্রাম সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতা ভেঙে নতুন মহানগরীর জন্ম হল। নাগরিক সভ্যতার সমস্ত লক্ষণ নিয়ে তার স্বপ্রকাশ। প্রশস্ত রাজপথ, আকাশ-ছোঁয়া ইমারত, গঙ্গার ব্রিজ, যানবাহন, মহানগরীকে রাজধানীতে পরিণত করল। সভ্যতার সঙ্গে সৃষ্টি হল কালীমন্দির, চটকল, রক্ষিতাপল্লী, ভাঁটিখানা, আর বস্তি।

বস্তুত এই শহর সভ্যতার লক্ষণ ও দুর্লক্ষণ নিয়ে জাঁকিয়ে বসল। দারিদ্র্য, ধনের আস্ফালন। রৌপ্যচক্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন এক সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হল।

কিন্তু গ্রাম ভেঙে শহরের পত্তন হলেও গ্রামীণ মনগুলি রয়ে গেল। শহর বাসের উপকরণ জমা হল তার শদর দরজায়, অন্দরমহলে রইল সেই গ্রামীণ সত্তা। শহুরেপনা মানুষের ভঙ্গি হল, তার মনপ্রাণকে অবগাহন করাতে পারল না। বাইরের জীবনে মানুষ শহুরে হল—আপিসে-আদালতে, রেস্তোরায়, পানশালায়, সিনেমা-জলশায়, পার্কে-ময়দানে, রেসকোর্সের মাঠে। কিন্তু ঘরোয়া জীবনরঙ্গে সে আটকে রইল গ্রাম্য-ভাবালুতায়। সে এখনো প্রকৃতির রস পান করে, যে গ্রাম-জীবনকে সে দেখেনি তার রোমান্টিকতায় সে নেশাগ্রস্ত, শরৎবাবু রইলেন শোবারঘরের শেল্‌ফে। রইল তার নামাবলী, তার তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যার শাঁখ-বাজানো, তার মাদুলি-তাবিজ-তাগা। আর বিশুদ্ধ পঞ্জিকা!

শহর-কলকাতা বলে প্রকৃত অর্থে কিছু রইল না। শহরকে সে ভাঙল, পুবে-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে। এই কয়েকটি পাড়ায় কলকাতা হল খর্বিত। উত্তর-কলকাতার যুবকের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার যুবকের পার্থক্য হল মৌলিক। পাড়া-এলাকার বেড়া টেনে গ্রামের মতোই এক-একটি অঞ্চল চিন্তাদর্শনে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।

আমাদের এই কাহিনীর যবনিকা উঠল উত্তর-কলকাতার এমনি একটি এলাকা নিয়ে। একটি বিশেষ এলাকার কাহিনী হলেও এটি উত্তর-কলকাতার যে কোনো একটি পল্লীর কাহিনী।

বাঁকুলি কলোনি। আসলে এটা কলোনি নয়। এবং বাঁকুলি-ও এর নাম নয়। তবু লোকমুখে এই নাম চলে আসছে। প্রথমটায় হয়তো ব্যঙ্গ করেই

বলা হত, কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যঙ্গের ধারটুকু ক্ষয়ে গিয়ে প্রবীণ নবীন এবং কনিষ্ঠদের মধ্যে এই নামই প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

বলাবাহুল্য বাঁকুলি কোনো দেবতা নন। দেবতারা এখনো আমাদের কাছে ব্যঙ্গের বস্তু হননি। বাঁকুলি পদবী। অনুগ্রহনারায়ণ বাঁকুলি। এই দুর্মূল্যের বাজারে নেহাত দেবীপ্রসাদেই বাঁকুলি মশায় শরীরটাকে ছোটখাটো গন্ধর্বমাদন পর্বতের মতো রক্ষা করে চলেছেন। যুদ্ধের বাজারে দুধেজলে মিশিয়ে প্রচুর টাকা রোজগারের স্থায়ী কীর্তি রক্ষা করতেই এই তিনতলা ফ্ল্যাটগুলি গড়ে উঠেছে। সব বাড়িগুলির নম্বর ১৭২ থেকে শুরু করে এক দুই করে বাই নম্বর ৫৩-এ গিয়ে ক্ষান্ত দিয়েছে। ছোটখাটো এক পল্লী বিশেষ। তবে স্বায়ত্তশাসন এবং কর্তাতন্ত্রের মহান সম্মিলন। চণ্ডীমণ্ডপও আছে বইকি। বাড়িগুলির পেছন দিকে দক্ষিণধারী সামান্য পতিত জমি। একদা কার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরির জাদুঘরের ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন আছে এখানে-সেখানে। আর একটি বাগান শবজির, এখন কয়েকটি গতযৌবন কলাগাছের অস্তিত্ব বিরাজ করছে। সন্ধ্যের দিকে ছোটোরা খেলা করে এখানে। হালে-বখা যুবকেরা লুকিয়ে সিগারেট খায় এখানে। এবং দক্ষিণধারী জানলাগুলো মরা বিকেলে খুলে যাবার পর হঠাৎ সিনেমার হিট্ গানে বাতাস প্রগল্ভ হয়ে ওঠে।

অন্য কলোনির মতো বারোয়ারি পুজোর বৈশিষ্ট্যও এখানে উপেক্ষণীয় নয়। সে সব সময়ে কলোনি এক জাতি এক প্রাণ এবং একতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রতিপত্তি অনুযায়ী চাঁদার হারের সঙ্গে আপনার কর্তালিও নির্দিষ্ট। প্রেসিডেণ্ট কি সেক্রেটারি সেই তুলাদণ্ডে বিচার হয় বলে কারুর সমালোচনা করার থাকে না।

কলোনির জন্ম-ইতিহাসের পায়ে পায়ে সাংস্কৃতিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে। পিছনদিকের মাঠে চাঁদোয়া টানা হয়। মঞ্চ তৈরি হয়। ভাড়া করা চেয়ার আসে। স্ত্রীপুরুষের আসন দড়ি বেঁধে আলাদা করে দেয়া হয়। গেটে থাকে ভলাণ্টিয়াররা। বুকে ঝোলানো থাকে ব্যাজ। নিয়মানুবর্তিতার চূড়ান্ত। সভাপতি। প্রধান অতিথি। মালা আসে। মাইক বিকেল থেকেই হ্যালো ওয়ান টু থ্রি করে যাচাই করে রাখা হয়। দরকার হলে কিংবা অদরকারেও মাইক থেকেই নির্দেশ দেয়া হয়। 'দুলাল তুমি ডায়াসের পেছনে এসো।' 'ছেলেরা গোলমাল কোরো না।' তারপর ইচ্ছে হলে কেউ কেউ মাইকে সংগীত চর্চাও শুরু করে। অর্থাৎ সভা শুরু হবার আগে সোরগোলের কোরাসের

মতো এগুলির দরকার। যাকে বলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সভাপতি আনতে চলে গেছে কয়েকজন। 'ছেলেরা, এখন চোর-পুলিশ খেলবার সময় নয়।' অবাধ্য ছেলেদের শায়েস্তা করতে হয়। পাড়ার মেয়েরা বেনী দুলিয়ে শাড়ি ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভলান্টিয়াররা এদের নিয়েও ব্যস্ত। 'ও দুলালদা জোসনাদা'। ওরাও ভীষণ ব্যস্ত- সমস্ত হয়ে খবরদারি করে বেড়াচ্ছে। 'বড় ফাজিল হয়েছিস। এক চড় খাবি।' দাদাগিরি করতে হয়। ফিসফিস করে কখনো কি বলে, হাসি, বেলোয়ারি চুড়ির ঘায়ের মতো। তারপর সভাপতি আসে। প্রধান অতিথি। সম্পাদক মাইকে তাদের স্বাগত জানিয়ে আসন অলংকৃত করতে অনুরোধ করেন। তারপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কবিতা, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক। গান। পাড়ার গাইয়ে, বেপাড়ার। রেডিও আর্টিস্ট। শ্যামা সংগীত। কাওয়ালি। রবীন্দ্র সংগীত। মাউথ অর্গান। প্যারডি। 'আর একটা, আর একটা—' 'নাম রেখেছি বনলতা।' এবং একই ট্রাডিশন অধিবাসীরা রক্ষা করে চলেছে।

এবার সেই পুণ্য ট্রাডিশনের আকাশে বুঝি-বা কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। কলোনির অভিন্নহৃদয় সুখী পরিবারে ভাঙনের দূত দেখা দিল।

ব্যাপারটা ঘটল কালীপুজো নিয়ে। করালবদনা কালিকার মাহাত্ম্য এ যুগে কেউ সোচ্চারে অস্বীকার করতে পারে, এ কথা আগে কে ভেবেছিল। অথচ তাই সত্যি হল।

নতুন ভাড়াটে এল ১৭২।৫-এ। দে। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেন্ট। শক্ত সমর্থ দুই মেয়ে। এবং জাঁদরেল রাশিয়ান চেহারার স্ত্রী। প্রায় একমাস হল। লরিতে করে মাল আর ট্যাক্সিতে মানুষ এক বিকেলে নামল বাড়ির সামনে। পাড়ার যুবসঙ্ঘ কৌতুক নিয়ে দেখল। ঠাণ্ডা নির্জীব মতো প্রবীণ ভদ্রলোক। অসম্ভব ঢ্যাঙ্গা, একটু কুঁজো মত। তার পেছনে দারোগা মেয়েমানুষ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রমাণ সাইজ বাঙালি কুলবধূর কলংক। এবং দুই মেয়ে। একটি বছর বাইশ-তেইশ। শ্যামল, কচি আমপাতার রঙ, গায়ের চামড়া তেলালো। বেঁটে, কিন্তু আঁটসাঁটো গড়ন। অন্যটি বছর সতেরো কি আঠারোর। অপূর্ব পুরুষালী বেশবাস। ট্রাউজার পরে, শার্ট পরে, শিখদের মতো চুলে বিনুনি। বেত্রদণ্ডের মতো শরীর। ট্যাক্সি থেকে নেমে কোনো দিকে চাওয়া নেই, জাঁদরেল মহিলা শব্দ করে উঠে গেলেন দোতলায়। ভদ্রলোক রইলেন মালপত্তরের জিম্মায়। চেয়ে চেয়ে দেখল তরুণ সমাজ। চূড়ান্ত আতিথেয়তা দেখাতেও তাদের আপত্তি

ছিল না। খুচরো জিনিসগুলি কি ধরাধরি করে নিজেরাই নামিয়ে দিতে পারত না ট্রাক থেকে! কাছাকাছি দোকান কি বাজারে জরুরি খবরও কি পরিবেশন করতে পারত না! পারত। সেই যে সেবার ১৭২।৩৫-এ বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন পুত্রবধূ, নাতিনাতনিদের নিয়ে, তারা কি উদার হাত বাড়িয়ে দেয়নি! কিন্তু, এঁরা যেন কেমন। সাহায্য চান না, নেনও না বুঝি। কিন্তু দু' এক টুকরো মুখের কথা খরচ করতেও কি খুব পরিশ্রম লাগে।

তরুণেরা মুখ ব্যাজার করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। যেন চোখের সামনে অপ্রীতিকর সিনেমার এক দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়েছে।

না। এক মাস ধরে কারুর সঙ্গে মিশলেন না ওঁরা। দে মশায় আপিসে গেলেন। মেয়েরা ইস্কুলে কলেজে। কোনো কোনোদিন দুপুরে ভদ্রমহিলাও ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়তেন। তারপর ও বাড়িতে কত ছেলে ছোকরা এল। কলেজের। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় সৎজন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ও বাড়ির আসরের শব্দ চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়ার মতো কটকটে চোখে লক্ষ্য করেছে এ পাড়ার যুবশক্তি।

পাড়ায় থাকবে অথচ পাড়ার জীবনের শরিক হবে না, এ কেমন কথা। ওদের নিদারুণ ঔদাসীন্য অবজ্ঞার জ্বালা হয়ে বুকে বাজত তরুণদের। একই কলোনিতে আমরা থাকি, একই আকাশ, একই বাতাস, একই দোকান থেকে খাবার-কেনা, বাজারে-যাওয়া। আমরা যখন বেগুনের দর করেছি তোমরা তখন পাশে দাঁড়িয়ে উচ্ছে কিনেছ, গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে। তবে প্রাণে-প্রাণে হবে না কেন। কোনোদিন রাস্তাঘাটে দেখা হয়েছে, আমাদের মুখে চিনি-চিনি হাসি ফুটে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই, তোমাদের মুখ বিকারহীন।

এই অসন্তোষ ধিকিধিকি করে জলছিল প্রাণে।

তারপর কালীপুজোর দিন এগিয়ে এল।

সুশোভন, দুলাল, পরিমল, জ্যোৎস্না গেল চাঁদার খাতা নিয়ে। এই ফ্ল্যাটে প্রথম পদার্পণ। কড়া নাড়ল। বেরিয়ে এল বড় মেয়ে অপূর্ণা। ভুরুর ধনুক এঁকে তাকাল ওদের দিকে, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, 'কি চাই?'

'চাঁদার জন্যে এসেছি—' সুশোভন বলল।

'কিসের চাঁদা?'

'কালীপুজোর।' দুলাল পরিষ্কার করল।

অপূর্ণা ভেতরে চলে গেল।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল ওরা। চাঁদা নিতে গেলে অপেক্ষা করতে হয়।

'কে? কে তোমরা?' মানুষটার আগে ভেতর থেকে গলাটাই ছুটে এল, তারপর দৃশ্যমান হলেন মিসেস দে। ওরা যেন জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়বে এমন বিশ্রী সন্দেহে দু'বাহু দিয়ে দরজা আটকে দাঁড়ালেন তিনি।

সুশোভন বলল, 'আমরা চাঁদা নিতে এসেছি।'

মিসেস দে যেন জীবনে এই নতুন শব্দ শুনলেন। 'চাঁদা! কিসের চাঁদা?'

'কালীপুজোর।'

'না না। চাঁদা ফাঁদা হবে না।' মিসেস দে'র গলায় বিশ্রী আওয়াজ উঠল; 'যাও, চলে যাও এখান থেকে। বাড়ি চড়াও হয়ে চাঁদা চাইতে এসেছে। যত সব ইয়ে—'

'দেখুন আমাদের সার্বজনীন পুজো...'

'চুপ করো। সার্বজনীন নয়, সর্বজনীন।' শিক্ষিকার গলায় তাড়া দিলেন মিসেস দে। 'বললাম তো ওই সব কালীপুজোর চাঁদা ফাঁদা আমরা দিইনে।'

'তাহলে আপনি চাঁদা দেবেন না!'

'বললুম যে, না।'

সুশোভন শেষ চেষ্টা করল। বলল: 'রণজিৎদা আমাদের পাঠিয়েছেন।'

মিসেস দে নাক উঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন: 'কে রণজিৎদা?'

'এডভোকেট রণজিৎ সিকদার। আমাদের পুজো কমিটির সেক্রেটারি।'

'বেশ তো। বলো গিয়ে আমরা চাঁদা দেবো না।'

ছেলেরা সিঁড়ি দিয়ে নামল।

জ্যোৎস্না এতক্ষণে মুখ খুলল। 'আচ্ছা দেখা যাবে। বোমা মেরে...'

'এই, এই ছোকরা, শোনো—' মিসেস দে তখনো সিঁড়িতে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেনি। তরতর করে নেমে এলেন ওদের মধ্যে। 'কি কি বললে তুমি? বোমা মেরে, কি বললে...?'

জ্যোৎস্না ঘাবড়ে গিয়েছিল। সাহস করে বলল: 'আপনাকে বলিনি!'

'আবার মিথ্যে কথা। তুমি না ভদ্রলোকের ছেলে। বস্তির গুণ্ডাদের মতো কথা তোমার। ছি ছি।'

জ্যোৎস্না কী বলতে গেল, তার আগেই চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস দে: 'আর

একটি কথা নয়। আবার কোনো কথা বললে আমি থানায় রিপোর্ট করব। যাও।'

'তুই ওকথা বলতে গেলি কেন?' নিচে নেমে জ্যোৎস্নাকে চেপে ধরল সকলে। 'তুই তো একটা কালীপটকা হাতে করে পোড়াতে পারিসনে। বোমা মারবার ওস্তাদি হল কেন তোর?'

জ্যোৎস্না বলল: 'আমি কি আর সত্যি সত্যি বোমা মারতাম। আমি ভয় দেখাচ্ছিলাম।'

সুশোভন বলল, 'যে নিজে ভয় পায় অন্যকে ভয় দেখানোর তার অধিকার নেই।'

'নে বাবা। ঘাট হয়েছে।' জ্যোৎস্না নরম হল। 'কলিকালে ভালো করতে গিয়েও মন্দ হয়।'

'ভয় দেখিয়ে ভাল করা যায় না।' সুশোভনই উত্তর দিল।

'তুই থাম। গান্ধীজির মতো কথা বলছিস। মাইরি ভালো লাগে না।' জ্যোৎস্না বলল।

'বেশ তো দোষ স্বীকার কর।'

'করছি। হল তো?'

ঠিক হল এ ঘটনার কথা ওরা ছাড়া কেউ জানবে না। চাঁদা না-দেয়া দোষ হতে পারে তাই বলে বোমা-মারার কথা বলা ঠিক হয়নি। পাড়ার লোকেরা শুধু এইটুকু জানল নতুন ভাড়াটেরা চাঁদা দেননি। পাড়ার ভালোমন্দ সুখ-দুঃখের সঙ্গে ওঁদের কোনো যোগাযোগ নেই। এবং পুজোর প্রসাদ দিতে যাওয়ায় মিসেস দে যে ভাবে ছেলেদের তাড়িয়ে দিলেন তাতে করে এইটেই প্রমাণ হল তাঁরা অত্যন্ত অসামাজিক দাম্ভিক লোক। প্রসাদ তুমি গ্রহণ না করতে পারো, তাই বলে 'ওগুলি বিষ এবং সাক্ষাৎ কলেরার জার্ম' এমত বলাটা সমীচীন নয়। ধর্ম এবং বিশ্বাসকে আঘাত দেয়া কখনো উচিত নয়। বেশ। ধর্ম যদি না-ই মানো, আমরা মানতে বলছিনে। যার যার ধর্ম নিজের কাছে। কিন্তু পরস্পরের মেলবার একটা উপলক্ষ্যও তো চাই। সামাজিকতা। আর আনন্দের এই সম্মিলনে সকলের শুভেচ্ছা চাই, সহযোগিতা চাই। তাছাড়া অনেকদিনের ঐতিহ্য, সারা বছর এই উৎসবের জন্যে থাকে প্রতীক্ষা। আরো দশটা পল্লীর মতো এই কলোনির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু খাওয়া দাওয়া আর গতানুগতিক জীবনধারণ নয়, উৎসবে-উচ্ছ্বাসে বিশুদ্ধ আবেগের প্রকাশ।

মান্যগণ্য অতিথি আসে, পাড়ার নাম হয়, খবর কাগজে ছবি ছাপা হয়।

পাড়ার জীবনাকাশে সৃষ্টিছাড়া এই পরিবারের মানুষগুলি দূরের থেকে ব্যথাতুর কৌতূহল বিস্ময় নিয়ে দিনের পর দিন চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে চোখে ওরা পুরনো হল, অভ্যস্ত হল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হল না। পুরুষালী পোশাকে বই হাতে ছোট মেয়ে অজানা ইস্কুলে বেরিয়ে যায়। ফেরে পাঁচটায়। ওর চলাফেরা টর্পেডোর মতো। সঙ্গে হাঁটতে গেলে দৌড়তে হবে নিশ্চিত। গণ্ডারের খড়্গের মতো নাক উঁচু করে চলে। শোনা যায় কোন্ আখড়ায় নাকি লাঠিখেলা শেখে।

দুলাল বলল, 'ও নিশ্চয় ট্রামে পুরুষ সিটে বসে।'

একদিন অনুসরণও করে দেখল ওরা। লেডিস সিটে-বসা পুরুষেরা ওকে দেখে ঠিকই জায়গা ছেড়ে দেয়। এবং মেয়ে-আসনের সুযোগ নিতে অজানা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

তবে পুরুষ সাজা কেন। পুরুষের সঙ্গে যখন সমানভাবে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারো না।

'আসলে মাইরি সেই দুধও খাব ঘোলও খাব অবস্থা। ঢঙ।' জ্যোৎস্না বলল।

বড মেয়ে অপূর্ণা আরো রহস্যময়ী। কলেজে যাওয়া-আসা ছাড়াও ওর বেরুনো অনির্দিষ্ট। কখনো একা, কখনো সঙ্গে দু' একজন ছেলে। তবে একটি ছেলেই প্রায় সময় ঘোরে ওর সঙ্গে। ট্রাউজার পরে, শার্ট গায়ে, পায়ে কাবলি। চুলগুলো কোঁকড়ানো, অগোছালো। কথা বলে খুব, তার চেয়েও বেশি হাত নাড়ে। আর ঘামে-ভিজে মুখ দেখে মনে হয় রাজ্যের সমস্যা তার মাথায়। এবং সেগুলি এখুনি-না-করলে নয় এমন! চলতে ফিরতে কেবল দরকারি কথা। অপূর্ণা দরকারি কথাগুলির ভারেই বোধ হয় মুখটাকে সবসময় ভারিক্কি করে রাখে। ওর জামাকাপড় শাদাসিদে, চুল কখনো পিঠের ওপর ছড়ানো, কখনো আলগা বেণীবন্ধনে জড়ানো। কেমন প্রতিমার মতো তেলতেলে চকচকে মুখ।

এই ছেলেটি রজত। অপূর্ণার সহপাঠী। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে দু'জনে। আলোচনার ঢেউ একেক সময় পাড়াকে উচ্চকিত করে তোলে। রজতের হাসি খেপামিভরা। মনে হয় ওর হাসির পেছনে একটা প্রকাণ্ড খোলা মাঠ লুকিয়ে রয়েছে।

ওরা কী কথা বলে? এত হাসি আসে কোথা থেকে? দীর্ঘ সময়েও

ওদের কথা ফুরোয় না, হাসির উৎস শুকোয় না। সন্ধ্যে থেকে একনাগাড়ে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত বকে যেতে ওদের ক্লান্তি নেই। রজতকে সিঁড়ি পর্যন্ত বিদায় দিতে এসেও অপূর্ণা দাঁড়িয়ে থাকে এবং কথার স্রোত অনর্গল ওদের ভাসিয়ে চলে। যেন মনে হয় সারারাত শুধু কথার জন্যে ওরা এম্নি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসি।' রজতের গলা শোনা যায়। বলেও দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কথা, কথার বন্যা। কখনো অপূর্ণার গলাও শোনা যায়। তারপর আরো একটি আধঘণ্টা নিঃশেষ হয়ে যায়। এবং যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই দু'জনে জোর করে পরস্পরের কাছে বিদায় নেয়।

এক-একদিন সামনের বাড়ির ছাদ থেকে বাইনকুলার লাগিয়ে লক্ষ্য করেছে সুশোভন। ওদের ঘরটা দেখা যায়। জানালার পরদা হাওয়ার লোভে সরিয়ে দেয় অপূর্ণা। জানলার ওপরে বসে। চুল ওড়ে, শাড়ির আঁচল। বাইনকুলারের ফোকাশে ওর মুখ, ওর শরীর, হাতের নাগাল পায় সুশোভন। কথাগুলি নয়। মনে হয় মেয়েটি তার সামনে বসে আছে, একেবারে চোখের পাতার উপর।

রজতকেও দেখে। খাটে বসে শুয়ে কখনো কাত হয়ে। ট্রাউজার পায়ের গোড়ালির ওপরে। জামার বোতাম খোলা। মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। কখনো জল, কখনো চা। কোনো সময় অপূর্ণা কাছে গিয়ে বইয়ের পাতা দেখিয়ে আঙুল নেড়ে কী বলছে। রজত কী উত্তর দিচ্ছে। কথা, হাসি। একেক সময় মনে হয় ওরা চুপ করে থাকতে জানে না।

একেক দিন চুপ করেও থাকে ওরা। খাটের দু'প্রান্তে দু'জনে বসে। কখনো পরস্পরের চোখের দিকে তাকায়। বাইনকুলারে সে চোখে ছোট ছোট ক্লান্তির তরঙ্গ ধরা পড়ে। একদিন, অবাক কাণ্ড। অপূর্ণার গলায় গান শুনেছে সুশোভন। সন্ধ্যার উদ্‌ভ্রান্ত বাতাসে ভেসে এসেছে গানের কলি। কখনো গুনগুন গানের মৌমাছি। কখনো সরব। কী গানটা যেন প্রিয় অপূর্ণার? 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' গলা হয়তো ভালো নয়, কিন্তু সুরগুলি যেন শরীর পেত ওর গানে।

ওরা কথা বলে, হাসে, গানও গায় এবং চুপ করেও থাকতে জানে। কিন্তু একদিনও কি কাঁদে না ওরা?

সেই রূপটাও একদিন চোখে পড়ল সুশোভনের। ওদের বাড়িটা সেদিন নির্জন। মিসেস দে কোথায় বেরিয়েছেন। অজানা ওর বাবার সঙ্গে। নিঃসঙ্গ ঘরে দু'জন মাত্র প্রাণী। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল ওরা। মাঝে মাঝে

উঠে যাচ্ছিল অপূর্ণা, কখনো জল কি চা আনতে। তারপর এক সময় হঠাৎ জানলার গরাদ ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল অপূর্ণা। বাইনকুলারে ওর চোখে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু দেখল সুশোভন। সত্যি বলতে কি সেদিনকার সে-কান্নার পেছনে গৌরব ছিল, বেদনার ঐশ্বর্য ছিল। যদিও সে-কান্নার মানে বুঝতে পারেনি সুশোভন।

সেইদিনই ওদের খুব কাছে আসতে দেখেছিল। ওর হাত ধরেছিল রজত, কী বলেছিল। তারপর সে-কান্নাও একসময় শুকিয়ে গিয়েছিল।

এই সমস্ত দৃশ্য এবং ঘটনাবলী সুশোভনের ইন্দ্রিয়কে আবিষ্ট রাখল। সন্ধ্যে হলেই ছাদে উঠে-আসা তার কাছে নেশার মতো হয়ে উঠল। খোলা আকাশ, দু একটি গাছের মাথা, ট্রামবাসের অদূর ঘর্ঘর, সন্ধ্যের অজস্র হাওয়া ইত্যাদি মিলিয়ে একটি জানলা যেন কৌতূহল বাসনা নিয়ে কানের কাছে অহরহ নূপুরের মতো বেজে উঠল। ছোটবেলায় অসুখের সময় সে একবার জানলার ধারে বসবার অনুমতি পেয়েছিল, অই জানলা ছিল তার বাহির-দেখার আনন্দ। কত রকমের লোক, কত হাঁকের ফেরিঅলা। আজ দৃশ্যের দর্পণে সবকিছু অস্পষ্ট মেদুর। কিন্তু শৈশবের সে হারানো জানলার কথা মনে করলে তার বুক ব্যথা করে ওঠে। অই জানালার সঙ্গে সেদিনকার অসুখকেও সে ভালোবেসে ফেলেছে। ছোটখাটো অসুখ ভাল লাগে তার। মাথাধরা গা ম্যাজম্যাজ নিয়ে চুপচাপ শুয়ে বসে হাই তুলতে। নতুন স্বাদে ভরে ওঠে। নিজেকে মনে হয় ইতিহাস বিখ্যাত এক সম্রাট। শুয়েশুয়ে সে রোদের রঙবদল ছাখে, পাড়া-প্রতিবেশীরা কে কখন কাজে বেরিয়ে গেল এবং সমস্ত পাড়ায় ছাপিয়ে-ওঠা মেয়েদের ঘরকন্নার শত অভিযোগ-আপত্তি, কোথায় ভাঙা কলে ঝরঝর জল পড়ছে, বাথরুমে চান করতে করতে কোনো মেয়ের সংগীতচর্চা। সম্রাটের স্তব্ধতায় সে শব্দের ঐকতান শুনত। সেই জানলা এখন দূরে সরে গেছে। কিন্তু দূর থেকে দেখারও যে এমন মিষ্টতা থাকতে পারে, কে জানত। এই জানলা হাওয়ায় মাধবীলতার ঝাড়ের মতো নড়ে, তার শিহরণ ফুল ফোটায়, দূরের থেকে উদ্ভিদ ও ফুলের গন্ধ নাকে এসে লাগে (মায়ের গায়ের গন্ধের মতো)। এ-দৃশ্য তার একার, তার আনন্দ। সন্ধ্যার আকাশের তলায় হাওয়ার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়। তার সমগ্র সত্তা আনন্দের কয়েকটি বিন্দুতে কাঁপতে থাকে।

সুশোভন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গীরা অভিযোগ করল। সেদিন

পেছনের বাগানে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। দুটো পাশিংশো সিগারেট দাদুর বাক্স থেকে চুরি করে যৌথপ্রথায় ধূমপান চলেছিল। দুটো টান দিয়েই সুশোভন ফিরিয়ে দিয়েছিল সিগারেট। বলল: 'ভালো লাগে না।' অবাক হয়ে গিয়েছিল বন্ধুরা। যে সিগারেট নিয়ে একদা সবচেয়ে বেশি মারামারি করত সুশোভন, সে-ই কিনা আজ সিগারেটে অরুচি প্রকাশ করে।

এবং তারপরের দিন টকি শো হাউসের চারখানা টিকিট কিনে নিয়ে এসেছিল জ্যোৎস্না। থ্রী মাস্কেটিয়ার্স। আর সুশোভন কিনা অশোভনের মতো প্রত্যাখ্যান করল: 'তোরা যা। আমি যাব না।'

'কি হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?'

'না। ভালোই আছি।'

'তবে? সিনেমা যাবি না কেন?'

'ভাল্ লাগে না।' বলল সুশোভন।

'তার মানে আমাদেরও ভালো লাগে না।'

সুশোভন চুপ করে রইল।

'সত্যি তুই একটা ইয়ে হয়ে পড়েছিস।' বন্ধুরা বলল।

সুশোভন চুপ করে বসে থাকে। তারপর এক সময় উঠে চলে যায়।

বন্ধুরা বলল: 'কবি-কবি ঢঙ।'

বোধ হয় কবিই হবে সুশোভন। ছাদের নিরালা অন্ধকারে বসে থাকে। জ্যোৎস্না রাতে মাদুর নিয়ে শুয়ে থাকে ছাদে। আর জ্যোৎস্না-রাতে সবাই গেছে বনে জেনেও বাড়িতেই পড়ে থাকে। আকাশ দেখে, নক্ষত্র, নক্ষত্রের আলিম্পন। তেলকলের চিমনি। মাথাভাঙা নারকেল গাছটা। চাঁদকেও। উনিশ বছরের জীবনটা কেমন কান্নার মতো লাগে। যেন একটা ভারি বোঝা। কিছু বুঝতে পারে, কিছু পারে না। আর শরীরটাকে মনে হয় একটা ভঙ্গুর পাত্রের মতো। একটা কিছু হতে ইচ্ছে করে, কিছু করতে। তারপর উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় মিশে যায়। বাইনকুলার হাতে নিয়ে ছাদের কার্নিশে এসে দাঁড়ায়। আকাশকে কাছে আনতে চায়, নারকেল গাছটাকে, ও বাড়ির জানলাকে। ও বাড়িটা আজ অন্ধকার। ওরা কোথাও গেছে। হাসি নয়, কথা নয়, গান নয়। আজ জ্যোৎস্না-রাতে সবাই গেছে বনে।

কী ক্ষতি ছিল, আরো কয়েক বছর আগে পৃথিবীতে এলে? সুশোভন

ভাবে : আরো বছর চারেক আগে! দেহের বাধা ছিড়ে যেন মনে মনে অনেক বড় হয়ে যায় সে। খোলা মাঠের মতো, হাসবার, গান গাইবার, কথা কইবার মতো বড়।

মোহনবাগানের খেলা দেখে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে ফিরছিল সুশোভন। সারাদিন মেঘলা ছিল বলে বুদ্ধি করে ছাতা সঙ্গে নিয়েছিল। এখন এই ভিড়ে ছাতাটা আপদ হল। মানিকতলা পেরোতেই বৃষ্টি নামল রাজকীয়ভাবে। সঙ্গে মেঘের দামামা আর বিদ্যুতের তরঙ্গ। স্টপে নেমে ছাতাটা খুলে ধরতে গিয়ে ছাতাটা আর কিছুতেই খোলা যায় না। তাড়াতাড়ি গাড়িবারান্দার নিচে আশ্রয় নিল সে। এবং সেখানেই দেখা হল অপূর্ণার সঙ্গে। বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে।

ছাতাটা অনেক টানাটানিতে খুলল এবার। কিন্তু পা দুটো এবার অচল হল। দুর্যোগের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মেঘ ভারি, কালো, শিগ্রি ছাড়বার লক্ষণ নেই। এবং এই অবস্থায় যে কোনো পড়শির যা কর্তব্য হওয়া উচিত সেই ভেবে সুশোভন এগিয়ে গেল অপূর্ণার দিকে।

'আসবেন আমার ছাতায়?' শান্ত গলায় আহ্বান জানাল সুশোভন।

অপূর্ণা চোখ তুলে চাইল। চিনতে পারল নিশ্চয়। বলল, 'না। দরকার নেই।'

'আপনি জানেন না, এ বৃষ্টি এখন ছাড়বে না। আসুন। আমার ছাতায় নিশ্চয়ই আপনার জায়গা হবে।' সুশোভন বলল তবু।

অপূর্ণা এক দণ্ড ভাবল। তারপর বলল, 'চলুন।'

ছাতাটা যথাসম্ভব ওর মাথায় ধরল সুশোভন। নিজে ভিজল। রাস্তা পার হল। পার হয়ে গলি। একেবারে ওদের বাড়ির দরজার কাছ বরাবর পৌঁছে দিল। অপূর্ণা দাঁড়াল না। না কোনো ধন্যবাদ। বর্ষণসিক্ত নরম চেতনা নিয়ে বাড়ি ফিরল সুশোভন।

সে-রাত্রে ঘুম এল না তার। কেমন একটা অজানা সুরভি তার মনকে সারাক্ষণ সুবাসিত রাখল। গন্ধটা বৃষ্টিতে ভেজা জুঁইয়ের মতো কিংবা তার চেয়েও উগ্র। শুধু গন্ধ নয়, কিছু উত্তাপ, কিছু স্পর্শ, কিছু রঙ।

পরদিন দুরন্ত দুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করে এক দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলল সুশোভন। কবিতা লিখল। নিতান্ত অপটু হাতের পদ্যগোছের রচনা। এবং অক্ষম প্রকাশ-কৌশল। কিন্তু কবিতা লেখা এক, তার যোগ্য শ্রোতা

পাওয়া অন্য। অথচ ফুলের সুবাসের মতো তার প্রকাশউন্মুখ গন্ধকে লুকিয়ে রাখা যায় না। পড়াতে হবে কাউকে। দুলাল, জ্যোৎস্না নয়। ওরা কবিতার কদর জানে না। হাসবে ঠাট্টা করবে।

কয়েকদিন কবিতাটা পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরল সে। আর ফাঁক পেলেই একেকবার বের করে সেটা পড়তে থাকল। পড়ে পড়ে মুখস্ত হয়ে গেল। আর বাড়িতে, বাইরে পরিচিতের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তারপর একদিন চেপে রাখতে না পেরে বন্ধুদের বলেই ফেলল তার কীর্তির কথা।

সকলে তো অবাক। তোর পেটে পেটে এত। তাইতো বলি বাড়িতে বসে বসে কি করে। তা কবিতা লিখে কি হবে? পেট ভরবে? জানিস শালা, মাইকেল মধুসূধন (মধুসূদন নয়!) পদ্য লেখার জন্যে খেতে পায়নি! তবে লিখেছিস, শুনতে আপত্তি কি। দে, সিগারেট দে।

কবিতা শুনে সকলে থ।

'এ যে রবি ঠাকুরকেও হার মানায়।' দুলাল বলল সিগারেটে জোর টান দিয়ে। 'এ কবিতা ছাপতে হবে। পোস্টার করে রাস্তায় সাঁটব। দেখিস রাতারাতি হই-চই পড়ে যাবে।'

লজ্জায় রঙিন সুশোভন বলল: 'তোরা ঠাট্টা করছিস।'

'ঠাট্টা! কোন্ শালা ঠাট্টা বলে তার মাথাটা ভেঙে দেবো না।'

'সত্যিই ছাপার মতো হয়েছে?'

'আলবৎ হয়েছে। একশো বার হয়েছে।'

সুশোভন চুপ করে রইল।

'চল। গোয়াবাগানে নন্তুর কাকার ছাপাখানা আছে। কত খরচ পড়বে দেখে আসি।' নিষ্কর্মা দিনগুলিতে অভিনব এক কাজ পেয়ে সকলে উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আর একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল দূরে চলে যাওয়া বন্ধুকে আবার কাজের অজুহাতে কাছে আটকে ফেলা। সুশোভন বুঝুক ওর প্রচণ্ড দুঃসময়েও তারা আছে। পদ্য যখন লিখেই ফেলেছে সে তখন সেই দুঃসাধ্য কর্মকে তারা সাধারণ্যে প্রকাশ করবে!

কিন্তু নন্তুর কাকা, যা ভাবা গিয়েছিল, তা নয়।

'দেখি লেখাটা—' বললেন তিনি। তারপর লেখা হাতে নিয়ে চাঁদির চশমা-জোড়া চোখে নয়, কপালে এঁটে পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ করে

ক্যাস্টর অয়েল খাওয়া গলায় জিগ্যেস করলেন: 'কে লিখেছে এই পদ্য।'

'আমাদের সুশোভন—' সমস্বরে বলল ওরা।

নস্তর কাকা আপাদমস্তক জরীপ করলেন সুশোভনকে। যেন সুশোভন-ই একটি জলজ্যান্ত পদ্য। তারপর হাসলেন না কাশলেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, 'কিস্যু হয়নি।'

হয়নি! সকলের চক্ষু চড়কগাছ। ছাপার মতো হয়নি!

নস্তর কাকা কৌটো থেকে বিড়ি বের করে ধরালেন। দেশলাই কাঠি দু'একবার ঘসতেই আগুন জ্বলল। আগুনটা নয়, মুখটাই টেনে আনলেন আগুনের কাছে। তারপর বিড়ি টানতে-টানতে কাশতে-কাশতে দম নিলেন নস্তর কাকা। একটু থেমে বললেন, 'বাঙলায় কবিতাই লেখা হয়নি।' হাত নেড়ে যেন মাছি তাড়ালেন তিনি।

আর ছেলেরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

'বাঙলায় একজনই মাত্র কবি আছেন এবং একবারই মাত্র কবিতা লেখা হয়েছে—' বললেন নস্তর কাকা: 'সে কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার। নাম শুনেছ? শোনোনি। শুনবে কোত্থেকে। খাঁটি জিনিস আজকাল কে মনে রাখে।' আফসোস জানালেন তিনি। তারপর—'আহ্! সে কি কবিতা। পাখী সব করে রব রাত্তি পোহাইল। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।'

ছেলেরা পালিয়ে এল।

সুশোভন চোরের মতো মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগল। বন্ধুদের প্রবোধ বাক্যেও ওর ঘাড় সোজা হল না।

আবার নিজেকে গুটিয়ে নিল বন্ধুদের কাছ থেকে। বাড়িতে নিঃসাড়ে পড়ে রইল। উনিশ বছর বয়েসটাই একটা বিড়ম্বনা। না-কিশোর না-যুবক। পরিবর্তিত নতুন শরীরের অস্বস্তি, ভাঙা বদখত বেসুরো গলা, আর অন্ধ মনটা পাক খেয়ে খেয়ে সংসার সম্বন্ধে একটা দুর্জয় অভিমান আর বিতৃষ্ণায় বিস্বাদ হয়ে ওঠে। চুপচাপ অন্ধকারের লতার মতো শেকড় চালানো, এককোণে পড়ে-থাকা।

হঠাৎ একদিন অবেলায় ঘুম থেকে উঠে সুশোভনের মনে হল তার জ্বর হয়েছে। গা জ্বলছে, চোখ মুখ ঝাঁঝাঁ করছে। তারপর হঠাৎ-ই মনে হল ওর শক্ত অসুখ হয়েছে। যক্ষ্মা। উদ্গত কাশি চাপতে চাপতে বাথরুমে ছুটে যায়, কিছু একটা বুঝতে চায়, জানতে চায়। চোখে জল আসে, দৃষ্টি ঝাপসা। তস্করের মতো বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে বাথরুম

থেকে। কারুর দিকে তাকায় না, কথা বলে না। বারবার কপালে হাত দেয়, চোখের পাতায়। এবং যে উত্তাপটা বাইরে থেকে ধরা যায় না তাকে মন দিয়ে স্পর্শ করে। আমার যক্ষ্মা হয়েছে—নিজের মনে আওড়ায় সে। বাড়ি থেকে বেরোয় না। বিকেল হলে ছাদের কোণে বসে থাকে। এবং আসন্ন মৃত্যুর কল্পনা করে।

কেমন রুক্ষ, কর্কশ, কুটিল হয়ে উঠল ওর চেহারা। কোনদিন স্নান করে, করে না। পোশাক-আশাক ময়লা, মুখে বেমানান ছাগলের মতো গোঁফদাড়ি। কেমন তারকেশ্বরের মানত-দেয়া ছেলের মতো দেখায়।

সেদিন হুড়মুড় করে দুলাল, জ্যোৎস্না ছাদে উঠে এল।

'ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল দুলাল। 'আর তুই বসে আছিস এখানে।'

'কি ব্যাপার ?' বিরক্ত সুশোভন জিগ্যেস করল।

দুলাল বলল : 'কদিন থেকেই মতলব ভাঁজছিলাম। আজ তক্কে তক্কে ছিলাম। যেমন গলি থেকে বেরুনো পথ আটকে চ্যালেঞ্জ করলাম। এটা ভদ্রলোকের পাড়া, বস্তি নয়। এখানে এত রাত পর্যন্ত ওসব ফুর্তি-টুর্তি চলবে না।'

সুশোভন বলল, 'কে ? কাকে বললি ও কথা ?'

'ন্যাকা।' দুলাল মুখ বেঁকাল : 'শালা, রজতকে চিনিস নে ? ভেবেছে পাড়ায় মানুষ নেই। বেপাড়ায় এসেছে মজা লুটতে।'

'তোরা বললি ও কথা।'

'মাইরি আর কি। ছেড়ে কথা বলব ! মনে নেই গাঙ্গুলিদের টাইপিস্ট কমলার আপিসের বাবুকে কেমন ধোলাই দিয়েছিলাম ? শালা আর এ মুখো হয়নি।'

'যাকে বলে আড়ং ধোলাই—' পরিমল টিপ্পনি জুড়ল।

'দেবো শালা একদিন বোমা মেরে বদন বিগড়ে...' জ্যোৎস্না বলল।

'জোসনা আবার ?' দুলাল-ই বাধা দিল।

'ধ্যাৎ। আমি কি সত্যি সত্যি বলছি নাকি।'

'মিথ্যে করেই-বা বলবি কেন। জানিস তোর জন্যেই আমাদের বদনাম।'

'আচ্ছা আচ্ছা। চুপ করছি।'

'কিন্তু তোরা এমন করতে গেলি কেন ? কে তোদের ওস্তাদি করতে বলেছে ?' সুশোভন কেমন ধমকের গলায় বলে উঠল।

ওরা বোকার মতো চেয়ে রইল। আরে, বলে কি! সুশোভনটা দিনে দিনে কি হচ্ছে। কোথায় তাদের বীরত্বের প্রশংসা করবে, তা নয় এই তিরস্কার।

শালা। তোর মনে নেই? তুইতো নিজেই হাতের সুখ করেছিলি কমলার আপিসের বাবুকে। বাবা! এখন ধম্মপুত্তুর সাজা হচ্ছে।

'কেন? বলব না কেন? দুলাল বুক ফোলাল: 'পাড়ার ভালোমন্দ মঙ্গল-অমঙ্গল আমাদের দেখতে হবে না। আসলে দে'রা তো পাড়ার লোক। একটা কর্তব্য নেই? পাড়ার কেলেংকারি আমাদের কেলেংকারি নয়?'

'বেশ। তোরা যা ভালো বুঝেছিস কর। আমাকে জানাতে এসেছিস কেন?'

'তুই রাগ করছিস?'

সুশোভন চুপ করে আকাশ দেখতে লাগল। তারপর বলল: 'কেন? তোরা কি দেখেছিস, কি শুনেছিস? শুধু শুধু নিরীহ ভদ্রলোককে নিগ্রহ করা।'

'ওরা অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে না?'

'করে।'

'হাসি-তামাশা করে না?'

'করে।'

'তবে?'

'তবে আবার কি। দোষটা কি হল ওদের? তোরা হাসি-তামাশা করিসনে, গল্পগুজব করিসনে? তবে অন্য লোকের আনন্দ দেখলে তোদের চোখ টাটায় কেন?'

'এক কথা হল?' দুলাল শ্বাসরোধ করে বলল। 'তাই বলে যুবক-যুবতী? অত রাত পর্যন্ত?'

'তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল?'

'বটে! তবে মিত্রদের দুলুর সঙ্গে দুলাল ক'দিন গলিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলেছিল। পাড়ার বড়রা অত খেপে গেল কেন?' জ্যোৎস্না ওকালতি করল।

'সেটা দুলালকেই জিগ্যেস কর।' সুশোভন বলল।

'যা ছেড়ে দে ওসব কথা।' ত্নলাল বাধা দিল।

'দিলাম।' মুখ গোঁজ করে বলল জ্যোৎস্না।

ওরা চলে যেতে বাইনকুলার হাতে ছাদের কার্নিশে এসে দাঁড়াল সুশোভন। অপূর্ণাদের ঘরে আলো জ্বলছে। আর কী আশ্চর্য, জানলার শিক ধরে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে অপূর্ণা। পরনে শাদা শাড়ি, চুলগুলো পিঠের ওপর খোলা। আজ রজত আসবে না। অপূর্ণাও আজ কথা বলবে না, হাসবে না, গান গাইবে না। 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' বাইনকুলারে ওর মুখ ভার ভার, চোখের পাতা ফোলা ফোলা দেখল সুশোভন। এই মুহূর্তে ত্নলালদের ওপর প্রচণ্ড রাগ হল তার। যেন তার একটা প্রিয় সুন্দর ছবির ওপর কালি ঢেলে দিয়েছে ওরা। অপূর্ণা কি ভাবছে, কি ভাববে। ভাববে সুশোভনও আছে এই দলে। কিন্তু সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না—সুশোভন যেন অপূর্ণার জেরার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। রজত আর আসবে না, কোনোদিনও না। তাহলে অপূর্ণা কি করে হাসবে, কার সঙ্গে কথা বলবে। গান? হঠাৎ ঠিক করে ফেলল সুশোভন। সে নিজে রজতকে নিয়ে আসবে, এ পাড়ার উৎপাত থেকে বুক দিয়ে তাকে রক্ষা করবে। ভেবে শান্তি পেল সে। নিজেকে ভীষণ উদার মনে হল।

কিন্তু সে সব কিছুই করতে হল না তাকে। রজত আবার এল। আবার হাসি, কথা, গান। ছাদ থেকে ওদের পর্যবেক্ষণ করলো সুশোভন। তেমনি করে জানলায় বসে কথা বলে অপূর্ণা, রজত খাটে। অনেক কথা, অনেক হাসি। এবং গান। সুশোভনের ভয়েই বোধ হয় চুপ করে রইল ত্নলালরা। মনে মনে গজরাতে লাগল।

যেদিন ওর নাকের সামনে দিয়ে ত্ন'জনে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায় সেদিন ভালো লাগে না সুশোভনের। রাগ হয় অকারণে। সেদিন ওদের ঘর থাকে অন্ধকার। জানলার ফ্রেমে কোনো ছবি ধরা পড়ে না। ত্নর্বোধ্য অভিমানে গুমরে ওঠে বুক। যেন তার আনন্দের ভোজ থেকে ওরা তাকে ফাঁকি দিচ্ছে। আর তখন রাস্তায় কোনো অ্যাকসিডেন্ট কি ভদ্র রকমের উৎপাতের সম্ভাবনায় ওরা জব্দ হয়েছে, ভাবতে ভাল লাগে। আর সেদিন নতুন করে মনে হয় তার বিশ্রী ... হয়েছে। গা জ্বালা, চোখ ঝাঁঝাঁ, গলা শুকিয়ে আস...
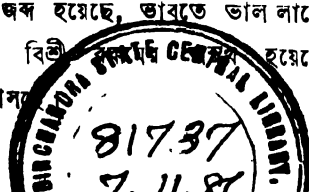
কোথায় যায় ওরা? একদিন লক্ষ্য রাখল ওদের ওপর। তারপর ওরা বেরোতেই তাড়াতাড়ি জামা পরে ওদের অনুসরণ করল।

ওরা ট্রামে-বাসে উঠল না। গোয়াবাগান পার হয়ে হেদো। হেদো ধরে সোজা হাঁটল ওরা। বিবেকানন্দ রোড। শ্রীমানি মার্কেট। সুশোভনও একটু তফাত থেকে চলল। ঠনঠনে পেরিয়ে গেল ওরা। কথা বলছে। কি কথা? হাসল অপূর্ণা। তাও লক্ষ্য করল সুশোভন। তারপর কলেজ স্ট্রীটের ক্রশিং পেরিয়ে ডান দিকে গলিতে ঢুকল ওরা। এবার কোথায় যাবে? না। কোথাও গেল না। পাবলিক রেস্তোরাঁয় উঠল ওরা। বাইরে থেকে দেখল ওদের পরদাটানা ক্যাবিনে ঢুকে পড়তে। সুশোভন সরে এল রেস্তোরাঁ থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙের সামনে দাঁড়াল। পুরনো বই দেখল। ভিড়। ট্রামে বাসের মিছিল। এখন কি করবে সে? পকেটে কয়েক আনা পয়সা। চা খাবে? না।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল নেই।

ওরা বেরিয়ে এল। ট্রাম স্টপে দাঁড়াল ছ'জনে।

'কাল?'

'না। কাল নয়।'

'তবে পরশু?'

'দেখি।'

'এত দেখার কি আছে?'

'আছে। আমার মাকে তুমি চেন না।'

'মেয়েকে তো চিনি।'

'চেনো? দেখো ভুল হয়নি তো?'

'না।'

নীরবতা।

'এই—'

'উঁ?'

'একদিন চলো না—'

'এত ব্যস্ত কেন? যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছ...'

হাওয়ায় ভাষা ওদের ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ কানে এল সুশোভনের। কিছু বুঝল, অনেক কিছু বুঝল না। অপূর্ণার তেলতেলে মুখটা বাতির

আলোয় নাকি অন্য কারণে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। হাওয়ায় চোখের পাপড়ি কাঁপছে ওর। আর ঠোঁট দুটোতে যেন রক্তের উচ্ছ্বাস।

'চলি।' অপূর্ণা বলল।

'একটু দাঁড়াও।'

'দেরি হয়ে যাবে।'

'হোক।' রজত বলল: 'জানো সেদিন পাড়ার ছেলেরা আমার পেছনে লেগেছিল।'

'সেকি!' অপূর্ণা চোখ তুলল। 'কই বলোনি তো?'

'এ কি আর বলার কথা।' রজত হাসল। 'পাড়ার মেয়েকে নাকি আমি বেদখল করছি?'

'বলল এ কথা?' অপূর্ণার চোখে বিস্ময়।

'বলল তো!' রজত হাসল। 'কথাটা তো মিথ্যে নয়।'

'তাতে ওদের কি?'

'তুমি ওদের আমল দাও না—' রজত হেসে বলল।

'অসভ্যের মতো কথা বোলো না।' অপূর্ণার মুখে চিন্তার বুদ্‌বুদ। 'সত্যি তুমি ভাবনায় ফেললে।'

রজত বলল, 'এর চেয়েও বড় ভাবনা আছে।'

অপূর্ণা বলল, 'বড় ভাবনা আছে বলেই তো ছোটো ভাবনাগুলো পাড়া দেয়। আমরা এদিকে নিজের জ্বালায় জ্বলছি পুড়ছি…'

'আগুনের উত্তাপ পেতে হলে কখনোসখনো পোড়ার স্বাভাবিকতাকেও মেনে চলতে হবে বইকি।'

'কাব্য রাখো।' অপূর্ণা বলল: 'তুমি আর কিছুদিন নাই-বা এলে আমাদের বাড়ি।'

রজত বলল, 'অসম্ভব। দিনে একবার দেখা না হলে চলে না। কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। দেখা করার কোনো সুবিধে নেই।'

'বলছি তো বাইরে দেখা করব। যত ঘন ঘন চাও, পাবে। লক্ষ্মীটি, আমাদের পাড়ায় এস না। বলা যায় না কোনোদিন পেছন থেকে ছুরি মারতেও পারে। বিশ্বাস নেই ওসব ছেলেদের।'

'আচ্ছা সে হবে'খন। তুমি বাড়ি যাও। রাত হচ্ছে।'

অপূর্ণা ট্রামে উঠল।

'শুনুন—' ট্রাম থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়েছে, থমকে দাঁড়াল অপূর্ণা।

সুশোভন। ছেলেটিকে মনে আছে অপূর্ণার। বৃষ্টির দিনে মাথায় ছাতা ধরেছিল।

'কয়েকটা কথা আছে।' সুশোভন বলল।

'আপনার সঙ্গে আমার কি কথা থাকতে পারে?' সন্দেহ-কুটিল দৃষ্টি অপূর্ণার।

'কথাটা যখন আমাদের সম্পর্কে উঠেছে তখন সে সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করা ভালো নয় কি?'

অধর কুঞ্চিত করে অপূর্ণা বলল, 'ও! আমাদের ফলো করা হয়েছিল বুঝি? আপনারা এত ইতর, এত মীন…'

সুশোভন বলল, 'আপনি উত্তেজিত হলে কোন কথা বলা যায় না। শুনুন ফলো আমি করেছি ঠিকই। কিন্তু বিশ্বাস করুন কোনো বদুদ্দেশ্যে নয়।'

'সাধু সাজবার চেষ্টা হচ্ছে?' অপূর্ণা আরো রাগল: 'ফলো সব সময়ই খারাপ। আর তার উদ্দেশ্যও একটি।'

'আপনাদের সঙ্গে কথায় পারব না। আপনারা বিদুষী। আমি দ্বিতীয়বার ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করে তৃতীয়বারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। কাজেই আমাকে প্রতিপক্ষ ভাববেন না।' সুশোভন হাসল।

আর ছেলেটির খোলা রাস্তার ওপর এই ধৃষ্টতা দেখে অবাক হল অপূর্ণা। ব্যংগ করে বলল, 'ফেল করার জন্যে আবার অহংকারও আছে দেখছি।'

সুশোভন আবার হাসল। 'কেন থাকবে না। পাশের অহংকার যদি আপনাদের থাকে, ফেল করার অহংকার আমাদের থাকবে না কেন। সে কথা নয়। বলছি কি সংসারে পাশ-ও থাকবে ফেল-ও থাকবে। কাজেই এবারের মতো আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে নিন।'

'ক্ষমা! বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে শিখেছেন। লজ্জা করে না একজন নিরীহ ভদ্রলোককে একলা পেয়ে তার ওপর দল বেঁধে চড়াও হতে।'

'লজ্জা থাকলে করব কেন বলুন?'

'পথ ছাড়ুন। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত সব লোফারস্…' অপূর্ণা দ্রুত হাঁটল।

সুশোভন সঙ্গ নিল। 'চলুন। একসঙ্গেই যাওয়া যাক।'

অপূর্ণা বলল, 'না। আপনি আমার সঙ্গে আসবেন না। যদি কথা না শোনেন আমি চিৎকার করব।'

সুশোভন বলল, 'করুন চিৎকার। আমি মার খাব ঠিকই। কিন্তু আপনার গায়েও কাদা লাগবে। তার চেয়ে—' সুশোভন হাসল। একটু থেমে: 'আমি ভালো ছেলে নই, সে-অহংকারও আমার নেই। তবে কথাটা যদি বিশ্বাস করেন তাহলে বলি রজতবাবুকে অপমান করার দলে আমি ছিলাম না।'

'ছিলেন না?'

'বললাম তো না।'

'সত্যি বলছেন?'

'অন্তত এটা মিথ্যা নয়।' সুশোভন বলল।

'তবে আপনি গায়ে পড়ে অপমানিত হলেন কেন?' আশ্চর্য গলায় জিগ্যেস করল অপূর্ণা।

'এতদিন আছেন পাড়ায় কোনোদিন মান দেননি, আজ না হয় অপমানই দিলেন।' সুশোভন হাসল: 'তাও তো কিছু পেলাম। মন্দের ভালো।'

'জানেন ওরা ওকে মারবে বলে শাসিয়েছে।' অপূর্ণার গলা ভিজে: 'আপনি একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন না ওদের?'

'বলব।' এবার পাড়ার মধ্যে এসে পড়ল ওরা। সুশোভন বলল: 'আপনি একটু এগিয়ে যান। আমার সঙ্গে দেখলে হয়ত আপনাকে ভুল বুঝবে।'

অপূর্ণা এক মুহূর্ত ফিরে তাকাল ওর দিকে। অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর কদমপায়ে এগিয়ে গেল।

সারা পথ ভাবতে ভাবতে এল অপূর্ণা। ছেলেটিকে তার অদ্ভুত লেগেছে।

বাড়ি ফিরে সুশোভন সোজা ছাদে উঠে এল। নির্জন ছাদের বুকে নিজেকে মেলে দিয়ে চিত হয়ে শুল সুশোভন। থই থই করছে মস্তিষ্ক। একটা দুর্নিবার বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কেঁপে কেঁপে উঠল ওর

দেহমূল। বুকের অন্তস্তল থেকে একটা ঢেউ পাক খেয়ে খেয়ে সমস্ত হৃদয়কে মথিত করে তুলল। এবং অকস্মাৎ দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল তার। মোটা মোটা অশ্রুর রেখা আপ্লুত করে তুলল ওর চোখের কিনারা।

আমি কি হতে চাই, অথচ হতে পারিনে—নিজের মনে বলল সুশোভন। যেন এক ডাইনী অভিশপ্ত নিঝুম রাজপুরীতে এসে পড়েছে। সামনে সিং-দরজা। জঙ-ধরা দরজাটাকে আঘাত করে খুলতে চায় সে, পারে না। দরজা খোলো—আমি আর পারছিনে—মূক যন্ত্রণায় ছটফট করে সুশোভন।

আকাশে মেঘ করে ছিল। ভীষণ গুমট। সাত-তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে পড়েছে। বউদির ওষুধ নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফিরছিল সুশোভন। কদিন হল বউদির জ্বর ছাড়ছে না।

মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে চলেছিল সুশোভন। কোনোদিকে লক্ষ্য নেই।

গলির মোড়ের অন্ধকারে পড়তেই কে জানে কোথায় ওঁত পেতেছিল ওরা, একযোগে বেরিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল। দুলাল পরিমল জ্যোৎস্না।

সুশোভন কিছু বলবার আগেই বিস্মিত বিমূঢ় তাকে হিড়হিড করে টেনে নিয়ে ওরা পেছনের নির্জন মাঠে চলে এল।

'শালা, ভদ্দরলোক হয়েছে—' দুলাল গরগর করে উঠল। 'আমরা ছোটলোক লোফার—'

সুশোভন স্তম্ভিত। চোখের সামনে যেন নাটকের দৃশ্য দেখছে। 'দ্যাখ না শালা কেমন মৌনীবাবা সেজে গেছে। দেবো এক রদ্দা—' পরিমল হিসিয়ে উঠল।

সুশোভন বলল, 'আমাকে তোরা মারবি!'

দুলাল মাটিতে থুতু ফেলল। 'না। বেইমানকে পুজো করব। আমার ইয়ে রে—'

'কেন? আমি কি করেছি?' সুশোভন জানতে চাইল।

'কি করোনি জাদু। অই ছুঁড়িটার কাছে আমাদের নামে লাগিয়েছ। আমরা ছোটোলোক ইতর, তাই না?'

'আমি এমন কথা বলিনি।'

'বলোনি। ওরে আমার যুধিষ্ঠির। বলোনি আমরাই ওর ইয়েকে শাসিয়েছি? বলোনি তুমি আমাদের দলে নেই? কি চুপ করে কেন বাওয়া, বলোনি চাঁদ?'

সুশোভন বলল, 'আমি সত্যিই তো ছিলাম না—'

দুলাল বলল, 'থাকবে কি করে। শালা, নেড়িকুত্তার মতো তুমি যে ছুঁড়িটার পায়ে লপচপ করছ।'

সুশোভন বলল, 'আমাকে এসব কথা বলে তোদের কি আনন্দ হচ্ছে। আমি তোদের সাতেপাঁচে নেই। থাকবও না।'

পরিমল বলল, 'তা থাকবে কেন? তুমি যে জেন্টলম্যান। তুমি ওদের পাপকাজের গার্জেন হয়েছ। তুমি ওদের সাহস দিয়েছ। তা মোড়লি করবে আর আমাদের নাগালে থাকবে না, তা চলে না। এই তোমাকে হক কথা বলছি আবার যদি ওই ছোকরা পাড়ায় আসে দেড়ঠেঙ্গে করে দেবো।'

সুশোভন বলল, 'না।'

'কি না?'

'তা তোমরা পারো না।'

'মাইরি, কে আমার বাপের ঠাকুর এলেন রে।'

তারপর ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। লাথি ঘুষি চড়। সুশোভন পকেটে হাত দিয়ে মার খেল। পকেটে বউদির ওষুধের শিশি। এতদিন মার দিয়েছে সুশোভন। মার খাওয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু আজ মার খেতে খেতে কেমন এক আশ্চর্য শূন্য অনুভূতিতে সে বিকারহীন হয়ে রইল। সে অবাক হয়ে গেল, এই এরা, তার বহুকালের সঙ্গীসাথীরা, তাকে মারতে পারে। অপূর্ব বেদনা বিষণ্ণতায় সে কাঠ হয়ে রইল। পেছন থেকে কে ইটের টুকরো তুলে আঘাত করল। বোঝবার আগেই, আঘাতকে অনুভব করবার আগেই, সুশোভন মাটিতে আছড়ে পড়ল। জ্ঞান হারাবার আগে কেবল শুনতে পেল কার চিৎকার 'মেরে ফেলল, মেরে ফেলল,' তারপর পলাতক ধাবমান পায়ের শব্দ, মানুষের চিৎকার, আর কিছু মনে রইল না সুশোভনের।

পরদিন সকালে দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলল অপর্ণা। পাড়ার ছেলেরা দেখল ট্রামরাস্তার দিকে নয়, অপর্ণা পাড়ার বাড়িগুলির অরণ্যে

কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটি বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে করে সুশোভনের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সুশোভনের বউদি বেরিয়ে এলেন : 'কাকে চাই ?'

অপূর্ণা বলল, 'আমি অপূর্ণা। এ পাড়ায় আমরা নতুন এসেছি। সুশোভন এখন কেমন আছে ?'

সুশোভনের বউদি বললেন, 'ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি। পাড়ার ডাক্তার বসাক মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছেন।'

'ও কি করছে এখন ? আমি একবার দেখা করতে পারি ওর সঙ্গে ?'

'বা রে। দেখা করবেন না কেন ? আসুন। ওই যে ও ঘরে, আপনি যান—'

জুতোর শব্দে চোখ তুলে তাকাল সুশোভন।

'আপনি !'

'কেন ? আসতে পারিনে ?' অপূর্ণা বসল বিছানার পাশে।

'আমি ভাবতে পারছিনে—' অসহ্য সুখে বলল সুশোভন।

'ভাবতে হবে না।' অপূর্ণা সুন্দর করে হাসল। 'কিন্তু এটা কি হল সুশোভন ?'

সুশোভন হাসল। 'আপনি তো 'সেলফিস জায়েন্ট' পড়েছেন। এগুলি উণ্ডস্ অব লাভ্।'

'তুমি কি জেসাস্ ক্রাইস্ট হবে ?'

সুশোভন হাসল।

অপূর্ণা ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজের গায়ে আলতো হাত বুলোল। কনুইয়ের ওপর ক্ষতচিহ্ন। আস্তে বলল : 'খুব লেগেছে, না ?'

'না।' সুশোভন চোখ পিট পিট করে হাসল।

'ওরা তোমাকে মারল কেন ?' অপূর্ণা জিগ্যেস করল।

'আমাকে সহ্য করতে পারছিল না। অথচ আমাকে অস্বীকারও করতেও পারছিল না। তাই ওই দুটো কারণেই ওরা আমাকে মেরেছে।'

'বেশ ছেলে। ওই ভাবে মার খেতে হয় ?' অপূর্ণা বলল ওর ক্ষতে হাত বুলোতে-বুলোতে। 'আমি খবর শুনে ভয়ে সারা।'

সুশোভন হাসল। 'কেবল মার দেবো, কোনোদিন মার খাব না, তাতো হয় না। আর তাছাড়া নইলে তো আপনি আসতেন না।'

'আমি না এসে কি পারি?' অপূর্ণা বলল: 'আমি তো জানি আমার জন্যেই তুমি মার খেয়েছ।'

'না।' সুশোভন বলল, 'মার আমাকে খেতেই হত। আজ কিংবা কাল। ওদের কাছ থেকে আমি সরে যাচ্ছিলাম, ওরা ভয় পাচ্ছিল। আমাকে মেরে ওরা আমাকে বুঝতে চেয়েছিল।'

অপূর্ণা বলল, 'তোমার এত বুদ্ধি, মন দিয়ে পড়াশোনা করো না কেন?'

সুশোভন হাসল। 'এই বুদ্ধিই আমাকে পড়াশোনা করতে দিল না।'

ওর কথা শুনে অপূর্ণাও হাসল। হাসতে-হাসতেই বলল: 'বাজে কথা। যেমন দুষ্টু ছেলে, থাকো কিছুদিন বিছানায় শুয়ে। আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি।'

'একটা কথা বলব? যদি রাগ না করেন—' সুশোভন বলল।

অপূর্ণা বলল, 'রাগ করলেও তুমি শুনছ কিনা? কি—?'

সুশোভন বলল, 'রজতবাবুকে বলবেন না আমার মার খাওয়ার কথা!'

'সেকি! কেন?'

'আমার লজ্জা করে।'

'লজ্জা করে!' অপূর্ণা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর কি ভাবল। তারপর আস্তে গলায় বলল 'আচ্ছা—'

'আর—' সুশোভন নিশ্বাস ফেলে বলল: 'ওকে কিছুদিন এ পাড়ায় আসতে বারণ করবেন।'

'করব।' অপূর্ণা এবার উঠে পড়ল। 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।' দরজার দিকে এগোল অপূর্ণা।

'শুনুন—' ফিরে দাঁড়াল অপূর্ণা। সুশোভন বলল: 'ভুল করে যখন তুমিই বলে ফেলেছেন সেটাকে আর আপনি করবেন না।'

অপূর্ণা হাসল। 'করব না।' তারপর দরজা পার হয়ে গেল।

সেদিন সারারাত্তির না-ঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটল সুশোভনের। বউদি অসুস্থ শরীর নিয়ে অনেকক্ষণ শিয়রের কাছে বসে রইল।

সুশোভন বলল, 'তুমি যাও বউদি শুয়ে পড়ো।'

'হ্যাঁ। যাই।' বউদি বসে রইলেন।

ঘরে স্তিমিত আলো জ্বলছে। আলোকে ভারি স্নিগ্ধ লাগছে। সুশোভনের চোখে আলোর প্রতিবিম্ব। সমস্ত অনুভূতি আলোর শিখার

মতো কাঁপছে। বউদি, আমি কাঁপছি কেন। মনে মনে উচ্চারণ করল সুশোভন। 'এটা কি হল সুশোভন!' অপূর্ণার কণ্ঠস্বর তার সমস্ত চেতনাকে স্তম্ভিত করে তুলছে। সুবাস তাকে আরক্ত করে তুলছে, তাকে আবিষ্ট করে রাখছে। বউদি লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি শুতে যাও। আমি একলা থাকতে চাই। সুশোভন এই মুহূর্তে যেন তার আঘাতকে ভালোবেসে ফেলল। সে আঘাত না পেলে অপূর্ণা ছুটে আসত না। ওর ঘামে চকচকে উদ্বেগে কাতর মুখ সুশোভনের চোখের সামনে ভাসছে। সে আহত না হলে কি সে আসত। গলার ভেতরে শুকনো খসখসে কি ঠেলে উঠতে চাইছে।

বউদি বললেন, 'মেয়েটি কে ঠাকুরপো?

সুশোভন বলল, 'দে বাড়ির মেয়ে।'

'বেশ ভালো স্বভাব মেয়েটির।' বউদি হাসলেন। 'তোমার সঙ্গে খুব আলাপ বুঝি?'

সুশোভন বলল, 'হুঁ...'

'কলেজে পড়ে বোধ হয়?'

'হ্যাঁ।'

'লেখাপড়া জানা মেয়ে। দেখেই বোঝা যায়। মেয়েরা লেখাপড়া না শিখলে ভীষণ মুখ্যু স্বার্থপর হয়।'

'তাই বুঝি? তুমি স্বার্থপর? ঈশ্‌শ।'

'ও আবার আসবে তো?

'বারে, আমি কি গুনতে জানি।' সুশোভন হাসল।

'আমি কথা বলবার সময় পেলাম না। কি ভাবল আমাকে।'

'আমার বউদিকে কেউ খারাপ ভাববে, সাধ্যি কার।'

বউদি হাসলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, কারা তোমাকে মারল, তুমি একজনকেও চিনতে পারল না!'

সুশোভন হাসল। 'কি করে চিনব। বড় অন্ধকার যে। বেপাড়ার ছেলে বোধহয়।'

'তোমার দাদা তো পুলিশে যাচ্ছিলেন। আমি ঠেকিয়ে রাখলাম। কে জানে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে।'

'ভালো করেছ বউদি।'

'তুমি মারকে ঠেকাবার চেষ্টা করলে না কেন, চিৎকার করতে পারতে, পালিয়ে আসতে পারতে—'

'সে আরও লজ্জা। মানুষ ভয় পেয়ে পালাচ্ছে সে এক বিচ্ছিরি দৃশ্য।' সুশোভন হাসল। 'পারলাম না বউদি। পড়ে গেলাম। তোমার ওষুধের শিশি পকেটে ভেঙে গেল।'

বউদি বললেন, 'তা যাক। তোমাকে ফিরে পেয়েছি এই যথেষ্ট। আমাকে কথা দাও আর কোনোদিন ওই মারামারির ব্যাপারে থাকবে না।

সুশোভন বলল, 'কি করে কথা দিই বউদি। মারামারিকে কি তুমি সংসার থেকে দূর করে দিতে পারো।'

'আর নয়। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো এবার।' বউদি চলে গেলেন।

কত রাত এখন, কে জানে।

একটা রাত-জাগা পাখি শব্দ করতে-করতে নারকেল গাছের শাখায় বসল। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। ঘরের স্বল্প আলো মাখনের মতো লাগছে। আঃ কি ঠাণ্ডা। অপূর্ণার চুলের ভিজে গন্ধ। চোখ বন্ধ করলেই সুবাস ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। আনন্দের তরঙ্গে যেন পদ্মপাতার মতো ভাসতে লাগল সুশোভন। আমার ঘুম আসছে—সে বলল। ঘুমের ঢেউ, রঙিন, ফেনিল। তারপর একসময় সে ঘুমের ডুবসাঁতারে তলিয়ে গেল।

পরদিন অপূর্ণা এল।

'আজ কেমন আছো সুশোভন?'

'ভালো।'

'জানো কাল সারাদিন তোমার কথা ভাবছিলাম।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। রজতও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে।'

'কেন?'

'বারে, হবে না? তুমি খুব মিষ্টি সুশোভন?'

'কই, পিঁপড়ে ধরেনি তো।'

'সত্যি। তুমি খুব লক্ষ্মীছেলে।'

'আমাকে ঘুষ দেয়া হচ্ছে! আমি কোনো কাজে লাগব না।'

'দেখা যাবে।' অপূর্ণা হাসল। 'আচ্ছা সুশোভন, তুমি কি ভালোবাসো?'

সুশোভন হাসল। 'জানিনে।'

'জানো না! বারে।'

'সত্যি জানিনে। জানতে ইচ্ছেও নেই।'

'পাগল কোথাকার।' অপূর্ণা ওর চুল উসকে দিল।

বউদি চা নিয়ে এলেন।

অপূর্ণা বলল, 'আবার চা কেন?'

বউদি বললেন, 'আগেরদিন আলাপ করতে পারিনি। চা-টা আলাপের সূত্র মাত্র।'

'দিন।' অপূর্ণা হাত বাড়িয়ে চায়ের বাটি নিল।

'তোমার কথা সুশোভনের কাছে অনেক শুনেছি—কি জানো তোমাকে হিংসে করতে ইচ্ছে করে ভাই। মেয়ে বলতে আমিই ছিলাম ওর একমাত্র অভিজ্ঞতা। তোমাকে পাবার পর—'

'বউদি।' সুশোভন ছদ্মরোষ দেখাল।

'দেখছ তো ভাই, আমাকেই চোখ রাঙাচ্ছে…'

অপূর্ণা হেসে উঠল।

'বোসো ভাই। আমি রান্না চাপিয়ে এসেছি।' বউদি ত্বরিত পায়ে অন্তর্হিত হলেন।

অপূর্ণা বলল, 'কি বলেছ আমার সম্পর্কে বউদিকে—'

সুশোভন বলল, 'বউদির কথা ছেড়ে দিন।'

'বেশ। ছেড়ে দিলাম। কই, আমার কথার জবাব দিলে নাতো?'

'কি কথা?'

'কি ভালোবাসো তুমি?'

'কি করে বলব? কেউ বলতে পারে?'

'কেন পারবে না?'

'আপনি বলতে পারেন কি ভালোবাসেন?'

'কেন পারব না।' অপূর্ণা কপাল চুলকোল: 'এই বই পড়তে, বেড়াতে, বকবক করতে, দেশের কথা চিন্তা করতে…'

সুশোভন বলল, 'দেখলেন তো পারলেন না। আপনি একসঙ্গে কত কিছু ভালোবাসেন। আমিও তো অনেক কিছু ভালোবাসি।'

অপূর্ণা বলল, 'চোখ বন্ধ করো।'

'কেন?'

'করোই না।'

'এই যে।'

'হাঁ করো—'

'চকোলেট!'

'তুমি ভালোবাসো না?'

'খারাপ লাগছে না।'

'শিগগির সেরে ওঠো বুঝলে, শুয়ে থাকা চলবে না।'

'আমি তো আজি উঠতে পারি। বউদি ছাড়ে না যে।'

অপূর্ণা বলল, 'আমি আজ উঠি।'

সুশোভন বলল, 'বসুন না। আচ্ছা: দেশের কথা বলছিলেন, কি চিন্তা করেন?'

অপূর্ণা হাসল। 'সে অনেক ভারি ভারি চিন্তা।'

সুশোভন বলল, 'বইয়ে লেখা আছে বুঝি?'

'তাতো থাকবেই।'

'দেশকে আপনি ভালোবাসেন?'

'কে না বাসে। তুমি বাসো না?'

'বুঝি নে।'

'কেন বোঝো না?'

'আমি তো বই পড়িনে—'

'না-পড়লে তো চলবে না সুশোভন। দেশপ্রেম একটা আবেগ। কিন্তু আবেগ হলেই চলবে না। আবেগকে কাজে রূপ দিতে চাই জ্ঞান। দেশ তো কল্পিত বস্তু নয়, মানুষ। ধনী-গরিব, কত রকমের মানুষ, কত বিরোধী সমস্যা। ধনীর চোখে দেশের চেহারা এক, গরিবের কাছে আর-এক। বেশি-লোকের কল্যাণের পথই দেশপ্রেমের পথ।'

সুশোভন বলল, 'তবে আমাদের ঘৃণা করেন কেন?'

'ঘৃণা। অহো।' অপূর্ণা হাসল। 'ওটা এক ধরনের গোঁড়ামি। নিজেদের আলাদা করে দেখবার অহংকারও বলতে পারো।

সুশোভন আহত হল। 'অহংকার করে ঘৃণা করবেন?'

'করি।' অপূর্ণা বলল: 'জানো না দেশের কাজের ঠিকেদারি নিয়েছি

আমরা। বয়েস কম হলে কি হবে দায়িত্ব বেশি, তাই ঘৃণা করবার গার্জিনি করবার অধিকার আমাদের আছে।'

'আপনি আমাকেও ঘৃণা করেন?' সুশোভনের চোখে অবিশ্বাস।

'আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি বলেই তো কাছে আসতে পেরেছি।'

'আমি আপনাকে ঘৃণা করি। কখ্খনো নয়। মিথ্যে কথা।'

অপূর্ণা বলল, 'আজ থাক। অন্যদিন হবে। চলি।'

অপূর্ণা বেরিয়ে গেল।

সুশোভন মূক, নিথর।

কান্নার মতো কেমন এক অনুভূতি তাকে গ্রাস করছে। কেমন অসহায়তা বোধ করল সে। অনেক ক্লান্ত ও দুর্বল লাগল। মনে হল অসুখ থেকে আর সে উঠতে পারবে না। দুর্বোধ্য একটা রহস্য হাজারো পাকে তাকে জড়িয়ে ধরছে। সুশোভন ছটফট করে, যন্ত্রণা। মাথার ভেতরটা ভারি। বউদি—সুশোভন মনে মনে ডাকল। কোনো সাড়া নেই। নিঃশব্দ। বরফের মতো হিমেল স্রোত বুকের রক্তকে পর্যন্ত শীতল করে দিচ্ছে। সুশোভন ঠকঠক করে কাঁপছে, দাঁত খটখট করে বাজছে, আঙুলগুলি স্তব্ধ। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তারপর হুলদেটে অন্ধকারের যবনিকা তার দৃষ্টিকে আবরিত করে দিল।

না। সুশোভন আর কথা বলবে না।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর সুশোভন আবার বেরুল বাড়ি থেকে। বেশ রোগা হয়েছে। মুখ চোখ শীর্ণ। আর অতি সহজেই কেমন চোখে জল আসে। একলা এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। কারুর সঙ্গে কথা বলে না। নিজের মনে কি ভাবে, চিন্তিত দেখায় ওকে। পাড়ার ছেলেরা আশেপাশে ঘুরতে থাকে। লক্ষ্য করে তাকে। কথা বলবার জন্যে উশখুশও করে। ওদের আচরণে সন্ধি করবার চেষ্টা। সুশোভন রাগ করে না ওদের ওপর। যেন ওরা তার মন থেকে মুছে গেছে। ওরা শিস দেয়, সিগারেটের লোভ দেখায়, ওকে শুনিয়ে-শুনিয়ে সিনেমার টিকিটের কথা বলে। তবু সুশোভনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না।

সেদিন অনেক দিন পর বাইনকুলার হাতে সন্ধ্যের ছাদে উঠে এল সুশোভন। আলো জ্বলছে অপূর্ণাদের ঘরে। কিন্তু বাতির আলোটা মড়ার মতো হিমশীতল কেন। কোন কথা নয়, হাসি নয়। গানও নয়।

জানলার কাছে সে বসে নেই। চুল উড়ছে না, শাড়ির প্রান্তও নয়। খাটে শুয়ে আছে অপূর্ণা, হাত দুটো মাথার নিচে। অসুখ? নাকি ভাবছে। ওর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না। শরীরটা মনে হল ক্লান্ত, অবসিত। রজত আসেনি। তাই! রজত আর আসে না পাড়ায়। কেন বাইরেও কি দেখা হয় না ওদের? কেন অপূর্ণা তো যখন তখন বেরুতে পারে। তবে হয়তো বিকেলটায় দেখা হয়েছে দু'জনের। সারা বিকেলের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে অপূর্ণা। সুশোভন ছাদের কার্নিশ থেকে নেমে এল। পায়চারি করল ছাদে। তারপর চাঁদ দেখল, নক্ষত্রের বুটি। মনটা এই মুহূর্তে খালি খালি লাগল। যেন অনেক হাওয়া ঢুকে পড়েছে ফুসফুসে। কাশল সুশোভন। আমার যক্ষ্মা হয়েছে—বলল আপন মনে। গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করল। শরীরের ভেতরটা জ্বালা-জ্বালা। হঠাৎ একটা চিৎকার। কান পাতল সুশোভন। চিৎকার নয়, কান্না। ডুকরে ডুকরে ইনিয়ে বিনিয়ে। ছাদের কার্নিশে আবার উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণে বুঝল সুশোভন। ১৭২/৪এর বিনোদবাবু মারা গেলেন। সন্ধ্যার হাওয়া উদাস হল। পাড়ার সন্ধ্যেটা বিচিত্র অর্কেস্ট্রার মতো লাগছে। লক্ষ্মীপুজোর শাঁখের আওয়াজ। রেডিয়োয় শানাইয়ের উচ্চগ্রাম। আর কান্নার মর্মান্তিক কলরোল। এখন মনে হল সুশোভনের কান্নাটা একটা নতুন কিছু নয়, বিচিত্র সুর সমন্বয়ের একক প্রকাশ। বিনোদবাবুর চেহারাটা ভাববার চেষ্টা করল। লম্বাপানা মুখ, ঘাড়টা রোগা এবং কুঁজো। চোখ দুটো গর্তে ডোবা। দীর্ঘদিন হাঁপানিতে ভুগলেন। ওঁর রাতজাগা কাশির ঘড়ঘড় পাড়ার লোকদের মুখস্থ। বিনোদবাবু আর কাশবেন না।

'সুশোভন—এই সুশোভন—'দুলালের গলা।

সুশোভন নেমে এল নিচে।

'চল। শ্মশানে যেতে হবে।'

সুশোভন গামছা কোমরে জড়িয়ে নিল।

চিতার আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছিল। সশব্দে হাড় ফাটছিল। জ্বলন্ত কাঠটা চিতায় তুলে দিয়ে দুলাল বলল: 'খুব রাগ করেছিস আমাদের ওপর, না?'

চিতার আগুন থেকে প্রচুর ধোঁয়া উঠছিল। সধূম আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিল সুশোভন।

এত পড়াশোনা করে কি হবে? জানেন এই জন্যেই আমি পড়াশোনা করলাম না।'

'এসব কথা এখন ভালো লাগছে না সুশোভন।'

'জানি। ভালো লাগছে শুধু বসে বসে ভাবতে।' সুশোভন বলল: 'লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। সেবার ট্রাম স্ট্রাইকের সময় রাইফেলধারী পুলিশের গাড়ি এসে থামল গলির মোড়ে। লীডাররা সব পালালেন। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়, পুলিশ এসে তার হাতটা বুট দিয়ে মাড়িয়ে গেল। কেউ প্রতিবাদ করল না। আমি নিজে ওকে তুলে নিয়ে এলাম।'

আশ্চর্য চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল অপূর্ণা। সুশোভনের চোখ জ্বলছিল। 'সুশোভন…' বিড় বিড় করে বলল অপূর্ণা।

সুশোভন জোর করে হাসল। 'কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। চলুন। বাড়ি যাবেন না?'

'একটু বসি।'

সুশোভন বলল, 'পয়সা আছে? চা খাব'।

'আছে।' ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল অপূর্ণা।

মাটির ভাঁড়ে চা দিল পশ্চিমী চাঅলা।

'আঃ।' আরামের শব্দ তুলল সুশোভন। 'আমি হলে—' সুশোভন ভাঁড়টা সজোরে ছুঁড়ে মারল: 'লাথি মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতাম।'

'কি বলছ তুমি!' অপূর্ণা বলল, 'স্বার্থপরের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসব। মা-বাবা কষ্ট পাবেন না?'

'সেই যে গান আছে: জলে নামব জল ছোঁয়াব বেনী ভেজাব না। আপনার অবস্থা তেমনি। উঠুন। বাড়ি চলুন।'

'তুমি যাও। আমার দেরি হবে।'

'না। দেরি হবে না। এই জলের সামনে আপনাকে বসিয়ে রেখে যাব এমন বোকা আমি নই।'

অপূর্ণা উঠে দাঁড়াল। গোড়ালির দিকে শাড়িটা টেনে দিল। আঁচলটা বিন্যস্ত করে পায়ে স্লিপার গলাল। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল: 'চলো।'

রাস্তায় নামল ওরা।

'রজতও হয়েছে এমনি অবুঝ। আর এ মুখো হল না। একদিকে

মা আর একদিকে ও।' স্বগতোক্তির মতো বলল অপূর্ণা। 'এত তাড়া করার কি ছিল! বললাম: আর দু'বছর, য়ুনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরোবে। কলেজে চাকরি হবে। তা কি শুনল আমার কথা। যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছে, এমন ব্যস্ততা ওর।'

সুশোভন হাসল। 'আপনার দিক থেকে কোনো ব্যস্ততা নেই?'

রাগত গলায় অপূর্ণা বলল, 'নেই। আমি অপেক্ষা করতে জানি। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে।'

'বাবা, বুড়ো হয়ে যাবেন যে।' সুশোভন বলল। 'তার চেয়ে সহজ যেটা...'

'সহজ বুঝি বাড়ি থেকে চলে যাওয়া?' তীক্ষ্ণ তীব্র গলায় বলল অপূর্ণা: 'একটা মেয়ের পক্ষে বাইরে বেরিয়ে আসা খুব সহজ বুঝি?'

'কেন সহজ নয়? আপনি গ্রাজুয়েট হতে চলেছেন। যে কোনো একটা ইস্কুলে মাস্টারি পেতে বাধা নেই।'

অপূর্ণা স্তব্ধ হয়ে রইল। কী ভাবল। তারপর বলল, 'তা হয় না। বুড়ো বয়েসে মা-বাবাকে দেখবে কে। আমাদের তো কোনো ভাই নেই।'

সুশোভন কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে পরে বলল, 'কি জানেন, অপরাধ নেবেন না। একেক সময় আপনাদের দেখে মনে হয় আপনারা জীবনকে বই পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছেন।'

ক্লান্ত গলায় অপূর্ণা বলল, 'বই পড়ার ওপর তোমার খুব রাগ!'

সুশোভন বলল, 'রাগের কথা নয়। তবে মনে হয় বেশি বই পড়লে মানুষ দুর্বল হয়। জীবনকে শাদা চোখে স্পষ্ট করে দেখতে এত ভয় কেন। জন্মাবার সময় আমরা চোখ নিয়েই এসেছিলাম।'

'এ কথার কি অর্থ হল?'

'জানিনে। আমার কাছে সমস্যাগুলি অতি সহজ, তাই সমাধানও সহজ। আমি মনে করতাম রজতবাবুকে আপনি ভালোবাসেন..."

'বাসি নে কে বললে?'

'বুড়ো লোকের মতো আপনার ভালোবাসা। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে লাঠি নিয়ে গুণে-গুণে।'

'তুমি এমন ভাবে কথা বলো যেন কত বড় হয়ে গেছ।'

'আপনি ঠাট্টা করতে পারেন। কিন্তু তাতে আমার মুখ বন্ধ করা

যাবে না। সত্যি বলছি আপনাদের মতো বই-পড়া ভদ্রলোকদের দেখলে আমার সন্দেহ হয়। মনে হয় আপনারা সকলে গলদা চিংড়ির মতো, রক্ত নেই। সব কিছুই কি আপনাদের সাজগোছ, পাউডার মাখা। ভালোবাসবেন নিজেরা আর তার সমাধান খুঁজবেন মার চোখে। তবে মাকে জিগ্যেস করে ভালোবাসতে পারলেন না কেন? জামা-কাপড়ের ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে বলে আপনারা শাদামাটা জীবনকে ছুঁতে ভরসা পান না। বাইরে বেরুবার স্বাধীনতা পেয়েছেন, কলেজে পড়বার, রেস্তোরাঁয় পুরুষবন্ধুর সঙ্গে গল্প করবার, কিন্তু সেটা যে মার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে, জানতাম না। সাধ আছে সাধ্য থাকবে না কেন বলতে পারেন?'

অপূর্ণা আশ্চর্য হয়ে চাইল ওর দিকে। পরে বলল, 'তুমি এত কথা শিখলে কি করে?'

সুশোভন বলল, 'অবশ্যই বই পড়ে নয়। কেন বুঝতে পারেন না আমাদেরও মন আছে, যন্ত্র নই। এই সংসারে চোখ মেলে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়। মাকে দেখবার জন্যে আপনি তো আটকে গেলেন! রজতবাবুকে দেখবে কে।'

'তুমি আমার মাকে জানো না।'

'নিজের মাকে তো জানি। স্বার্থপরতার নাম মা নয়। আর শুধু শুধু মাকে দোষ দিচ্ছেন কেন। আপনার ভীরুতাকে আপনি মার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। মাকে আপনি ব্যবহার করছেন মাত্র।'

'ব্যবহার।'

'কথাটা কঠিন শোনাল। কিন্তু বিষয়টাও যে অত্যন্ত কঠিন। জানিনে রজতবাবু ভদ্রভাবে শুধু আপনার ওপর অভিমান করে সরে গেলেন কেন। জামাকাপড়ের ভাঁজ একটু নষ্ট হলে কি হত।'

'তুমি হলে কি করতে।'

'আমি। আমি যখন হইনি তখন কি করতাম এখন কি করে বলব। তবে এটুকু বলতে পারি: আমার কাছে ব্যাপারটা এত ভদ্রভাবে উপস্থিত হত না।'

'কি করতে? বাড়ি ছাড়তে এই তো?'

'ছাড়তাম।'

'আর জন্মে বাড়িতে ঢুকতে পেতে না।'

'তখন আমারও একটা বাড়ি হয়েছে।'

'স্নেহ মায়া কর্তব্য...'

'কর্তব্য যে করতে চায় সে বেরিয়ে গিয়েও করতে পারে। আমার কর্তব্য করাতের মতো একজনকে কাটবে, সেটাও কিছু কর্তব্য নয়।'

'কিন্তু বুঝতে পারো না আমাদের এখনও কোনো চাকরি নেই। থাকব কোথায়। খাব কি।'

'নেই। হবে।'

'সেইজন্যই তো ওকে বলেছি অপেক্ষা করতে। এছাড়া আমি কি করতে পারি। আর ততদিনে মা যদি বোঝেন, আমাদেরই ভালো। একটু সময় নেয়া আর কি।'

'দেখুন।' সুশোভন হাসল।

সুশোভন কিছু বলল না। সহস্রমুখ জীবনকে ওই ভাবে সে দেখে না।

অপূর্ণা বাড়িতে পা দিল। সুশোভন ছাদে উঠে এল। এখন সে কি করবে? একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে, একটা কিছু হতে। কিন্তু যথেষ্ট বড় হয়নি সে। অপূর্ণা অপেক্ষা করতে পারে। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে। লক্ষ লক্ষ যুগ—হিসেব করতে চাইল সে। আমার কুড়ি বছর জীবন পূর্ণ হল—বলল সুশোভন। আমি কুড়ি বছরের যুবক। আচ্ছা, আরো বছর চারেক আগে জন্মালে কি তার ইচ্ছেগুলি অন্যরকম হত! সে কল্পনা করল বড় হয়ে গেছে। বড়দের সঙ্গে মেশবার মতো বড়। এবং—হাসল সুশোভন। যদি এখন এই নির্জন সন্ধ্যার ছাদে উঠে আসে অপূর্ণা, হঠাৎ বড়-হয়ে-যাওয়া সুশোভনকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হবে। 'তুমি এত বড় হয়ে গেছ।' বলবে অপূর্ণা: 'আমি ভাবতে পারিনি।'

দুলাল বলল, 'ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে। আয়, বাগানে যাই।'

কলাগাছের আড়ালে কাঠের গুঁড়িতে বসল দু'জনে।

দুলাল পকেট থেকে ভাঁজ-করা কাগজ বের করে বলল, 'পড়।'

'কি ওটা?'

'পড়লেই জানতে পারবি।' দুলাল সিগারেট ধরাল।

কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল সুশোভন। পেনসিলে বড় বড় মেয়েলি ছাঁদে অপুষ্ট হাতের লেখা। পড়তে কষ্ট হয়। অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার করল সুশোভন। কালীপুজোর দিন থেকেই পত্রলেখিকার ভালো লেগেছে

তাকে। শয়নে স্বপনে জাগরণে ইত্যাদি। ওকে না পেলে সে বিষ খাবে। বিষ কোন্ দোকানে পাওয়া যায় যেন বলে দেয় সে। ইতি অভাগিনী পুঁটু।

'পড়লি?' দুলাল জিগ্যেস করল।

'হুঁ। মেয়েটি কে?'

'চিনিস নে। পুঁটু, পুঁটুরানী। ১৭২/২৯-এর। কেলাস্ এইটে পড়ে।'

'ও।'

'মাইরি আমি এর কিছুই জানতাম না। গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাকে হাত নেড়ে থামাল। তারপর ঢিলনোঙর করে এই কাগজটা ছুঁড়ে দিল আমার পায়ের কাছে।'

'হুঁ...'

'শালা, কী গেরো বলতো? কি করি এখন? বাড়িতে দু'বেলা বাবার লাথি-ঝাঁটা। আবার এই ফ্যাসাদ।' দুলাল বলল।

'কিছুই করবি নে। ওপথে হাঁটবি নে মোটে।'

'বিষ খাবে বলেছে!' দুলাল কাতর গলায় বলল।

'তার তুই কি করবি?' সুশোভন বলল।

'একটা কেলেংকারি যদি কিছু হয় আমায় থানায় নিয়ে যাবে...' দুলাল বলল।

'দূর বোকা!' সুশোভন হাসল। 'ও বিষও খাবে না, তোকে থানাতেও যেতে হবে না। মিছিমিছি পাঠিয়ে দে না সোডিয়াম নাইট্রেট, দেখবি ভয়ে হাতেই করবে না।'

দুলাল দম নিয়ে বলল, 'তো আমাকে অমন চিঠি লিখল কেন?'

সুশোভন বলল, 'লিখল কেন তা কি করে বলব?'

'সেই থেকে মনটা হু হু করছে। প্রথম যেদিন বাবার পকেট থেকে পয়সা সরাতে আরম্ভ করি! কেবল খুঁত খুঁত করত মনটা। শালা, চিঠি পাবার পর থেকে তেমন করছে।'

সুশোভন উঠে দাঁড়াল।

'চললি মাইরি? একটা কিছু বলে গেলি না?'

'বললাম তো।' সুশোভন পা বাড়াল।

'আচ্ছা—' দুলাল বলল, 'আমি যদি চিঠি দিয়ে বারণ করি।'

'যা ভালো বুঝিস কর।'

সন্ধ্যেবেলা নিয়মিত বই নিয়ে বসল সুশোভন। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করতে হবে। বইগুলি নতুন লাগে। চিৎকার করে পড়তে পারে না, তা নাহলে বুঝতে পারে না। মনে মনে পড়ে। এবং পড়তে পড়তে অন্য কথা ভাবে। ইস্কুল জীবনের কথা। ভালো ছেলে ছিল। সংস্কৃতের পণ্ডিতমশায় তার বাংলা লেখা দেখে খুব প্রশংসা করতেন। ম্যাগাজিনে একটি রচনাও লিখেছিল বলে মনে হচ্ছে। এক কাবুলিঅলাকে নিয়ে হাসির গল্প। তারপর সেই হাসি শুকল। কলেজে পড়তে এসে দেখল ইস্কুলের বিদ্যা এখানে থই পায় না। কোথায় একটা বড় রকমের ফাঁক আছে। আর সেই ফাঁকের রন্ধ্রপথে বেনোজল ঢুকল, মন উদাস হল। কলেজ পালিয়ে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা, বাথরুমে ধূমপানে হাতেখড়ি।

সেদিনও সন্ধ্যেয় বই নিয়ে বসেছিল সুশোভন, হঠাৎ ঝড়ো কাকের মতো জ্যোৎস্না আর পরিমল ছুটে এল।

'শিগগির আয়—দুলালকে মেরে লাশ করে দিল—' জ্যোৎস্নার চোখে মুখে উত্তেজনা।

'তা আমি কি করব। তোরা যা আমাকে পড়তে দে।' সুশোভন বইয়ের পাতায় চোখ রাখল।

'ও পড়ে পড়ে মার খাবে আর তুই বই নিয়ে বসে থাকবি?'

বিরক্ত সুশোভন জিগ্যেস করল: 'কারা মারছে ওকে।'

জ্যোৎস্না বলল, 'হোমপ্যাথ নলিনাক্ষবাবু। পুঁটুরানীর বাবা।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে এল সুশোভনের কাছে।

'কি করেছে দুলাল?'

'পুঁটুকে চিঠি দিয়েছে। সে-চিঠি ওর মা পুঁটুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নলিনাক্ষবাবুকে দিয়েছে। দুলাল ধরা পড়ে গেছে। পুঁটুই নাকি বলেছে।'

'চল। দেখি।'

নলিনাক্ষবাবুর দরজার সামনে ভিড়টা বৃত্তাকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সঙ্গে অনেক কথা বলার জন্যে কোলাহলের আবর্ত উঠছে। আর অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে দুলাল।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে জনতার মনকে ধরবার চেষ্টা করল সুশোভন। পর্যবেক্ষণ করল মুখগুলি। চারদিকের পরিস্থিতিও লক্ষ্য করল। এপাশে

ওপাশের জানলাগুলি হাট করে খোলা। আর সেখানে কুতুহলী মুখ। ছাতের কার্নিশে হুমড়ি খেয়ে অল্পবয়সী মেয়েরা।

নলিনাক্ষবাবুর গলা শোনা গেল: 'মশায়, বারো বছর বয়েসে আমার বড় মেয়েকে গৌরীদান করেছি। সোমত্থ মেয়ে ঘরে পোষা মানে সাক্ষাৎ আগুন নিয়ে ঘরে বাস করা। নেহাত অর্থাভাবে এতদিন পুঁটুকে পাত্রস্থ করতে পারি নি। আর দেখুন তার ফলটা। এই সব ছোকরাদের জ্বালায়...'

ফলটা যে খারাপ হয়েছে সকলের নীরবতার মধ্য দিয়ে সম্মতি বোঝা গেল।

'এখন আপনারাই বিচার করুন। ওর বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তা উনি বলে পাঠালেন অপরাধ যখন আমার ছেলে করেছে তার বিচার আপনারাই করুন।'

'তা দুলাল কি দোষ স্বীকার করেছে?'

'সেই থেকে জেরা করছি, কতদিনের আলাপ, কি করে আলাপ, তা একেবারে চুপ। বলুন তো রাগ হয় কিনা?'

'ঘা কতক দিয়ে ছেড়ে দিন।' সুপরামর্শ দিলেন একজন।

'না।' ভিড় ঠেলে এবার সুশোভন এগিয়ে এল, দাঁড়াল দুলালের পাশে। 'একতরফা বিচার হয় না।'

'কে হে তুমি ছোকরা? বিচার শেখাতে এসেছ?' হোমপ্যাথ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন।

'ও সুশোভন।' পরিচিতেরা বলল: 'সুশোভন তুমি এর মধ্যে কেন?'

সুশোভন দুলালের জামার কলার ধরে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'চুপ করে আছিস কেন স্টুপিড? পড়ে পড়ে মার খেতে লজ্জা করে না?'

দুলাল বিড়বিড় করে কি বলল, বোঝা গেল না।

'শুনুন—' সুশোভন ফিরল জনতার দিকে 'বিচার যখন হবে তখন যথাযথ বিচারই হোক।'

'তার মানে?'

'পুঁটুরানীকে এখানে আনা হোক।'

'তোমার তো কম স্পর্ধা নয়।' হোমপ্যাথ রাগে তোতলাতে শুরু করলেন: 'আমার মেয়েকে প্রকাশ্যে অপমান করতে চাও!'

সুশোভন বলল, 'অপমান দুলালেরও তো কম হয়নি।'

জনতা থেকে সমস্বর উঠল: 'যথাযথ বিচার হোক। হোক।'

সুশোভন বলল, 'আপনারা দেখেছেন দুলালের চিঠি?'

'দেখিনি।' সকলে স্বীকার করল।

'সেই চিঠি বার করা হোক।'

'হোক।'

হোমপ্যাথ বেকায়দায় পড়লেন। 'সে-চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'কেন? পুড়িয়ে ফেলেছেন কেন? কিসের ওপর বিচার হবে তবে?'

'আমার কথার ওপর বিচার হবে। আমি মেয়ের বাবা।'

'না। তা হতে পারে না।' সুশোভন বলল: 'এর থেকে প্রমাণ হল দুলাল কোন চিঠিই দেয়নি।'

হোমপ্যাথ গর্জন করে উঠলেন: 'আমি মিথ্যা কথা বলছি? আমি মিথ্যেবাদী?' বলেই কামিজ থেকে একটুকরো কাগজ বার করে দেখালেন: 'এই সে চিঠি।'

'দেখি। ওঁদের হাতে দিন। ওঁরা পড়ে বিচার করুন কি লেখা আছে চিঠিতে।'

অনিচ্ছুক হোমপ্যাথ বয়স্কদের হাতে চিঠিটা দিলেন। তাঁরা পড়লেন: 'পুঁটু, তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি বিষ খাওয়ার কথা লিখেছ, কিন্তু জানো না তোমার এই কেলেংকারির জন্য পুলিশ আমাকেই ধরবে। এ ভাবে চিঠি লেখা অন্যায়। আর কোনোদিন চিঠি লিখবে না। দুলাল।'

চিঠি পড়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন ওঁরা। তারপর একজন বললেন: 'চিঠিতে তো দুলালের দিক থেকে কোন দোষ দেখতে পাইনে।'

'পান না?' হোমপ্যাথ যেন আকাশ থেকে আছাড় খেলেন। 'আমার কন্যার কাছে চিঠি লেখাটা অপরাধ নয়?'

'কিন্তু চিঠি পড়ে তো মনে হয় আপনার মেয়েই আগে চিঠি লিখেছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'না। মিথ্যে কথা নয়। দুলাল, চিঠি বার কর—' সুশোভন চোখ পাকাল।

দুলাল ইতস্তত করে বলল: 'আবার ও চিঠি কেন?'

'ন্যাকামি রাখ। যথেষ্ট লোক হাসিয়েছিস। বুদ্ধু কোথাকার।'

অতঃপর পুঁটুরানীর চিঠি বেরুল।

বয়স্ক লোকেরা চিঠি পড়ে ঘন ঘন মাথা দোলালো। 'এ যে রীতিমতো আধুনিক নাটক মশায়। ও নলিনাক্ষবাবু—'

বিচার-পর্ব ভঙ্গ হল। রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন নলিনাক্ষবাবু। ছাদের অল্পবয়সী মেয়েরা অভিভাবকদের ভয়ে পালালো। পট পট করে জানলাশ্রেণী বন্ধ হল। দুলালকে টানতে টানতে ওরা বাগানে নিয়ে এল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কাঠের গুঁড়িতে বসে এবার হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল দুলাল। 'তোরা একি করলি?' কান্না জড়ানো গলায় বলল সে: 'পুঁটুকে মেরে ফেলবে। আমি ছেলে, আমার পিঠে মার খাওয়ার অনেক দাগ, ও মেয়ে, সহ্য করতে পারবে কেন?'

অনেকদিন ভেবেছে সুশোভন ওদের কথা, নিজেরও কথা। বাইরে থেকে লোকে বলবে পাকামি ন্যাকামি। কিন্তু, আশ্চর্য বেয়াড়া রকমের বড় হয়ে গেছে তারা। ঘসা পয়সার মতো অনেক-ব্যবহারে বাইরেটা মলিন হয়েছে বটে, কিন্তু একটু তেঁতুল দিয়ে মেজে নিলে তামা চকচক করে ওঠে। একেক সময় ভাবত এটা বোধহয় বড়দের দেখে বড় হবার অভিনয়। তাই সিগারেট-খাওয়া সিনেমা-দেখা এবং প্রেম-প্রেম খেলা। কিন্তু সিগারেট-সিনেমা এবং প্রেমের মতো এগুলি যে শুধু বড়দের কাছে শেখা অভিনয় মাত্র নয়, তাদেরি মনের রঙে রাঙানো দ্বিতীয় পৃথিবী, এমন করে কোনোদিন ভাবেনি সে। যেন দরিদ্র যাত্রার দলের সম্রাট, ছোটোখাটো রাজামন্ত্রী ওরা। সম্রাটের মতো বিরাট হৃদয় ডানামেলা পাখির মতো ছটফট করছে। দুলাল জ্যোছনা পরিমল। ওরা তারি সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। আমি ওদের ভালোবাসি—সুশোভন আবৃত্তি করল। একেকটা মহৎ প্রাণ লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে। সে প্রাণ লোভ জানে না, স্বার্থ জানে না, ভালোবেসে ক্ষতি আর অপমানকে সহ্য করে। পুঁটুকে দুলাল নিজের মত করে ভালোবাসে, সেখানে খাদ নেই। সে দেবদাস হতে চায় না। সমস্ত আবেগ স্পন্দন উত্তাপ দিয়ে সে ভালোবাসে, সে আনন্দিত হয়, রোমাঞ্চিত হয়। সর্বোপরি মনেপ্রাণে সে বিশ্বাস করে, অনুভব করে। প্রেমের জন্যে সে কাঁদতে পারে, সে কান্না তস্করের নয়, গৌরবের। দুলালের কান্নায় সে অবাক হয়েছে, অভিভূত হয়েছে, কিন্তু তার ভিতরে ওর হৃদয় নিঙড়ানো রক্তাক্ত হৃদয়কে দেখেছে। একই হৃদয় যা সুখেদুঃখে সম্পদে আপদে পাড়ার মানুষকে সাহায্য করেছে। আমি

ওদের জন্যে গৌরব বোধ করি—সুশোভন আবার বলে: আমি ওদের ভালোবাসি।

গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে অপর্ণার সঙ্গে দেখা।

'এই যে বীরপুরুষ।' অপর্ণা হাসল। 'তুমি যে পাড়ার হিরো হয়ে পড়েছ।'

'কোথা থেকে শুনলেন?'

'সৌরভ ভেসে এল।' অপর্ণা মুখ টিপে বলল: 'কী হয়েছিল ব্যাপারটা?'

সুশোভন বলল, 'সব শুনেছেন আর ওইটুকু শোনেননি?'

'না।'

'ছেড়ে দিন ওসব ব্যাপার। কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এখানে এক বাড়িতে টিউশনি করি। পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি। তাই...'

'ভালো। মাইনে পেয়েছেন?'

'কেন শুনি? অত খবরের দরকার কি?'

'চলুন না ওই রেস্টুরেন্টে। কোল্ড ড্রিঙ্ক খাই। গলা শুকিয়ে গেছে।'

অপর্ণা বলল, 'আমাকে দেখলেই তোমার গলা শুকোয়—এটা ভালো নয় তো?'

সুশোভন বলল, 'আর কথা বাড়াবেন না। এর পর খিদে পেয়ে যাবে দেখবেন।'

দু'জনে রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

'কি খাবে?'

'ভিমটো।—আপনি—?'

'অরেঞ্জ।'

স্ট্র দিয়ে গ্লাসের বরফগুলি নাড়তে-নাড়তে অপর্ণা ফের জিজ্ঞেস করল: 'ব্যাপারটা কি হয়েছিল বললে না তো?'

সুশোভন বিষম খেল। 'ব্যাপার যা হয়ে থাকে। আপনাদের ব্যাপার!'

'আমাদের ব্যাপার!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। একই কথা। মেয়েলি কেচ্ছা।'

মুখে রুমাল চেপে হাসি চাপল অপর্ণা। সারামুখ দুষ্টুমিতে ভরে উঠেছে। বলল: 'মেয়েটি কে?'

সুশোভন বলল, 'কে আবার? পুঁটুরানী। হোমিওপ্যাথ নলিনাক্ষবাবুর হাড়জ্বালানি মেয়ে। প্রেমট্রেমের মতো ব্যাপার আর কি!'

অপূর্ণা মুখে রুমাল চেপে এবার খুক খুক করে কাশতে লাগল।

সন্দেহঘন গলায় ওর দিকে চেয়ে সুশোভন বলল, 'এই সময়ে আপনার কাশি পেল।'

অপূর্ণা মুখ থেকে রুমাল সরাল। আন্তরিকভাবে গম্ভীর হতে চেষ্টা করল। কিন্তু সারামুখ কৌতুকের আলোয় প্রতিবিম্বিত হয়ে পড়েছে। মুখ নিচু করে শক্ত ঠোঁট দিয়ে স্ট্র চেপে ধরল। ঠোঁট আরক্ত, ভিজে ভিজে। তারপর মুখ তুলে জিগ্যেস করল: 'তুমি কখনো প্রেমট্রেমে পড়োনি?'

সুশোভন মুখ তুলে তাকাল। নিপুণ চোখে নিরীক্ষণ করল মেয়েটিকে। কপালে খয়েরি টিপ, চোখে দীর্ঘ টানা কাজল, ভিজে রক্তিম অধর, চিবুক। তারপর বলল, 'ও। ইয়ারকি হচ্ছে?'

অপূর্ণা খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর হাসির দাপটে সমস্ত শরীরটা মাতালের মতো দুলে উঠল। আর নিষ্ঠুর ঈর্ষা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল সুশোভন।

'উঠুন।' সুশোভন বলল: 'আর কোনদিন আপনার সঙ্গে কথা বলব না।'

অপূর্ণা হাসল। 'বলবে না?'

'না।'

'পারবে থাকতে?'

'পারব।'

'বীরপুরুষ!' ওর কবজিতে খিমচে দিল অপূর্ণা। 'চলো।'

বেরিয়ে এসে অপূর্ণার সঙ্গে গেল না সুশোভন। উলটো দিকে জোর পায়ে হেঁটে দেশবন্ধু পার্কে ঢুকল। পড়ন্ত সকাল। পুকুরের পাড়ে চুপ করে বসল। খুচরো স্নানার্থীর ভিড়। দুটো কাক নিরালা পাড়ে বসে কা-কা করছে। সুশোভন সিগারেট ধরাল। দু-একবার টান দিয়ে সিগারেটের আগুন নিবিয়ে ফেলল। ভাল লাগছে না—বলল সে। ছোটবেলায় একদিন বাবার লম্বা কোটটা পরেছিল, পরে বাবার মতো বড় হতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। দীর্ঘ কোটের তলায় তার ক্ষুদ্র কলেবর হাঁশফাঁশ করছিল। বড় হতে গিয়ে না পারার লজ্জায় আরো ছোটো লেগেছিল নিজেকে। আমি আজও ছোটো—আবার বলল সুশোভন। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হল অপূর্ণার ওপর। তুমি, তুমি আমাকে ছোটো করে রাখছ—মনে মনে আবারো বলল সুশোভন। তুমি ইচ্ছে করে আমাকে বড় হতে দিচ্ছ না।

আমার বড় হওয়াকে তুমি ভয় করো। যেন একটি কঠিন জিজ্ঞাসার সমাধান পেয়ে গেছে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল সে। এবং সিগারেট ধরাল। তারপর রোদের রঙ ঘন হল, আকাশ ঘসা তামার মতো। উঠে পড়ল সুশোভন।

একদিন একটা স্বপ্ন দেখল সুশোভন।

ধূধূ তেপান্তরের মাঠ। ইতস্তত দুএকটি ন্যাড়া তালগাছ। মাথার ওপরে মধ্যাহ্ন সূর্য। জ্বলছে নরকের আগুনের মতো সমস্ত প্রান্তর। কবন্ধ ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠছে।

সুশোভন একা, সম্পূর্ণ নির্জন দাঁড়িয়ে আছে তপ্ত প্রান্তরে। সারা গা উলংগ, খালি পা। পা পুড়ছে। শরীর ঘেমে গলে তরল। আর ঠকঠক করে কাঁপছে সে। শীতশীত। চোখের দৃষ্টি মেদুর, আরক্ত, তার চোখের সামনে ধোঁয়া পাক খেতে খেতে আকাশকে আচ্ছন্ন করে তুলল। সুশোভনের মনে হল সে গলে মোম হয়ে যাচ্ছে, অস্থি মজ্জা রক্ত, সে কেমন ভিজে গামছার মতো জবজবে হয়ে পড়ছে। তারপর তার পুরানো শরীরটা তারি চোখের সামনে গলে পড়ে গেল। সুশোভন হতবাক চোখে চেয়ে দেখল: রক্তে পুঁজে ভেসে যাচ্ছে তার পায়ের তলায়। এবং নতুন এক শরীর পেল সে। ভালুকের মতো লোমশ বাঁকা নখ দাঁত। সুশোভন চিৎকার করতে চাইল, পারল না। কেমন গোঁ গোঁ জান্তবধ্বনি বেরুল মুখ গহ্বর থেকে। সুশোভন ঘুরপাক খেল, ধুলোয় গড়াগড়ি দিল শরীর নিয়ে, তারপর সে ছুটল দিকবিদিক। আর তার সঙ্গে ছুটল প্রান্তর, আকাশ, সূর্য। যেখানে যায় সেখানে প্রান্তর আকাশ সূর্য। হাঁপাতে লাগল সুশোভন। জিভ দিয়ে লালাস্রাব হল, নাসারন্ধ্রে রক্তের আঘ্রাণ। সামনে একটা নদী। হঠাৎ নদীটা ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল। দেখল একটা নারী। সে হাই তুলছে, কোমর থেকে বক্ষ পর্যন্ত তরঙ্গিত ওর শরীর। গ্রীবাভঙ্গি স্কন্ধদেশ স্খলিত চুল ছড়ানো নিতম্ব পর্যন্ত, দেখল সুশোভন। আশ্চর্য, মেয়েটার কোনো আবরণ নেই, স্বচ্ছ শরীর, আর গা দিয়ে রেশমের মতো জল ঝরে। সুশোভন অবাক। মেয়েটি পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঝরনার মতো জলধারায় ওর শরীর প্রবাহিত হচ্ছে। জলের শব্দ শুনল সুশোভন, অশ্রুত সংগীতের মতো, যেন কি-একটা লোকগাথার সুর। ঘন নেশার মতো জড়িয়ে ধরে তাকে। গান শুনে নাচতে লাগল, কদম্বকেশরের মতো শরীরের লোমকূপগুলি খাড়া

হয়ে উঠল, জিভ দিয়ে অনবরত লালাক্ষরণ হচ্ছে। তারপর নিজের শরীরেই কেমন এক উৎকট বুনো ফুলের গন্ধ পেল সে। টলছে সে। গরম নিশ্বাস। চোখ লাল। আর বাতাস যেন তাকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। প্রান্তর গাছগাছালি আকাশ মধ্যাহ্ন সূর্য। তারপর নিজের বুকের ভেতরেই পাহাড় ভাঙার বিকট শব্দ শুনল সে। প্রস্তর লাভাস্রোত আগুন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। সুশোভন উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে।

মেয়েটি ফিরে তাকাল। ফোয়ারায় ঢাকা ওর শরীর। একটি হাত ডানদিকে বুকের ওপর অন্যহাত কোমরের নিচে। মেয়েটি হাসল, উজ্জ্বল রুপালি দেখাল দাঁতের শ্রেণী।

সুশোভন দেখল। শরীরটা লম্বা হয়ে আকাশের তলায় অনেক দূর উঠে গেছে। ঘাড় উঁচু করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে ওর দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এল। সে ভয় পেল এমন কঠিন ঋজু নিরাবরণ শরীর সে দেখেনি। সুশোভন ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওই প্রকাণ্ড শরীরের ছায়ায় নিজেকে তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র খর্ব দেখাল।

মেয়েটি তাকে টানছে। সুশোভন এগিয়ে চলেছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

শরীরের অলংকারগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুশোভন দেখল অন্ধকার। অন্ধকারের একটা গভীর কূপ, কালো জল, শেওলা, বুনো ঘাস। সুশোভন আটকে গেল কূপের মধ্যে, শরীর ফেটে পড়ছে বোবা যন্ত্রণায়, সে চিৎকার করতে চাইল, পারল না। গোঁ গোঁ ধ্বনি, তার হৃৎপিণ্ড ধকধক করছে, সমস্ত শরীর স্প্রিং-এর মতো ওঠানামা করছে। আর, আর...

স্বপ্ন ভেঙে উঠে পড়ল সুশোভন। হিমেল ভয়, চোরের লজ্জায় সারা মুখ বেগুনি। ওর দিকে এখন কেউ লক্ষ্য করলে মনে হত কে যেন তাকে এইমাত্র প্রহার করে গেছে।

সুশোভন অনেকক্ষণ পাথরের মতো বসে রইল। তারপর তার মনে হল সে কাঁদছে। সুশোভন কাঁদল।

চৌধুরীদের মিনি এসে বলল, 'সুশোভনদা, তোমাকে ডাকছে।'

'কে ?' বই থেকে মুখ তুলে বলল সুশোভন।

'অপর্ণাদি। গলির মোড় দাঁড়িয়ে আছে।'

দুপুরের অজগর সাপটা সবে নিশ্বাস ছেড়ে বিকেল এনেছে। জানলার কাছে টুকরো টুকরো রোদ।

সুশোভন জামা গায়ে বেরুল।

গলির মোড়ে অপূর্ণা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে মুখে চাঞ্চল্য।

'কি ব্যাপার?'

'আমার সঙ্গে এস।'

'কোথায় যাব?'

'কথা না বলে এস বলছি।'

ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে ওরা পরেশনাথ মন্দিরের পথ ধরল। বড় বেশি জোরে ছুটছে নাকি অপূর্ণা। বেনীটা পিঠের ওপর ল্যাজের মতো দুলছে। ওকে ভীষণ চিন্তাদীর্ণ এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

সুশোভন বলল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা।'

অপূর্ণা বলল, 'কোথাও নয়।'

পরেশনাথ মন্দিরের একটা বেঞ্চে ধপ্ করে বসল অপূর্ণা। পা দুটো বিবৃত করে বেঞ্চের গায়ে মাথা রেখে হাঁপাল সে। সুশোভনের মনে হল একটা ভেঙে-পড়া ঢেউ।

একটু থেমে সুশোভন জিগ্যেস করল: 'অতঃপর।'

'বলছি, বলছি। আমাকে একটু দম নিতে দাও।'

অপূর্ণাকে দম নিতে দিল সুশোভন।

'বলতে পারো সুশোভন ও এত অবুঝ, এমন ছেলেমানুষ কেন?' হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠল অপূর্ণা।

'কার কথা বলছেন?'

'আঃ তুমি কিছু বোঝো না। জানো দুটো হপ্তা আমার সঙ্গে দেখা করেনি। কোনো খবর পর্যন্ত নয়।'

'হয়তো ব্যস্ত আছেন।' সুশোভন বলল।

'কিসের ব্যস্ততা? ব্যস্ত থাকলেও মানুষ একটা খবর দেয় না, খবর নেয় না। আমি কত রাত ঘুমোতে পারছিনে। সত্যি বলছি আমি পাগল হয়ে যাব।'

'আপনি এমন ব্যস্ত হবেন হয়তো ভাবতে পারেনি।'

'এ অন্যায়। ওর ভীষণ অন্যায়। এভাবে আমাকে কষ্ট দেয়া।'

সুশোভন চুপ করে রইল।

'বলো তো এখন আমি কি করি?' অপূর্ণার গলায় কাতরানি।

'যান না একবার ওঁর বাড়িতে।'

'সে-পথ কি ও রেখেছে। বাড়িতে ঝগড়া করে সবাইকে খেপিয়ে তুলেছে।'

'তাহলে চিঠি লিখুন।'

'লিখেছি। জবাব পাইনি।'

সুশোভন বলল, 'অপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই খবর আসবে।'

অপর্ণা বলল, 'অপেক্ষা! দুটো হপ্তাও কি অপেক্ষা করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?'

সুশোভন আবার চুপ।

অপর্ণা সহসা ওর হাত জড়িয়ে ধরল। 'তুমি, তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো।'

সুশোভন প্রমাদ গণল। 'আমি কি করতে পারি?'

'তুমি ওর খবর এনে দেবে। দেখা করে সব বলবে। আমার চিঠি দেবে। বলো আমার এ-উপকারটুকু করবে?'

সুশোভন কঠিন গলায় বলল, 'মাপ করবেন। আমি পারব না।'

অপর্ণা আহত চোখ তুলে ধরল ওর দিকে। 'পারবে না?'

সুশোভন বলল, 'এ ধরনের কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

অপর্ণা বলল, 'তুমি আমার জন্যে এইটুকুও করতে পারবে না, সুশোভন?'

এই মুহূর্তে ওর ঘামে-গলা বিচ্ছিরি শরীরটাকে ভীষণ স্বার্থপর আর নির্বোধ লোভী লাগল সুশোভনের চোখে।

'এর চেয়ে বলুন দেশপ্রিয় পার্ক থেকে লম্বা দৌড় দিয়ে আসতে কিংবা ট্রামের তলায় মাথা পেতে দিতে, পারব। কিন্তু এই অনুরোধ আমাকে করবেন না।'

'থাক। তোমাকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না।' অপর্ণা আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল: 'তোমার সম্বন্ধে অন্য ধারণা করেছিলাম। তুমি তা নও। তুমি—তুমি আমাকে কামনা করো।'

সুশোভনের মাথায় যেন কে জলন্ত আগুন ছুঁড়ে দিল। 'আপনি একি বলছেন! আমি—'

'চুপ করো। আমি কিছু বুঝতে পারিনে ভাবো?' অপর্ণার চোখে প্রদাহ।

তড়িতাহত উঠে দাঁড়াল সুশোভন। 'এই দিন আপনার চিঠি? শিগগির দিন।' ধমকের মতো গলায় বলে উঠল সুশোভন। দাঁতের তলায়

মাটি কাঁপছে, গোটা আকাশটা যেন ফুটন্ত কড়ায়ের তেল হয়ে ভীষণভাবে ফুলছে। চিঠিটা হাতে নিয়ে সতীস্কন্ধে শিবের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। আর একরাশ পাংশু লজ্জায় ধিক্কারে যেন বেঞ্চের গায়ে আটকে গেল অপূর্ণা। ছি ছি। সুশোভন সম্বন্ধে একথা কি করে উচ্চারণ করল সে। কি করে নিজেকে এমন নাচুস্তরে নামিয়ে আনতে পারল!

ভারি শরীরটা হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল সুশোভন। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, কানের পরদা ঝাঁঝাঁ করছে। মনে হচ্ছে এখুনি তার নড়বড়ে পা দুটো সমেত ভেঙে লুটিয়ে পড়বে ফুটপাথের ওপর। সশব্দে ট্রাম বাস রাস্তা কাঁপিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। অগুনতি জনতার উর্ধ্বশ্বাস যাত্রা। সুশোভনের চোখের সামনে মনে হচ্ছে সব কিছু ঘন স্রোতের মতো। পিছলে যাচ্ছে পাঁকালো মাছের মতো। আর চোখে ঠুলি এঁটে জাদুকরের মতো এগিয়ে চলেছে সে। এ পথ-চলা যেন শেষ না হয়, যেন এ-পথে আর ফিরতে হয় না। আমি মরে গেছি—আমার গায়ে শবের বাসী গন্ধ—বলল—সুশোভন। আজ বিকেল চারটের সময় আমি ইহলোক ত্যাগ করেছি। শুনেছ, সুশোভন বলে ছেলেটা মারা গেছে, কুড় বছরের জীবনটা নিজের হাতে চেপে মেরেছে সে। এই ত্রিশূলের আগায় গেঁথে রেখেছি আমার মুণ্ডু…তোমরা দ্যাখো।

গেল-গেল-গেল। না ডবলডেকার ব্রেক কষেছে। শালা অন্ধা! ড্রাইভার গাল দিল। সুশোভন শুনল না। ওরা ভেবেছে সে জ্যান্ত লোক! সে মরে ভূত হয়ে গেছে। মরা লোক দ্বিতীয়বার মরে না। প্রচণ্ড জোর হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল সুশোভনের। পারল না। গলার ভেতরটা শুকনো, খরার দিনের মাঠের মতো, ফেটে চৌচর হয়ে গেছে।

রাস্তা পার হয়ে গলিতে পড়ল সুশোভন। চিঠির গায়ে ঠিকানাটা আর একবার দেখে নিল। হ্যাঁঃ এই বাড়ি। কড়া নাড়ল সে। যেন ওর হৃৎপিণ্ডটাই নড়ে উঠল।

‘কে?’

‘আমি—’

‘তুমি কে?’

‘রজতবাবু আছেন?’

ভেতর থেকে রজত বেরিয়ে এল। ‘কাকে চাই?’

সুশোভন বলল, 'আপনাকেই। নিন আপনার চিঠি।'

'চিঠি!' রজত অবাক হল।

'পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করবেন।'

পড়ল রজত। পড়ে জিগ্যেস করল: 'অপূর্ণার সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে?'

সুশোভন বলল, 'এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?'

রজত বলল, 'এস না ভেতরে?'

'না। আমাকে এক গ্লাস জল দিন।'

রাক্ষুসে-তৃষ্ণায় নিমিষে জল নিঃশেষ করে গ্লাস ফিরিয়ে দিল সুশোভন। 'দিন। কী জবাব দেবেন। তাড়াতাড়ি করুন।'

রজত জবাবটা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'তোমাকে কিন্তু চিনতে পারলাম না।'

'ওকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারবেন। আচ্ছা নমস্কার।'

আঃ, মুক্তি। রাস্তায় নেমে প্রথম মনে হল সুশোভনের।

দোকানের দড়িতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর এলেমেলো হাঁটতে লাগল। দোকান দেখল। মানুষ। ট্রাম বাস। কে কত আগে যেতে পারে, তার প্রতিযোগিতা। সবাই ব্যস্তবাগীশ, কেজো মানুষ। এই চলন্ত স্রোতে সে একক, স্বাধীন। সে দাঁড়াতে পারে, বসতে পারে, কেউ তাকে নাকে দড়ি দিয়ে পাছায় বেত মেরে ছোটাতে পারবে না। ভিখিরি মেয়েটা তার কাছে দুটি পয়সার আরজি জানাল। আমি ওকে দিতেও পারি নাও পারি—সুশোভন স্বাধীন গলায় বলল। এই দিতে-পারা না-দিতে-চাওয়ার ইচ্ছে তার ভেতরে লুকোলুকি খেলল। সুশোভন ওকে পয়সা দিল। 'রাজা হও' ভিখিরি আশীর্বাদ করল। সুশোভন ওকে ডাকল: 'দাঁড়াও।' সে দাঁড়াল। 'তোমার আশীর্বাদের মানে তুমি নিজে জানো?' 'জানি বইকি বাছা। রাজা হও।' সুশোভন বলল, 'মূর্খ। রাজা বানাবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে তবে তুমি রাজা হলে না কেন?' ভিখিরি হাসল। কোনো উত্তর দিল না। তারপর অন্য খদ্দের ধরতে চলে গেল। সুশোভন গজরাল: মূর্খ। আর-একজনের কাছে পয়সা পেয়ে তাকেও সে রাজা হতে বলবে। একসঙ্গে কতজনকে সে রাজা করেছে। কত যুগ ধরে কত লক্ষবার সে মানুষকে রাজা করেছে। সুশোভন এগিয়ে চলল। আজ বিশেষ করে সে পথ-চলতি মেয়েদের দিকে মনোযোগ দিল। একেকটা মুখ

খ্যাথে, আর সে ছাঁটাই করে। কারুর হাত আছে, গ্রীবা আছে, নিতম্ব আছে, কিন্তু কারুর মুখ নেই। ওরা মুখ বাদ দিয়েই হাঁটছে, শরীরের কাঠামো সাজিয়ে চলেছে। একটা মুখ খুঁজতে লাগল সে অসংখ্য শরীরের ভিড়ে। যে-মুখ তার মনে গাঁথা আছে। নেই। মেলায় হারিয়ে গেছে। সুশোভনের চোখের সামনে ছায়াবাজি মনে হল। ছায়াগুলি নড়ছে, দুলছে।

'কি খুঁজছ ভাই?' লোকটা জিগ্যেস করল।

সুশোভন প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেল। 'তুমি কে?'

'আমি মানুষ।'

'তোমার মুখ কই, চোখ কই—'

'উপড়ে ফেলেছি।'

'হৃদয়?'

'বন্ধক দিয়েছি।'

'তবে তুমি বেঁচে আছ কি করে?'

'আছি। একদিন সব নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলাম। দেখলাম ওগুলো বাজে অকেজো জিনিস। উল্টোডিঙ্গির খালে ফেলে দিলাম।'

'তুমি কি জাত?'

'মানুষ।'

'তোমার ধর্ম কি?'

'মানুষ।'

'তুমি কি করেছ পৃথিবীর জন্যে?'

'জীবনধারণ।'

'কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'তোমার বিবেক, তোমার হৃদয় আমার কাছে দান করো।'

'কি করবে তুমি?'

'ধোবার গাধাকে দান করব। জানো ওদের বড় কষ্ট। ওরা নির্বিবাদে কাজ করে তাই ওদের গাধা বলা হয়।'

'তুমি একটা পাগল।'

'তুমি দেবে না ভাই?'

'না।'

'তোমার এত লোভ, এত তৃষ্ণা?'

'তাই।'

'তুমি বাঁচতে চাও না। তুমি মরবে মরবে মরবে।'

'মরব।'

'তখন তোমার এই বিবেক, হৃদয়ের কোনো মানে থাকবে না।'

'তুমি যাও।'

'ফুল বাসি হলে গন্ধ বেরোয়, নোংরা মাছি বসে।'

সুশোভন হাঁটতে লাগল।

'দাঁড়াও।' সুশোভন দাঁড়াল।

'এই আয়নায় ঢাখো। কি দেখলে? ভাঙা মুখ?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝলে কিছু?'

'ভাঙা আয়নায় ভাঙা মুখ।'

'আয়নাকে দোষ দিও না।'

'তবে?'

'দোষ দাও নিজেকে।'

'কেন?'

'মুখ দেখবার জন্যে ভাঙা আয়নাই আমরা পেলাম কেন?'

'পথ ছাড়ো।'

সুশোভন এগোল।

'আবার দেখা হবে।'

সুশোভন ফিরল।

'আমার নাম সময়। মনে রেখো।'

সুশোভন আর দাঁড়াল না।

কড়া নাড়তে বউদি দরজা খুলে দিল।

'একি চেহারা হয়েছে তোমার? কি করছিলে?' সুশোভনের বউদির কণ্ঠে দুশ্চিন্তা।

সুশোভন বলল, 'মড়া পুড়িয়ে এলাম।'

'কে মরল আবার?'

'রাস্তার একটা লোক।' সুশোভন ঘরে ঢুকে জামা খুলল। ঝুলানো আয়নায় ওর মুখের চেহারা দেখে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে রইল সে।

সারা মুখ শুকনো আমের মতো। চোখ লাল, কোলে কালি। মাথার চুল পিঙ্গল, ঘামে ধুলোয় জট-পড়া। আমার কী অসুখ করেছে—বলল সুশোভন। মুখে হাত চেপে নিশ্বাসের স্বাদ নিল সে। গরম। এখন চোখ ফেটে যদি জল গড়িয়ে পড়ে নিশ্চয় তাও গরম হবে। আমার যক্ষ্মা হয়েছে—আবার বলল সুশোভন। মা, শুনছ, আমার যক্ষ্মা হয়েছে। এই মুহূর্তে স্বর্গতা মার কথা বেশি করে মনে পড়ল। দেয়ালে টাঙানো মার ফোটোর নিচে এগিয়ে গেল। মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। বিড় বিড় করে বলল সুশোভন।

'চা খাবে?'

মা? নাঃ বউদি। বউদি তুমি মা হবে? মনে মনে বলল সুশোভন। আমার একটি মা চাই। ভালোবাসবার। বউদি, তুমি আমার মা হবে। আমি তোমার কোলে একটু মাথা রেখে শোবো, তুমি আমার চুলে হাত বুলোবে। বউদি—?

'সুশোভন, তোমার কি জ্বর হয়েছে?'

'হয়েছে। ভীষণ জ্বর। আমার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছে।'

'পাগলের মতো কথা।' বউদি ওর কপালে হাত রাখল। 'কই, গা তো গরম নয়।'

'আমার রক্তে জ্বর।' সুশোভন বলল।

'তোমার বিশ্রাম দরকার সুশোভন।'

'আমি একটু শোবো বউদি।'

'শোও।'

'তুমি আমার কাছে একটু বসবে বউদি।'

'বসব।'

'জানো বউদি—আমার মা আমাকে নিয়ে একদিনও সুখ পান নি?'

'ওসব কথা এখন কেন সুশোভন? একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো।'

'বউদি আমাকে কেউ ভালোবাসে না? কেউ না।'

'ছেলেমানুষি কোরো না সুশোভন। তোমার দাদা তোমাকে ভালোবাসেন। আমি তোমাকে ভালোবাসি।' বউদি বলল: 'তোমাকে না ভালোবেসে যে পারা যায় না সুশোভন।'

'বউদি—?'

'কি বলো ?'

'না। থাক।'

বউদি উঠল। 'তোমার চা নিয়ে আসি—'

সারারাত বিছানায় ছটফট করল সুশোভন। কেমন ঘোর ঘোর আচ্ছন্নের মতো কাটাল। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বকল। তারপর শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাতালের মতো ঘুমিয়ে পড়ল। বউদি দু'একবার এসে ফিরে গেল।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল তার। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করল না।

'বউদি—'

'এই যে। চা নিয়ে আসছি তোমার।'

বউদি ভোরে স্নান করে। পিঠের ওপর ভিজে চুল খোলা। হাসল বউদি। সকালের আলো যেন হেসে উঠল।

'শোনো। তোমার দাদা বারণ করে গেছেন। আজ বাড়ি থেকে বেরুবে না মোটেই।'

'না।' মাথা ঝাঁকালো সুশোভন।

'বেরুব না।' সুশোভন বলল।

'লক্ষ্মী ছেলে।' বউদি হাসল।

দু'দিন বাড়ির মধ্যে নিজেকে অন্তরীণ রাখল সুশোভন। ঢিলেঢালা খরচ করল সময়। সংসারের কাজে বউদিকে সাহায্য করল। বসে বসে ইস্ত্রি করল বউদির জামা, শাড়ি। দাদার শার্ট। বউদি প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল : 'কে বলে তুমি ইস্ত্রি করতে পারো না ? চমৎকার হয়েছে।'

সুশোভন হেসে বলল, 'টাকা দাও। লণ্ড্রী খুলি।'

বউদি বলল, 'তুমি করবে ব্যবসা। তাহলেই হয়েছে।'

বিকেলে বউদির সঙ্গে বেরুল হকারস্ কর্নারে। জামার কাপড় কিনল বউদি। সুশোভনের পাতলুনের কাপড়, গেঞ্জি। কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে কাটল দিন। তারপর সত্যি-সত্যি বাড়ি থেকে বেরুল সুশোভন। বাগানের ঝোপের আড়ালে দুলাল, পরিমল, জ্যোৎস্নাকে পাওয়া গেল। সুশোভন বসল্ ওদের কাছে।

'দুলাল, একটা সিগারেট দে—'

দুলাল সিগারেট দিল।

জ্যোৎস্না বলল, 'মাইরি তুই তো আর আমাদের চিনতেই পারিসনে।'

সুশোভন বলল, 'টকি শো হাউসে কি বই হচ্ছে রে?'

'ব্রিজ অন দি রিভার কোআই—শালা রোজ হাউস ফুল...' পরিমল বলল।

'চল না। লাইন দিবি?' সুশোভন বলল।

'ট্যাঁক গড়ের মাঠ।' বলল জ্যোৎস্না।

'আমি টাকা দিচ্ছি—'

'তাহলে চল।'

দুলাল বলল, 'আমি যাব না।'

সুশোভন বলল, 'কেন? যাবিনে কেন? রাগ করেছিস?'

জ্যোৎস্না বলল, 'ও বিবাগী হবে। সামনের শনিবার পুঁটুরানীর বিয়ে।'

'জোস্‌না, সব সময় ইয়ারকি ভালো লাগে না।' দুলাল ধমক দিয়ে উঠল।

'তবে যাবিনে কেন?'

'আমার খুশি।'

'দেবো বোমা মেরে!' জ্যোৎস্না বলল, 'শালা দে-দেবদাস হয়েছে।'

'জোস্‌না খবরদার।'

জ্যোৎস্নাকে থামাল ওরা। কিন্তু দুলালকে রাজি করানো গেল না। অগত্যা ওরা তিনজনেই বেরুল। টিকিটের লাইন উপছে পড়ছে রাস্তায়। এখন পেছনে দাঁড়ালে টিকিট পাবার আশা নেই। জ্যোৎস্না গেল সরেজমিনে তদন্ত করতে। লোক গুনল। সিটের সংখ্যা মুখস্থ। না, কোনো আশা নেই। তারপর খুঁজল চেনা লোক পাওয়া যায় কিনা। রাজকিষেণ স্ট্রীটের ভোলা আছে। 'সিনেমা দেখবি?' 'হ্যাঁ।' 'কটা টিকিট?' 'তিনটে।' 'ঢুকে পড় লাইনে।' ভোলা ঢুকিয়ে নিল ওকে। পেছনে গোলমাল উঠল। 'বের করে দাও ওকে।' ভোলা বলল: 'ও ছিল। বাথরুমে গিয়েছিল।' 'হ্যাঁ। ছিলাম।' জ্যোৎস্নাও বলল: 'না থাকলে ঢুকব কেন? নে। সিগারেট খা।' সিগারেট ধরাল দু'জনে। 'মাইরি, সমীর কাল দেখে গেছে বইটা।' ভোলা বলল: 'ব্রিজ ভাঙার যে সিন্‌ আছে না মাইরি, পয়সা উঠে যায়।'

ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠতে পেছনে তাকিয়ে চোখে পড়ে গেল জ্যোৎস্নার। 'এই, এই সুশোভন। এই গ্যাখ—'

ওর কথা মতো দেখল সুশোভন। দেখেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। হয়তো ওরা তাকে দেখেনি। অপূর্ণা আর রজত। সুশোভন আর বাইরে বেরুল না। বেরুলেই দেখতে পাবে ওরা। সিনেমা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থাকতেই ছুটে হল থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে মনে হল আঃ মুক্তি।

আর ছাদে ওঠে না সুশোভন। বাইনকুলার বাক্সে তুলে রেখেছে। হিসেব করে বাড়ি থেকে বেরোয়। চুপিচুপি গলি পার হয়ে বাগানে যায়। বসে দুলালের সঙ্গে। সিগারেট খায়। গল্প করে। সময় ফুরিয়ে দেয় ওদের সঙ্গদানে। অপূর্ণার সঙ্গে দেখা হয় না। কোনোদিন ওকে দেখছে বাড়ি থেকে নামতে, সরে গেছে সুশোভন। দূর থেকে ট্রামরাস্তা পার হয়ে হয়ে ওকে আসতে দেখে গলির আড়ালে ঢুকে পড়েছে। অপূর্ণা কি বুঝতে পেরেছে, নাকি পারেনি। নাকি সেও বেঁচেছে। সুশোভনের মতো একটা নোংরা ছেলের হাত থেকে। আমরা খুব খারাপ—সুশোভন বলল: আমাদের ছায়া মাড়ালেও পাপ। অপূর্ণার একদিনের আঘাত তাকে রাতারাতি বড় করে দিয়েছে। এতদিন যা হতে পারেনি সে। এতদিন পর বাবার দীর্ঘ কোটটা যেন তার গায়ে ঠিক মানিয়েছে। চৌধুরীদের মিনিকে একদিন পাঠিয়েছিল অপূর্ণা। যায়নি সুশোভন। 'বলে দে গে বাড়িতে নেই।' মিনি ফিরে গিয়ে কি বলেছিল, কে জানে। বই নিয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করে সুশোভন। মন বসে না। বইগুলি কেমন পুরনো, হাস্যকরভাবে বাজে ঠেকে। একটা চাকরির চেষ্টা করে সুশোভন। তাদের ওয়ার্ড থেকে করপোরেশন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন সলিসিটার মিত্র। বললেন খাটতে। চাকরি দেবেন। বাড়ি বাড়ি ক্যানভাসিঙে বেরুল সুশোভন দলবল নিয়ে। যোগ্য লোককে ভোট দিয়ে আপনার পবিত্র গণতান্ত্রিক দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করুন। পাড়ার জলকষ্ট চিরস্থায়ী দূর করবার জন্যে করপোরেশনে গিয়েই প্রথম কাজ হবে পাড়ার সুবিধামতো স্থানে একশটি টিউবওয়েল বসানো। রাস্তার নোংরা খাটাল দূর করবার প্রাণপণ প্রয়াস করবেন তিনি। এবং ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি পার্ক। অতএব মিত্র মশাই আপনার ভোট প্রার্থী।

মিত্র মশায়ের বাড়ি অঢেল চা। পাড়ার অন্য সঙ্ঘের যুবক-যুবতী। কেউ পোস্টার লিখছে, কেউ ভোটারলিস্ট কপি। বাইরের ঘরটা সব সময়

কাজের মৌমাছিতে গুনগুন করছে। পোস্টার নিয়ে সুশোভন বেরুল। কোনো দেয়াল কোনো সুবিধাজনক স্থান যেন খালি না থাকে। লাল সবুজ কালির পোস্টারে পাড়া ছেয়ে গেল। চোঙা নিয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলা 'ভোট দেবেন কিসে' এবং 'ভোট দেবেন কাকে'-তে পাড়া সরগরম হয়ে উঠল। একদিন বিপক্ষ দলের সঙ্গে মারামারিও হয়ে গেল। সলিসিটার মিত্র বললেন : কোনো ভয় নেই। থানা-পুলিশ করতে আমি আছি।

বাড়িতে নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই সুশোভনের। যখন তখন ডাক। কোনোদিন মিত্র মশায় গাড়ি নিয়ে হাজির। নতুন এক উত্তেজনায় মেতে উঠেছে সুশোভন।

যতক্ষণ এই ব্যস্ততার মধ্যে থাকে সময় কেটে যায়। সারাক্ষণ সমস্ত চেতনা এমন এক উঁচু তারে বাঁধা থাকে যে নিজেকে নিয়ে ভাববার সময় পায় না। এই কাজের এক নেশা আছে, ধারালো হয়ে থাকে মন। আর, সব সময় মনে হয় যে যেন এক মহৎ কাজের সৈনিক। মিছিল নিয়ে বেরুতে কি পথসভা করতে গিয়ে জনতার মনের সঙ্গে তার মন হারিয়ে যায়। এক সঙ্গে চিৎকার, এক সঙ্গে কুচকাওয়াজ, সকলের একটিমাত্র লক্ষ্য। মিত্র মশায় তাকে বেশি খাতির করেন, বন্ধুর মত পরামর্শ নেন। বলেন : যদি জিতি সুশোভন তোমার জন্যেই। সুশোভনকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর নজর রাখে। এক বিকেলে ওরা সভা করে গেলে পরদিন সেখানে তাদের পাল্টা সভা করতে হয়। কখনো শোনে ওরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কি বলে আসছে, বাধ্য হয়ে আবার তাদেরও যেতে হয়। দরকার হলে মিত্রমশায়কে নিয়েই যেতে হয়। পায়ে হেঁটে তিনি দরজায়-দরজায় ঘোরেন। কখনো বলেন না : আমাকেই ভোট দিবেন। যাকে দেবেন বিচার করে দেবেন। আমার পার্টি নেই, আমি একা, ব্যক্তিমাত্র। আমি আপনাদের হাতে চাঁদ এনে দেবো না, তবে পাড়ার জলকষ্ট, বর্ষাকালে রাস্তার ড্রেনের অবস্থা, জানি এগুলি বিরাট কোনো কাজ নয়, তবে আমার সামান্য সাধ্যমতো আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, এই ছোটখাটো কাজগুলি করবার চেষ্টা আমি করব। বিরুদ্ধ পক্ষ ইস্তাহার ছড়ায়, পাল্টা বিজ্ঞাপন তাদেরও ছাড়তে হয়। আসল কথা মানুষের চোখের সামনে নামটাকে সবসময় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। যেন চলতে-ফিরতে মানুষের নামটা অভ্যেস হয়ে যায়। সুরেলা ছড়া বাঁধে।

সুশোভনের স্বরচিত। বাচ্চারা সুর পেয়ে ছড়াকে দিনরাত তাদের খেলার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। খাটতে-পারার মধ্যে যে এমন আনন্দ আছে, উৎফুল্ল-উৎসাহ, এই স্বাদ এমন করে সুশোভন পায়নি। বিয়ে-বাড়ির উৎসবকেও হার মানায়। স্বয়ং মিসেস মিত্র তাঁদের নিজের হাতে পরিবেশন করছেন। জ্যোৎস্নার মাথা ফেটে গিয়েছিল নিজের হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন। স্বামীস্ত্রী দু'জন যেন হরগৌরী। মেয়ে মীনাক্ষী তাদের সঙ্গে বসে পোস্টার লিখছে, সে-এক দৃশ্য বটে। মেয়েটি যেন এক ঝলক হাসি। আনন্দের ঢেউয়ে দেহমন গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। এই ভাবে কাছে আসতে পারা, কজন পেরেছে। অনেকদিন মীনাক্ষী তাকে নিয়ে মেয়েদের বাড়িতে-বাড়িতে গিয়েছে। ব্যাগে চকোলেট-লজেন্স, কাউকে মাসিমা-পিসিমা-দিদিমা বলে এবং কখনো বাচ্চাদের কোলে নিয়ে সশব্দে চুমু খেয়ে লজেন্স ইত্যাদি দিয়ে সমস্ত পরিবেশকেই অনুকূল করে দিয়েছে। বস্তিতে গিয়ে ধুলোমাখা নোঙরা বাচ্চাদের সঙ্গে মাটিতে বসেই খেলেছে। অদ্ভুত কাজের মেয়েটি। তারপর ক্লান্ত হয়ে একেকদিন সুশোভনের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে প্যাটিস খেয়েছে, ছড়িয়েছে, হাসতে-হাসতে সুশোভনের প্লেটে খাবার তুলে দিয়েছে। সুশোভন বাধা দিতে পারেনি। 'তোমার কি মনে হয় সুশোভন, আমরা জিতব?' প্রশ্ন করেছে। সুশোভন বলল: 'নিশ্চয়ই।' তারপর চোখের ভাষা চকচক করে মীনাক্ষী বলেছে: 'কি জানো? দারিদ্র্য কোনো দুঃখের কারণ নয়। তার চেয়েও বেশি মানুষ একটু স্নেহ চায়, সান্ত্বনা চায়। মানুষ মিষ্টি কথার ভক্ত।' সুশোভন হাসে। বলে: 'মিষ্টি মুখেরও।' 'জানো, বাবা আমাকে কিছুতেই নামতে দেবে না। বললাম: বাবা এইভাবে জিততে পারবে না। আমাকে ছেড়ে দাও, ছাখো আমি কি করি।' সুশোভন বলল, 'সত্যি ছেলেরা উৎসাহ পাচ্ছে।' রাস্তায় ওদের দেখে আড়ালে কেউ বিশ্রী মন্তব্য করে। কুৎসিত কৌতূহল। সেগুলো কানে যায় দুজনেরই। সুশোভনের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, মীনাক্ষী হাসে। এই পরিস্থিতিতে রাগ করবার উপায় নেই ভেবে রাগ হজম করে সুশোভন। আর অবাক হয়, মানুষের এই ক্ষুদ্রতা নীচতাকে উপেক্ষা করবার মহত্ত্ব মীনাক্ষী কোথায় পেল।

কলেজ স্ট্রিটের একটি প্রেস থেকে হ্যাণ্ডবিল নিয়ে সবে ট্রামস্টপে এসে দাঁড়িয়েছে সুশোভন আর হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল।

'কই, পালাতে পারলে না?' অপূর্ণা শক্ত গলায় জানাল।

একটা ট্রাম এসে পড়েছে। সুশোভন বলল, 'আমার তাড়া আছে। চললাম।'

'না।' কঠিন স্বরে বলল অপূর্ণা। 'তুমি যেতে পাবে না?'

'মানে?' সুশোভন চোখের সামনে ট্রাম ছেড়ে দিল।

'এস আমার সঙ্গে—' অপূর্ণা যেন আদেশ করল।

'দেখুন। সত্যি আমার কাজ আছে।'

'এস বলছি।'

পাবলিক রেস্টুরেণ্টে পারদাটানা ক্যাবিনে অপূর্ণার পেছনে পেছনে ঢুকল সুশোভন। বন্ধ করা ফ্যানটা এবার ছাড়া পেয়ে দস্যিপনা শুরু করল। অপূর্ণা আপাদমস্তক তন্ন তন্ন করে দেখছে তাকে। সুশোভন চোখ নামাল। অনেকক্ষণ দুজনে মূক। তারপর অপূর্ণা মুখর হল: 'কী ভেবেছ তুমি?'

'মানে?'

'কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছ আমার কাছ থেকে?'

'আমি—'

'চুপ করো। আমি কিছু বুঝতে পারিনে মনে করো?'

'দেখুন। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনে।'

'পারছ না?'

'না।'

'বোঝাচ্ছি। কী খাবে বলো? তোমার তো আমাকে দেখলে তেষ্টা পায়?'

বিচিত্র এই মেয়েটির দিকে স্তব্ধ বিহ্বলতায় চেয়ে রইল সুশোভন। তারপর ধরা গলায় বলল: 'দেখুন আমি আপনার ঠাট্টার যোগ্য নই। আমি অত্যন্ত ছোটো...'

অপূর্ণা বলল, 'খুব কথা শিখেছ দেখছি।'

সুশোভন চুপ। বয় দু'গ্লাস জল দিয়ে গেল।

'পুডিং দু' প্লেট।' অপূর্ণা অর্ডার করল।

সুশোভন মুখ নিচু করে বসে রইল। ও আজ আর মাথা তুলবে না।

'এই সুশোভন—' মিষ্টি করে ডাকল অপূর্ণা।

সুশোভন মূক।

'এই—' সুশোভনের ডান হাতটা চেপে ধরল অপূর্ণা।

আর, এতক্ষণকার গুমোটের পর হঠাৎ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বিকৃত স্বরে বলে উঠল সুশোভন : 'আমি—আমি আপনার কি করেছি…'

'একি! কাঁদছ তুমি?' অপূর্ণা বলল : 'তুমি না বীরপুরুষ। এই শোনো—'

সুশোভন জলভরা চোখ তুলে ধরল ওর দিকে।

অপূর্ণা হাসল। বলল, 'আর কোনোদিন তোমাকে অমন কথা বলব না।'

সুশোভন জামার হাতায় চোখ মুছল।

অপূর্ণা বলল ফের : 'আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু তুমি চুপ করে থাকলে কি বলে? ভেবেছিলে দেখা না-করলে পালিয়ে বেড়ালেই আমাকে এড়াতে পারবে? তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না।'

সুশোভন তবু চুপ।

'জানো তোমাকে ওকথা বলে আমি এ ক'দিন শাস্তি পাইনি। তোমাকে খুঁজেছি, ডেকেছি। তুমি আসোনি।'

দু'জনে বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।

'আর রাগ নেই তো? অভিমান?' অপূর্ণা চোখ বিবৃত করে হাসল।

'না।' সুশোভন কোনো রকমে বলল, বলতে পারল।

বাড়িতে ফিরে নিজের মনের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল সুশোভন। এই মেয়েটির কাছে সে হারল। যেন বারবার হারবার অদৃশ্য দাসখত লিখে রেখেছে সে। অপূর্ণা তাকে বাঁধছে, তার স্বাধীনতা হরণ করছে। কেন এমন হল? কেন তখন চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে? আমি সুশোভন, কাঁদলাম। এবং একটি অপরাধিনী মেয়ের সামনে। মেয়েটি বলল : অমন কথা আর কোনোদিন বলব না। ব্যস। অম্নি মুগ্ধ হয়ে গেল সুশোভন। কে জানে, বারবার অপরাধ করে অপূর্ণা আবার একই অনুশোচনার পুনরাবৃত্তি করবে! আসলে অপূর্ণা সুশোভন সম্বন্ধে অমন চিন্তা করতে পারল কি করে! আমি ওকে কামনা করি—সুশোভন বলল। না। অপূর্ণার সেদিনকার স্বার্থপরতা লোভে-গলা মুখের ছবি মনে পড়লেই কেমন আহত আতংকে স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন্ রূপটা ওর আসল! তার মতো সামান্য মানুষের হৃদয় নিয়ে একি নিষ্ঠুর খেলা খেলছে অপূর্ণা। এক সময় অপূর্ণাকে একটা জটিল ধাঁধার মতো মনে হয়। এবং তার দেহমন বারবার এই মূর্তিমতী ধাঁধার কাছ থেকে প্রতিহত হয়ে আসে। অপূর্ণা কখনো

কুয়াশা, কখনো মেঘ, কখনো চাঁদ, কখনো সকালের আলো, সব জড়িয়ে সে বহুরূপী আকাশ। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল সুশোভন।

তার মনে হল ভেতর থেকে কি-একটা ভারি বোঝা তাকে ক্লান্ত, ম্লান করে দিচ্ছে। বোঝাটা কথা কয়ে উঠল: 'আমি জীবন।' এই জীবনরূপ বোঝাটা তাকে যখন-তখন ক্লান্ত করে তুলছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়েস। কু-ড়ি-ব-ছ-র—টেনে দীর্ঘ করে শব্দগুলি। এতদিন সে বেঁচেছে। এ-ত দিন। মানুষ কি করে এতদিন বাঁচে। একটা রহস্য, গোলকধাঁধা। আমার ভেতরে বাঁচার ইচ্ছেই ফুরিয়ে যাচ্ছে—সুশোভন বলল: আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। সুশোভন স্বীকার করল। একেকসময় নির্বাচনের এই কোলাহল অর্থহীন নির্বোধের মতো লাগে। মিছিল, পথসভা, শ্লোগান সবকিছুই তার কাছে কেমন ধ্বনি আর চিত্রের মতো মনে হয়। যেন কেমন সব সাজানো-গোছানো বিষয়। চিৎকারের সঙ্গে বাহুর উৎক্ষেপ, গলা-কাঁপানো ইত্যাদি শস্তা নাটকের মতো মনে হয়। এমনকি মিস্টার মিসেস মিত্রের কাঁধ চাপড়ানো, মিস মিত্রের আবেগ, সবকিছুই যেন দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে, এমন মনে হয়।

মিস্টার মিত্র তাকে চাকরি দেবেন। চাকরি! সুশোভন বিস্মিত হয়ে ভাবল: চাকরি সে নেবে কিনা, তারই ঠিক নেই। আগে ভেবেছিল চাকরি পাওয়াটাই সমস্যা, কিন্তু এখন ভেবে দেখল চাকরি পেলেই সবসময় নেয়া যায় না। নিজেকে মাংস-ছুঁড়ে-দেয়া কুকুরের মতো মনে করতে তার বিবেকে বাধে।

'কে?'

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'নাহ্।'

'আমি সময়। কি বলছিলে বিবেকের কথা?'

'হ্যাঁ। বিবেক। আমি ছাড়তে পারিনে।'

'মূর্খ। তুমি বাঁচবে না। তোমার বাঁচবার অধিকার নেই!'

'তুমি যাও। তোমার কথা শুনতে চাইনে।'

'হবে। আজ নয় কাল।'

সুশোভন শুনল না।

'আজ নয় কাল। নির্বোধ জানো না: আমরা কিছু করিনে। আমরা

হই। তুমিও হবে, হতে হবে। চারদিকে দেয়াল, পারো সেই দেয়ালকে ভাঙতে? একটা প্রকাণ্ড অসম্ভবের মধ্যে আমরা বাস করছি। একমাত্র সম্ভব কি জানো? মৃত্যু। মানুষ মরছে, প্রতিনিয়ত মরছে, ছ্যাকরা গাড়ির লোম-ওঠা ঘোড়ার মতো, আকাশের দিকে ঠ্যাং তুলে, পেটে গর্ত, চোয়াল ভাঙা। মৃত্যু দেখেছ? দ্যাখোনি। পোশাকহীন উলংগ বীভৎস উন্মাদ তার চেহারা। ফুল জমে জমে শব হয়…'

সুশোভন বধির।

'জীবন একটা ঘা, পুঁজ আর দূষিত রক্ত চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে। ক্ষরণ এর নাম। সূর্যের কাছ থেকে মলম নিয়ে এ-ক্ষতকে সারাতে পারবে? পারবে না। সূর্য অনেক দূরে। যতদিন যাচ্ছে সূর্য মানুষের পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।'

সুশোভন পাথর।

সময় কাটে।

এর দু'দিন পরে সুশোভন জামা পরে বেরুচ্ছিল মিনি এসে বলল, 'তোমাকে ডাকছে?'

'কে রে?'

'অপূর্ণাদির মা।'

'আমাকে ডাকছে!' বিস্মিত হল সুশোভন।

চটি পায়ে বেরিয়ে এল ফট ফট করতে করতে। অপূর্ণাদির মা মিসেস দে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সুশোভন এগিয়ে গেল।

'তুমি সুশোভন?' মিসেস দে চোখ দিয়ে জরিপ করলেন ওকে।

'এস। আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ি অতিক্রম করে ভদ্রমহিলার পেছনে ফ্ল্যাটে ঢুকল সুশোভন।

'বোসো এখানে।' মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসলেন মিসেস দে। তারপর বললেন, 'অপুর সঙ্গে তোমার আলাপ কতদিনের? সোজাসুজি জবাব দাও।'

সুশোভন বলল।

'কি করে আলাপ হল?'

সুশোভন তাও বলল।

'তুমি রজতকে চেনো?'

'চিনি।'

'ও।' বললেন মিসেস দে। 'তুমি জানো রজতের সঙ্গে ওর মেলামেশা আমি পছন্দ করিনে।'

সুশোভন ওঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

'অত বড় মেয়ে। বাড়িতে বেঁধে রাখতে পারিনে।' মিসেস দে বললেন: 'তাই বাইরে বেরুনোর স্বাধীনতা আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু সে স্বাধীনতার সে অপব্যবহার করেছে। ইদানীং বেশ রাত করে বাড়ি ফিরছে সে। মায়ের কর্তব্যের দিক থেকেই ওকে আমি বকেছিলাম।'

সুশোভন বুঝতে পারে না, তাকে ডেকে এনে এসব কথা বলবার মানে কি।

'শোনো—' মিসেস দে বললেন: 'কাল রাত্রে অপূর্ণা বাড়ি ফেরেনি!'

'বাড়ি ফেরেনি!' সুশোভনের মুখ থেকে আলগা বেরিয়ে এল।

'এবং এখনো এত বেলা পর্যন্ত তার কোনো খবর নেই।' বললেন মিসেস দে।

সুশোভন কোলের ওপর হাত জড়ো করে স্থির বসে রইল।

মিসেস দে বললেন, 'অজানা বলছিল এ পাড়ায় তোমার সঙ্গেই নাকি ওর যোগাযোগ ছিল। আমার বিশ্বাস তুমি ওর খবর রাখো।'

সুশোভন বলল, 'বিশ্বাস করুন আমি এর কিছুই জানিনে।'

'জানো না?' মিসেস দে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করলেন। মুখের ওপর বিরক্তির আর উদ্বেগের ঢেউ। তারপর চেয়ার টেনে ঘন হয়ে বসে নরম গলায়, 'সুশোভন তোমার মা আছে?'

'নেই।' সুশোভন বলল।

'তাহলে বুঝতে সন্তানের জন্যে মায়ের কি অপরিসীম উদ্বেগ…'

'আমি বুঝতে পারছি।'

'বুঝতে পারছ তবে বলছ না কেন? আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। বলো কোথায় আছে ও?'

সুশোভন বলল, 'বিশ্বাস করুন আমি জানি না।'

মিসেস দে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করিনে। পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাস করিনে। শোনো সুশোভন তোমাকে বলতে হবে, তুমি নিশ্চয় জানো। তুমি কি চাওনা সে ফিরে আসুক।'

'চাই।'

'তবে?'

'খবর পেলে নিশ্চয় জানাব আপনাকে।'

অবিশ্বাসের চোখে মিসেস দে বললেন, 'তুমি তাহলে কিছুই জানো না বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'থানায়। ওখানকার ও. সি. আমাদের আত্মীয়।'

সুশোভন হাসল 'আপনি আমাকে থানার ভয় দেখাচ্ছেন?'

মিসেস দে বললেন 'আমার মেয়েকে আমি ফিরে পেতে চাই।'

'বললাম তো খবর পেলে নিশ্চয়ই আপনাকে জানাব।' সুশোভন উঠে দাঁড়াল। মিসেস দে বাধা দিলেন না।

কোথায় যেতে পারে অপূর্ণা? রাস্তায় নেমে মস্তিষ্ক কোহাহল করে উঠল সুশোভনের। বিনা নোটিশে এইভাবে বাড়ি থেকে চলে গেল কেন সে। যাবার আগে তাকে তো একবার বলে যেতে পারত। কিন্তু, কোথায় যেতে পারে? রজতের বাড়িও তো শত্রুপুরী। তবে ওর কোনো বন্ধুবান্ধব? রজত কি সঙ্গে আছে? এই বিশাল মহানগরীতে কোথায় খুঁজবে তাকে। যে স্বেচ্ছায় হারিয়ে যায় তাকে ধরা যায় না—বলল সুশোভন। রজতের বাড়িতে একবার খোঁজ নেবে? কেন? আমার কি দরকার—আবার বলল শোভন। অপূর্ণা নিজের ভার নিতে জানে। যা করেছে ভেবেই করেছে। তবু মন খুঁতখুঁত করে। কি হত এমন যদি বলে যেত অপূর্ণা। মিসেস দে-কে সে কথা দিয়েছে। সুশোভন কি চায় সে ফিরে আসুক? চায়। কেন? এমন করে যাওয়াতে গৌরব নেই। অপূর্ণা মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যাক রজতের হাত ধরে।

সারা দিন অস্থির যন্ত্রণায় কাটাল সুশোভন। রাস্তায় টো টো করে ঘুরল। যদি দেখা হয়? দেখা হল না। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে এল সুশোভন। ছাদে এসে দাঁড়াল। অপূর্ণার ঘর অন্ধকার, বোবা। অপূর্ণা ফেরে নি। আরো রাত হল। যদি ফেরে সে। পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে এল। দূরে চেরাই কলের খ্যাসখ্যাস শব্দ। আর বড় রাস্তার ভাঙা কল থেকে জল ঝরার আওয়াজ! বিনিদ্র রাত্রি কাটল সুশোভনের।

অপূর্ণা তার কে যার জন্যে তার ঘুম নষ্ট করবে। যতবার ঘুমকে আনতে

যায় ঘুম ছাড়ে। আমি ঘুমোতে পারছিনে—স্থশোভন নিজেকে বলল। চোখ লাল, বুক ধড়ফড়, আর কপালের শিরা দব্‌দব্‌ করছে। কেমন এক কান্নার মতো অসহায় স্বাদ তার চেতনাকে গ্রাস করে। হঠাৎ ভয় পেল স্থশোভন, মেরুদণ্ড বেয়ে কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ল কোষে কোষে। হঠাৎ মাঝরাতে শীতের দিনে গা থেকে কেউ লেপ টেনে নিলে যে নিরাশ্রয় আকুল আর্তি! ভয় পেয়ে ভয়কে তাড়াবার চেষ্টায় নিজের ওপর ভীষণ রাগ করে বসল স্থশোভন। রাগ হল এই মেয়েটি—অপূর্ণা যার নাম—তার খেয়াল স্বেচ্ছাচারিতা দিয়ে তাকে জ্বালিয়েছে, চলে গিয়েও জ্বালাচ্ছে। আমি কেন ওর কথা ভাবব। বেশ ভাবলাম না, ভাবতে চাইনে—গা ঝাড়া দিয়ে বলল স্থশোভন: কিন্তু এ-প্রশ্ন করবার অধিকার আমার আছে। অপূর্ণা পালাল কেন। পালানোই এর নাম। ভীরুর মতো, চোরের মতো। কেন ওর সাহস ছিল না, শক্তি। বুক ফুলিয়ে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে পড়বার সৎ সাহস। গেল তো স্থশোভনকে বলে গেল না কেন। স্থশোভন কি ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কোনোদিন, নাকি দাঁড়াবার সামর্থ্য ছিল। অপূর্ণা কি স্থশোভনকেও শত্রু ভাবে। কিংবা বলবার গরজ বোধ করেনি। স্থশোভন তার আত্মীয়জন নয়, বন্ধু নয়। স্থশোভন কিছুই নয়, কেউ নয়। কিন্তু···স্বাভাবিক ভদ্রতা। ভদ্রতা! লোফার স্থশোভনেরা কি ভদ্র। স্থশোভন দমে গেল। এবং দমে গিয়ে আবার নিজের পরেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। স্থশোভন তুমি মরবে, তুমি একটি প্রকাণ্ড নির্বোধ। তুমি নিজের ওজন বোঝো। তোমার বয়স কত! স্থশোভন চুপ করে গেল। এই বয়েসটা যেন তার অপরাধ। মালিকহীন বেওয়ারিশ কুকুরের মতো। ঝড়েও পড়েনা, ছাগলেও মুড়োয় না।

রজতের বাড়ি গেলে হয়তো খবর একরকম মিলতে পারে। কিন্তু সেখানে যাবার কোনো উৎসাহ সে পায়না। ওদের দুজনের নাটকে তার কাটা সৈনিকের মতো ভূমিকা। ওরা তার চেয়েও বয়স্ক, বই পড়েছে বিস্তর এবং ভদ্রলোক—স্থশোভনের মতো চ্যাঙড়া ছেলে তাদের কি উপকার করতে পারে। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল সে হতে নারাজ।

পরদিন চিঠি এল অপূর্ণার। আগামী কাল ঠিক বিকেল চারটের সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে অবশ্যই আসবে। জরুরি দরকার। অপূর্ণা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে ট্রাম থেকে নামতেই অপূর্ণাকে দেখল স্থশোভন। একা নয়। সঙ্গে রজত। এবং আরো কয়েকজন সমবয়সী

ছেলেমেয়ে। অপূর্ণার বেশবাসে নতুনত্ব আছে, উগ্র প্রসাধনের স্বাক্ষর। খোঁপাটা উঁচু করে বাঁধা, আর সেখানে একটি রক্ত গোলাপ।

'চিঠি পেয়েছ তাহলে?' অপূর্ণা হাসল। 'আলাপ করিয়ে দি। আমার বন্ধুবান্ধব। এবং এ মণিকা, ওর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছি।'

রজত বলল, 'আর রাস্তায় কেন? চলো।'

রাস্তা পার হয়ে গলিতে ঢুকল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সুইংডোর ঠেলে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে পড়ল সকলে। চেয়ারে বসল। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে সুটপরা ভদ্রলোক। 'আপনারা রেডি।' হাসলেন তিনি। তারপর রজতকে বললেন: অপূর্ণার পাশে বসতে। ছাপানো কাগজটায় জিজ্ঞেস করে করে লিখলেন ভদ্রলোক। তারপর এগিয়ে দিলেন কাগজটা ওদের দিকে। রজত সই করল, অপূর্ণাও। সাক্ষীরা সই করল। 'এখন আপনারা আইনসঙ্গত স্বামী-স্ত্রী হলেন।' হসেলেন ভদ্রলোক। তারপর একটি কাগজ অপূর্ণার হাতে দিয়ে বললেন: 'আমার উপহার।'

ওরা একটু পরে নেমে এল রাস্তায়। ট্যাক্সি ডাকল রজত। দুটো ট্যাক্সিতে সকলে এসে নামল পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্তোরাঁতে। ভোজনপর্ব চুকলে বেরিয়ে এল সকলে। একে একে বিদায় নিল বন্ধুবান্ধবেরা

এবার রজত, সুশোভন আর অপূর্ণা।

ওরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল, হাসল। দেখল সুশোভন।

'কাল কখন?'

'পাঁচটায়!'

'কোথায়?'

'মণিকাদের বাড়ি।'

'আচ্ছা।'

ট্যাক্সি ডাকল রজত।

'এসো সুশোভন।' অপূর্ণার পেছনে ট্যাকসিতে উঠল সুশোভন। 'চলি।' রজত হাত তুলল। টা টা।

গাড়ি ছুটল।

'সুশোভন—'

'কি?' এতক্ষণ পর যেন ঘুম থেকে উঠল সুশোভন।

'তুমি সুখী হয়েছ তো?'

'হয়েছি।' সুশোভন বলল, 'এখন কোথায় যাবেন?'

'কোথায় যাব আবার! বাড়ি! আঃ।' সীটের গায়ে মাথা এলিয়ে দিল অপূর্ণা। রাস্তার চলতি আলোর প্রবাহ ছিটকে পড়েছে ওর মুখে। চোখ-দুটো চকচক করছে। সুশোভন স্তব্ধ মুগ্ধতায় ওর আনন্দের দিকে চেয়ে রইল। গাড়ি থেকে নামতে-নামতে অপূর্ণা বলল, 'এটা এখন তোমার কাছে রাখো তো। দরকার হলে চেয়ে নেবো।'

বিয়ের চুক্তিপত্রটি সুশোভনের হাতে তুলে দিল! অপূর্ণা বাড়ি চলে গেল। বাড়িতে পা দিয়ে কেমন অভ্যর্থনা পাবে অপূর্ণা? হয়তো কেউ কথা বলবে না তার সঙ্গে। চোখ তুলে শুধু লক্ষ্য করবে ওকে। অপূর্ণাও কথা বলবে না নিশ্চয়। ওর মন ভরে রয়েছে। ভ্যানিটি ব্যাগ দোলাতে-দোলাতে নিজের ঘরে ঢুকবে। তারপর খাটের বুকে নরম শরীরটাকে এলিয়ে দেবে। শুয়ে শুয়ে ভাববে। ওর চোখ মুখ যেন কল্পনা করতে পারছে সুশোভন। আজ কি গান গাইবে অপূর্ণা? 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।'

সন্ধ্যার রেডিয়োতে নির্বাচনের ফলাফল বেরুল। সলিসিটার মিত্র জিতেছেন। এতক্ষণ বিড়ির দোকানের রেডিয়োর সামনে ছোকরাদের ভিড়টা দম বন্ধ করে ছিল। এবার স্পিলণ্টারের মতো ছিটকে পড়ল ওরা। জিতল কে? হারল কে? চিৎকারে কান ফাটার জোগাড়। রাস্তায় গড়াগড়ি খেল কেউ, পিক্‌ক দিল, কোমরে হাত দিয়ে নাচল। তারপর ছুটল মিত্র মশায়ের বাড়ি। 'আমাদের মিষ্টি খাওয়াতে হবে।' ছেলেরা বলল। মিষ্টির দোকানে স্লিপ দিয়ে ঢালাও বরাদ্দ করে দিলেন তিনি। 'এ জয় তোমাদের জয়।' গদ গদ কণ্ঠে বললেন মিত্র মশায়। তারপর কেউ গেল মালা আনতে, কেউ ব্যাণ্ডপার্টির খোঁজে। এখুনি পাড়ায় প্রশেসন করতে হবে। মিত্র মশায় হেসে ওদের তরুণ আবেগকে সমর্থন জানালেন। ব্যাণ্ডপার্টি এল। মালা এল। মিত্র মশায়ের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেয়া হল। ব্যাণ্ডে 'প্যার কিয়া তো ডরনা কিয়া' বাজল। আকাশ বাতাস মুখর করে প্রশেসন হেঁটে চলল। মাঝখানে মিত্র মশায়। গলায় মালা। হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে চলেছেন। জিতল কে? হারল কে? 'আপনাদের সেবাই আমার মূলধন—' চেনা পরিচিতদের দেখলে বললেন মিত্র মশায়।

তারপর নির্বাচনের উত্তেজনা ফুরুল। সুশোভন শান্ত হয়ে বসল বাড়িতে।

সেদিন দুপুর বেলায় হঠাৎ অপূর্ণা এসে ঘরে ঢুকল। কেমন ভিজে ভিজে দেখাল ওকে। চুপ করে বসল তক্তপোশে।

'কী হয়েছে?' সুশোভন জিগ্যেস করল।

'বাড়িতে জানতে পেরেছে।' অপূর্ণা বলল, 'আমিই বলেছি। মার দিনরাত গজগজ, পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন। ঠাণ্ডা মানুষ বাবাও মার দলে। এমন কি অঞ্জনা, যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, এই সময়ে সেও আমার বিপক্ষে।'

সুশোভন এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'ওঁদের আপত্তি কোথায়?'

অপূর্ণা বলল, 'মা আই. এ. এস. জামাইয়ের স্বপ্ন দেখছেন। মেয়ের সুখশান্তির কোনো দাম নেই ওঁদের কাছে।'

সুশোভন বলল, 'রজত বাবু কি বলছেন?'

অপূর্ণা বলল, 'দিনরাত চাকরির চেষ্টা করছে। ও চাকরি পেলে আমরা চলে যেতাম। এখন, এই অবস্থায় কি করি, বলো তো?'

সুশোভন বলল, 'মাস কয়েক চালাবারও কি সামর্থ্য নেই আপনাদের? অন্তত কোনো সস্তা হোটেল-বোর্ডিংে?'

অপূর্ণা বলল, 'না। বন্ধুবান্ধবদেরও আমাদের মতো অবস্থা। কেউ পড়াশোনা করছে, কেউ বেকার। আর যারা ইস্কুল কলেজে সামান্য চাকরি করে তাদের নিজেদেরই চলে না।'

সুশোভন মাথা চুলকোলো। 'অন্তত শ'দুয়েক টাকা হলে আপাতত চলে।'

'সেই টাকাই বা কোথায় পাব?'

সুশোভন যেন সমাধান পেয়ে গেছে। 'ঠিক আছে। সে-ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'তুমি কি বলছ?' অপূর্ণার চোখে বিস্ময়।

'একটা উপায় হবে—' সুশোভন বলল: 'রজতবাবুকে বলুন একটি দিন ঠিক করে আপনাকে নিয়ে যেতে। চোরের মত নয়, ঘাড় সোজা করে তিনি নিয়ে যাবেন।'

'তা হয় না সুশোভন।' অপূর্ণা বলল: 'মা বলছেন ও এ বাড়িতে পা দিলেই থানায় খবর দেবেন!'

'আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসব। আপনি কিছু ভাববেন না।'

বিশ্বাস-করল-কি-করল না অস্থির পায়ে চলে গেল অপূর্ণা।

রাজ্যের ভাবনা মাথায় নিয়ে সুশোভন বেঁচে গেল। নিজেকে সে পিতামহ ব্রহ্মা ভাবল। কিন্তু বিধাতা পুরুষের সুবিধে আছে তিনি পাথর। কিন্তু মানুষ বিধাতা হলে তার কাজ করতে হয়। হঠাৎ আবেগের মাথায় অপূর্ণাকে অত বড় আশ্বাস দেবার সময় বিষয়ের গুরুত্ব বোঝেনি সুশোভন। যাদের ভালোবাসি তাদের জন্যে চাঁদ পেড়ে দেয়া কিছু শক্ত কাজ নয় তার কাছে।

দুশো টাকা। টাকাটা হিসেব করতে গেলে কম নয়। দশ টাকার নোটে ভাঙালে তো অনেক হয়। রাস্তাঘাটে দশ টাকা নোটের জলছাপ দেখল সুশোভন। সাজানো দোকান দেখল, আলোক উদ্ভাসিত বাড়ি দেখল, সিনেমা হল, বড়বাজারের অলিতে গলিতে নাকি নম্বরী নোট পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়, সেখানেও দেখল সে। টাকা আছে, অনেক অনেক টাকা। কাবুলিঅলার কাহিনী তার জানা ছিল। একদিন কাবুলিঅলাকেও ধরল। কিন্তু কাবুলিঅলাও হাসে, হাসল, হেসে তাকে যে ভাষায় বিদায় করল সেটা আর যাই হোক দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করা যায় না।

অলৌকিক বহু ক্রিয়াকাণ্ডের কথাও ভাবল সুশোভন। এমন তো অনেক শোনা যায়। কিন্তু কোনো অলৌকিকতা তার কাছে ধরা দিল না।

সুশোভনের মনে হল এই এই সংসারটা একটা বিরাট দানব। আর সে খালি হাতে তার সঙ্গে বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করছে।

দুলাল একদিন বলছিল হরিদার কথা। অন্ধকারে এদিকওদিক কি সব ব্যবসা আছে। মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো ওর দলের লোকজন। বিভিন্ন বয়সের। দুলালকে দলে আসতে বলেছিল। অনেক কাঁচাপয়সা। দুলালকে সুশোভনই বাধা দিয়েছিল সেদিন। এখন মনে হচ্ছে দুলাল যদি ওই দলে থাকত তাহলে সে-ই এই সময়ে টাকা জোগাড় করে দিতে পারত।

কিন্তু...

টাকা চাই। সুশোভন বলল। কে দেবে টাকা? নেই। আমার কেন অনেক টাকা নেই—সুশোভন আবার বলল। বাবা বেঁচে থাকতে আমরা বড়লোক ছিলাম। বাবা কোর্ট থেকে পকেট-ভরতি টাকা নিয়ে ফিরতেন। হিসেব রাখতেন না। বাবা খেতে ভালবাসতেন। যতদিন টাকা এনেছেন খেয়েছেন প্রচুর। বাবা মারা গেলে আমরা গরিব হলাম।

মার গয়না বেচে দাদা পড়াশুনো করল। দাদা আজ চাকরি করে, কিন্তু মার গয়নার দাম আজো উঠল না। বউদির কাছে কি টাকা থাকে?

'বউদি—'

'কেন?'

'বউদি—'

'কি ব্যাপার বলো তো?'

'আমাকে কিছু টাকা দেবে?' সুশোভন বলল।

'টাকা! টাকা কি করবে?' বউদি হাসল। 'কত?'

'শ' দুয়েক।'

'শ' দুয়েক। ও যে তোমার দাদার এক মাসের মাইনে।' বউদি বলল: 'অত টাকা কি আমাদের থাকে ভাই? আমি ভেবেছিলাম দশ পনেরো টাকা।'

সুশোভনকে চিন্তিত দেখাল।

বউদি জিগ্যেস করল: 'অত টাকা কিসের দরকার?'

সুশোভন বলল, 'একজনকে দিতে হবে।'

'না। আমার কাছে নেই।' বউদি হাসল।

সুশোভন ঘরে ফিরে এল।

মা মরবেন। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। মরবার কিছুক্ষণ আগে মা চোখের ইশারায় ডাকলেন সুশোভনকে। 'মানুষ হোস।' মা বললেন ওর মাথায় হাত রেখে। শ্রাদ্ধশান্তি চুকবার পর দাদা ডাকলেন। 'শোন— মার এই হারছড়া রাখ তোর কাছে। মার ইচ্ছে ছিল তোর বউ পরবে এ হার।' সুশোভন বলল, 'তোমার কাছে রাখো।' 'না।' দাদা বললেন: 'জানিস তো রাক্ষুসে সংসারটাকে। তোর কাছে রাখ।'

সুশোভন তোরঙ খুলল। জামা কাপড়ের তলায় এই হারটা এতদিনে কাজে লাগল। হারটা হাতে নিয়ে আবার মার মুখ মনে পড়ল। মা বেঁচে থাকতে আমাকে নিয়ে সুখী হননি—সুশোভন বলল। স্বর্গে গিয়ে কি হবেন?

সন্ধ্যার মেঘে পলাশ-অন্ধকার নেমে আসছিল। মেঘ-ছেঁড়া আলো সুশোভনের মুখে। চোখদুটো ছোটো ছোটো এবং জলের মতো চকচক করছে। নির্বাক নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে যেন ধ্যানে নিমগ্ন। মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে

তার ঠোঁট নড়ছে। মন্ত্রের ভাষা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। চোখের সামনে নতুন এক আলোর ভুবন পাপড়ি মেলে ধরছে। সুশোভনের মনে হল সে আলোর তরঙ্গ তাকে দোলাচ্ছে, এবং দুলতে দুলতে দুলতে, কী আশ্চর্য, সুশোভন অনেক বড় হয়ে গেল, বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে সে যেন দেহে-মনে সম্পূর্ণ এক পুরুষ হয়ে উঠল। তার ধমনীতে রক্ত নতুন জোয়ারের জলের মতো শব্দ করে উঠল, তার পেশীতে তুফানের ঘোড়া, গলার স্বর ভারি হয়ে উঠল। অকস্মাৎ নিজের এই পরিবর্তনে সুশোভন অবাক হল। পেছন ফিরে দেখল তার কৈশোর বয়ঃসন্ধি সাপের নির্মোকের মতো পড়ে আছে, সুশোভন পিছনের দিনগুলির জন্য ব্যথা বোধ করল, গভীর দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় মিশে গেল। আমি বড় হয়ে গেছি, আমার পৃথিবী বড়—সুশোভন বলল: আমি আর চেষ্টা করলেও কোনোদিন আর সেই ছোটোতে ফিরে যেতে পারব না। আমার নতুন চিন্তা, নতুন বাস্তব, আমার যৌবনের চোখ দিয়ে দ্বিতীয় পৃথিবীকে খুঁজে পেতে হবে, তিলে তিলে আবিষ্কার করতে হবে।

অপর্ণাকে এই মুহূর্তে তার শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে হল। অপর্ণা, তুমিই আমাকে বড় করে দিয়েছ—সে বলল: এরপর আর আমি ছোটো হব না।

সুশোভন ঘাড় ঋজু করে দাঁড়াল।

ট্যাক্সি থেমে নামল রজত সুশোভন। দুলাল জ্যোৎস্না পরিমল কথা মতো আগে থেকেই তৈরি ছিল। রজত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। সুশোভন দাঁড়াল এক তলার সিঁড়ির মুখে। দরজার সামনে যুবসঙ্ঘ।

ওপর থেকে উত্তেজিত গোলমাল ভেসে এল। পদশব্দ। রজত নামছে। পেছনে অপর্ণা।

সিঁড়ির মুখে সুশোভনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন মিসেস দে।

'দাঁড়াও তোমরা।' চিৎকার করে উঠলেন মিসেস দে। তারপর গলা ছুঁড়ে ডাকলেন অজানাকে: 'শিগ্‌গির ডাক্তারের দোকান থেকে থানায় ফোন কর।'

অজানাকে বেরুতে দিল ওরা।

রজত অপর্ণা এবার দরজার সামনে।

'আসুন—' দুলাল ওরা ওদের সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে নিয়ে গেল।

'সুশোভন—' ডাকল অপর্ণা।

সুশোভন ট্যাক্সির সামনে এসে দাঁড়াল।

'সুশোভন, তুমি আর-জন্মে আমার কে ছিলে?' অপর্ণার চোখে জল: 'এস। এস কিন্তু। হোটেলে দেখা করো।'

'ড্রাইভার…' রজত সংকেত করল।

এঞ্জিন রাগত কুকুরের গলায় গরর্ করে উঠল। ঝাঁকুনি খেল গাড়িটা। হর্নের আওয়াজ দিল ড্রাইভার।

'সুশোভন…' কি বলতে চাইল অপর্ণা, শোনা গেল না।

পেছনে এক রাশ ধোঁয়ার মেঘ উড়িয়ে গাড়িটা বড় রাস্তায় মোড় নিল। বিড়বিড় করে বলল সুশোভন: 'মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

প্রভাত

শোভন দীর্ঘ এক বছর পর ছুটিতে দেশে ফিরল। মা বললেন, 'কী চেহারা হয়েছে তোর? শরীরের যত্ন নিসনে।' বাবা গুম হয়ে রইলেন।

শোভনের এই পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িটা আর ভালো লাগল না। মানুষগুলোকেও কেমন প্রাচীন আর সেকেলে বোধ হল। সে উঠোনের পেঁপে গাছটা দেখল, কুয়োতলা। আর ভাঙা টালির রান্নার ঘর।

মফস্বল শহরে গ্যাসের আলোয় সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি নেমেছে।

শোভন বাইরের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। এ বাড়িতে সে যেন নিজেকে অতিথি ছাড়া আর কিছু মনে না করে।

মা নারকেল নাড়ু আর চা নিয়ে এলেন। 'ছাখ, কলকাতার বাবুর আবার মুখে রোচে কিনা।'

শোভন হাসল শুধু। নিজেকে যে একটু বিশিষ্ট বোধ করতে পারছে, এর জন্যে প্রসন্ন হল সে। তার মনে পড়ল, মা কলকাতা ছাখেননি। কালীঘাটে পুজো দেওয়ার দীর্ঘকালের ইচ্ছে মার। মার চলে যাওয়া গতির দিকে চোখ রাখল শোভন। কবে সেই দশ বছরে বউ হয়ে মা এই বাড়িতে এসেছিলেন, এই বাড়িটার মতোই মা পুরনো। এই মুহূর্তে মাকে একবার কলকাতা দর্শন করাবার ইচ্ছে জাগল শোভনের।

এখন সন্ধ্যা নামছে। সারাদিনের ট্রেনের ধকলে শরীর ক্লান্ত। অথচ এখুনি একবার শহর ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে। দু'-একজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে তার চেহারাটা একবার দেখিয়ে আসবে। বেচারারা অনেকেই কলকাতা ছাখেনি।

কিন্তু আজ আর বেরুতে শরীরে কুলোচ্ছে না। অনেকক্ষণ একলা বাইরের বারান্দায় বসে রইল। রাস্তায় ছায়া ছায়া মানুষ। এই শহরটা তার জীবনের অনেকখানি নিয়েছে, শোভনের মনে হল। এর রাস্তাঘাট, দোকানপত্তর, মানুষ তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। যেন তার মা-বাবার মতোই। এঁদের কী সে ভালোবাসে! হঠাৎ এ প্রশ্ন আজ তার মনে জাগল কেন। শোভন মাথা নাড়ল: মা-বাবাকে না ভালোবেসে কী

পারা যায়! কিন্তু বাবা অত গম্ভীর কেন! জন্মের পর থেকেই বোধহয় বাবাকে এমন স্বল্পভাষী গম্ভীর দেখেছে। বাবা কী ভাবেন! সংসারের অবস্থা কী। কিন্তু ভেবে ভেবেও কী বাবা সংসারের চেহারার কিছু উন্নতি করতে পেরেছেন! তারা ক্রমশ নীচে নামছে, গরিব হচ্ছে।

এই অভাব এই দারিদ্র্য ভালো লাগে না শোভনের। কোনোদিনও লাগেনি। বোধহয় এই দারিদ্র্যই তাকে ভীরু, মুখচোরা এবং অপরাধী করেছে। এবং এই কলকাতাবাস তার দারিদ্র্যের কাঁটাগুলোকে ভুলিয়ে দিয়েছে, অথবা ভুলতে না পেরে তার স্বভাবে কেমন একটা ওপরচালাকি ও সুবিধাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করেছে। এবং কার্যকারণহীন একটা খাপছাড়া এলোমেলো আচরণ। পর্যন্ত তার স্নায়ুগুলি সর্বদা বাঁধা তবলার মতো টানটান করে উঠছে।

বস্তুত আজ একটা উগ্র শারীরিকতার তুমুল কোলাহল তার অন্ত চেতনাকে গ্রাস করেছে। যেন জীবনে গর্ব করবার মতো অমূল্য সম্পদ সে অর্জন করেছে, একটা নির্বোধ আত্মসুখ তাকে ঘিরে রেখেছে।

খেতে বসে বাবা বললেন, 'লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?'

শোভন একটু থেমে উত্তর দিল। 'ভালো।'

বাবা বললেন, 'চৌধুরীমশায় কেমন আছেন? সুনন্দ, সুধন্ব ওরা কেমন পড়াশোনা করছে?'

শোভন বললে, 'ভালো।'

'তোর খাওয়া অনেক কমে গেছে—' মা হাসলেন।

'না মা।' শোভন লজ্জাবোধ করল কেমন।

বাবা উঠে গেলেন।

মা বললেন, 'এতদিন পরে এলি দুটো ভালোমন্দ খেতে দেবো, তার উপায় নেই। মুখপোড়া বাজারটাও যেমন হয়েছে···' একটু থেমে: 'হ্যাঁরে পায়ের নখগুলো কাটতে পারিসনে?'

শোভন একটু সংকুচিত হল। মা যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখছেন, তার শরীরকে! হঠাৎ তার প্রখর শরীরচেতনা নিয়ে সে কেমন জড়সড় হয়ে গেল। মাকে তার লজ্জা করতে লাগল। যেন তার শরীরকে মা মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত চেনেন। কোনোরকমে জবাব দিল: 'কলকাতার সেলুনে পায়ের নখ কাটে না।'

'নিজেও তো কাটতে পারিস।' মা হাসলেন।

'কাটব।' শোভন উঠে পড়ল।

উঠোনে পেঁপেগাছটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়োতলায় শেওলা জমেছে। বালতিটা তোবড়ানো, দড়িটাও অজস্র গিঁটে জটিল।

ঘরে ফিরে এল শোভন। হ্যারিকেনটা টিমটিম করে জলছে। মা বিছানা করে রেখেছেন। শোভন জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখল। গাঙ্গুলিদের বাড়ি। ঘুম পাচ্ছে শোভনের। এ বাড়িতে কোনোদিন দরজা বন্ধ করে শোয়নি। কিন্তু আজকে সে দরজা বন্ধ করবার জন্যে এগিয়ে এল।

মা রান্নার ঘর থেকে জানালেন : 'বারান্দার কোণে কুঁজোয় জল রইল।'

শোভন বিছানায় উঠে এল। ঘুম, আহা ঘুম।

সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল শোভন শহর-প্রদক্ষিণে। সকালের রোদমাখা আকাশটা মন্দ লাগছে না। একটা সিগারেট ধরাবে কিনা, ভাবল। ধরাল না। বুড়ো নাপিত রামলাল জিগ্যেস করল : 'দাদাবাবু কবে এলেন? ভালো তো?' 'ভালো।' শোভন খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। সাহাদের মুদিখানা, গোস্বামীদের ছাপাকল, 'টাউন স্টেশনারি' পেরিয়ে এগিয়ে চলল।

দাদুর চায়ের দোকানে ছোকরাদের ভিড়।

বিজন 'হ্যালো' বলে চিৎকার করে উঠল : 'কী চাঁদ, কবে দেশে ফিরলে?'

বিজন, সুকুমার, গৌর, সঞ্জয়। একটা দূরত্বের আনন্দ নিয়ে ওদের দিকে তাকাল।

'তা বাবা, রঙ তো ফরসা করেছ, গায়ে মাংস লাগেনি তো?' গৌর হাসল।

সুকুমার হাঁকল : 'দাদু, তিনটে-পাঁচটা।'

শোভন বলল। 'কেমন আছিস তোরা?'

'কেটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে না। তারপর কতদিন আছিস?'

'দিন-পনেরো।'

'রোজ আসিস মাইরি। তোকে দেখলেও ভালো লাগে।'

'আসব।'

সঞ্জয় বললে, 'গেল মাসে আমি কলকাতা গিয়েছিলাম। তোর কথা মনে হয়েছিল। ঠিকানা জানিনে তো।'

শোভন বললে, 'আচ্ছা?'

গৌর সিগারেট বের করল। 'নে।'

'আজ ম্যাটিনিতে যাবি লছমিঘরে?' গৌর জিগ্যেস করল।

'কী বই?'

গৌর ছবির নাম করল।

'দেখা।'

'যা গান আছে না মাইরি—'

'আচ্ছা শোভন, কলকাতায় অ্যাকট্রেসদের দেখেছিস? আমি তো হাতিবাগানে ছিলাম, একদিন একজনকে দেখেছি ইস্টারএর সামনে—'

'আচ্ছা?' শোভন হাসল।

'একটা চাকরি পেলে চলে যাই। টালিগঞ্জে গিয়ে পড়ে থাকি, মাইরি।'

শোভন বললে, 'এখানকার খবরটবর বল?'

গৌর বললে, 'খবর আর কী থাকবে। সেদিন চারু উকিলের মেয়ে নন্দিতা ওর গানের মাস্টারের সঙ্গে নবদ্বীপে ভেগেছিল। তারপর পুলিশ দু'জনকে ধরে নিয়ে এসেছে। কোর্টে মামলা হচ্ছে। কোর্টে কী ভিড়…'

'তুই ওখানে কিছু পেয়েছিস-টেয়েছিস নাকি?'

'কী?'

'ন্যাকা, প্রেমট্রেম কিছু হয়নি?'

শোভন হাসল। 'না ভাই, ওসব আমার আসে না।'

'কে এলরে আমার ঋষিমশাই…'

'পড়াশুনো করতে হচ্ছে।' শোভন বললে। 'তোরা করছিস নাকি?'

'আমরা নই, ওই সঞ্জয় একটা বাগিয়েছে, ওর বউদির বোন—'

'আচ্ছা?'

'এই গৌর, ভালো হচ্ছে না—' সঞ্জয় শাসানি দিল।

'চুপ কর, এখন পর্যন্ত ওকে নিয়ে সিনেমায় যেতে পারলিনে, আর কথা!'

'গৌর, ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। নির্মলাকে আমি বিয়ে করব।'

'বিয়ে করবি, খাওয়াবি কি? করিস তো মোটর ড্রাইভারি।'

'তোরা থাম।' বিজন ওদের থামাল।

সঞ্জয় বিড় বিড় করে বললে, 'আমি না হয় ড্রাইভার, আর তোরা কী করিস? কেউ উকিলের মহুরী, কেউ কোর্টের দপ্তরী…'

শোভন বহুক্ষণ ধরে উশখুশ করছিল। 'এবার উঠি ভাই।'

ওরা কেউ তাকে আটকাল না।

শোভন রাস্তায় নেমে এল। কেমন খাপছাড়া আলগা আলগা লাগছে। একদিনেই সে হাঁপিয়ে উঠল। এই পুরনো শহরটার যেন আকর্ষণ তার কাছে ফুরিয়েছে। শোভন কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে, এই শহরটা তার নতুন যৌবনকে আমন্ত্রণ জানাতে পারছে না। এখানে থাকতে হলে তাকে কৈশোরের স্মৃতিগুলিই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। এই শহর তাকে বড় হতে দেবে না। মায়ের মতোই বাচ্চা করে রাখতে চায়।

'মা' শব্দটাকে অনেকক্ষণ মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল। মা বোধহয় একটা বোধ, অনুভূতি। যার নামে এমনিতেই কেমন ভাবাবেগ আসে, কান্না পায়। কিন্তু মাকে কী সে ভালোবাসে! এবার আরো চিন্তায় পড়ল সে।

সকালের আকাশটা তামার টাটের মতো ঝাঁ-ঝাঁ করছে। দস্তুরমতো ঘামছে সে। এবং ক্লান্ত।

'কে? শোভন না?'

শোভন থমকে গেল।

পণ্ডিতমশায়। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল শোভন।

'জয়ী হও।' পণ্ডিতমশায় আশীর্বাদ করলেন। 'একদিন বাড়িতে আসিস।'

'আসব।'

'আসিস। তোদের দেখতে ইচ্ছে করে।'

'আপনার শরীর ভালো তো পণ্ডিতমশায়?'

'এই কোনোরকমে তনুরক্ষা, বুঝলে না বাবা। তাহলে আসিস।' পণ্ডিতমশায় ব্যাগ হাতে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

দুপুর উৎরে বাড়ি ফিরল শোভন।

বাবা কোর্টে।

মা বললেন, 'কোথায় টই-টই করে ঘুরলি এতক্ষণ? অসুখ করে যদি।'

শোভন হাসল। 'অসুখ আমার করে না।'

'আহা।' মা হাসলেন: 'বিশ্রাম করে চান কর।'

শোভন তার ঘরে ঢুকল। জামা ছেড়ে বিছানায় কাত হল। আঃ। দেয়ালে জল পড়ে হলদে ছোপ ধরেছে। কতদিন কলি ফেরানো হয়নি।

জানলার ওপরে তার বালক-বয়েসের ফোটোটা। মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। কে তুলেছিল ফোটোটা? মনে নেই। বোতামখোলা শার্ট, হাফ-প্যান্ট, খালি পা, আর হাঁ করা মুখ। ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন ওই হাঁ করা ফোটোটা দেখে বিস্ময়বোধ করল। যেন ওই বয়েস থেকেই বোঝা গিয়েছিল শোভন নামক মানুষটির ভাগ্য এমনি ঘুমিয়েই থাকবে। ঘুম, আহা ঘুম। শোভন হাই তুলল। তারপর ঘুমের মতোই একটা জড়তায় সে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে পড়ছিল—

মার ডাকে চমক ফিরল। মা আবার বললেন, 'মালা এসেছিল। অনেকক্ষণ তোর জন্যে বসে—'

শোভন বললে, 'আচ্ছা।'

শোভন আরো কিছুক্ষণ শয্যায় পড়ে রইল। ভয়ংকর একটা কুঁড়েমি তাকে পেয়ে বসছে। শোভন এখন তার ছড়ানো মনকে গুটিয়ে একটি কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারছে। মালা। এই এক বছরেই স্মৃতি ধূসর হয়ে এসেছে। মালার মুখকে ভাববার চেষ্টা করল। ভাঙা আয়নার টুকরো কাচের মতো তার মুখ যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। অথচ, একটা বোধ, উত্তাপ তাকে আনন্দিত করছে। মহানন্দার তীরে দেখা এক আশ্চর্য আরক্ত সূর্যাস্তের মতো।

হঠাৎ জামা পরে বেরিয়ে এল শোভন।

মা বললেন, 'কোথায় চললি?'

'আসছি।'

মালাদের বাড়ির দরজা খোলা।

শোভন ঘরে পা দিল। 'মাসিমা—অ মাসিমা—'

'শুনলাম কাল এসেছিস, আর এতক্ষণে আসবার সময় হল তোর?' মাসিমা অভিযোগ করলেন।

শোভন বললে, 'একটু বাজারে বেরিয়েছিলাম কিনা।'

'বোস। এত বেলায় চান-খাওয়া-দাওয়া কিছুই করিসনি তো? এখানেই চান করে খেয়েদেয়ে যা।'

'আজ নয় মাসিমা, আর একদিন। মা রাগ করবেন।'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা।'

শোভনের চোখজোড়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করছিল। মালাকে তো ধারে

কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নাকি তাকে দেখে সে লুকিয়েছে। কিংবা রাগ।

'মাসিমা, মালা কোথায়?'

'এইতো এদিকেই ছিল। ছাখো, ছাদেটাদে গেছে বোধহয়।'

শোভন সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ছাদে উঠে এল।

'এই যে।'

'কী এই যে? তোমাকে ছাদে আসতে কে বলল।'

'কেউ না, এমনি চলে এলাম।'

শোভনের চোখ আটকে গেল। এ যেন নতুন মালা। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। কোমর-ভরতি খোলা কোঁকড়ানো কালো চুল। শাদা গ্রীবা, পুষ্ট বাহুপ্রদেশ, আয়ত কপাল, আর ঘন ভুরুর ধনুক। পাতলা ঈষৎ গোলাপী ঠোঁটদুটোর ফাঁকে মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতের পংক্তি।

'খুব উন্নতি হয়েছে তো তোমার।' গম্ভীর গলায় বললে মালা।

'কেন?'

'তোমার দৃষ্টি খারাপ হয়ে গেছে।'

'ও, তাই বলো।' শোভন হাসল।

'আর হাসতে হবে না বুঝেছ? যা চেহারাখানা করেছ!'

'এতদিন পরে ঝগড়া করব বলে এলাম?'

'কে আসতে বলেছিল? কলকাতায় কত আলো, আমার মতো শাকচুন্নির কথা তোমার মনে পড়বে কেন?'

'না, ছাখো সত্যি—'

'আঃ, হাত ছাড়ো।'

'ছাড়ব না।'

'আমি চেঁচাব বলে দিচ্ছি। পাড়া মাথায় করব।'

'করো।'

মালা চেঁচাল না, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'নীচে চলো।'

'না। আগে বলো, কথা দাও, কাল দুপুরে আমাদের বাড়িতে যাবে—'

'উঃ, ডাকাত একেবারে। যাব, ছাড়ো।'

মাসিমা বললেন, 'বাড়ি যা। মা ডাকছে তোকে।'

শোভন বাড়ি ফিরে এল।

মা বকলেন : 'তুই ঠিক আগের মতোই আছিস।'

'মালা মস্ত বড় হয়ে গেছে, আমি তো ভাবতেই পারিনি—'

মা হাসলেন। 'তবে কী ও ছোটোটি থাকবে। গেল ফাল্গুনে চোদ্দয় পড়ল না?'

শোভন হুড়হুড় করে জল ঢেলে চান করল। তারপর খাওয়া চুকিয়ে ঘরে এল। কলকাতায় একটা চিঠি লিখতে হবে। মা বোধহয় কুয়ো-তলায়। শোভন দরজা ভেজিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর দুপুর গড়িয়ে এল।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মালার গলা। ও ঘরে মার সঙ্গে গল্প করছে। এই নিঃসঙ্গ নিদাঘের শয্যায় ভেসে-আসা মালার কণ্ঠস্বর যেন টুং টাং করে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। শোভন নিঃশব্দে বালিশ আঁকড়ে পড়ে রইল। মালা এখন না হয় পরে বাড়ি যাবার আগে নিশ্চয়ই এ ঘরে আসবে। মা ওকে চা খেয়ে যেতে বলবেন, আর পেয়ালা নিয়ে সেও আসবে। প্রতীক্ষার একটা তীক্ষ্ণ সুখ তাকে কাঁটা করে রাখল। একটু আগে ছাদে-দেখা মালার নতুন চেহারা তাকে আবার খুশি করল। যেন বহুদিন পরে তার হারানো একটা প্রিয় গ্রন্থ সে আবিষ্কার করেছে, এমন ভাবল সে। মালা কী কারণে হাসল, ওর হাসিটা তরঙ্গের মতো তার শরীরে রোমাঞ্চ তুলল। যেন শরৎকালের শিশিরভেজা শিউলির কুঞ্জে প্রবেশ করেছে। শোভন আপনমনে গুনগুন করল।

কিন্তু মালা বড় দেরি করছে না আসতে। ওর ওপর রাগ হল। আর, কারুর ওপর রাগ করতে পেরে একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। ইচ্ছাগুলি শাখায় ফুল ফুটিয়ে তুলছে, রেশমের মতো পাপড়ি, আর গন্ধ। হঠাৎ এই মুহূর্তে শোভন তার নিজেরই সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। আয়নায় নিজেকে দেখলে সে বুঝতে পারত তার চোখ লাল হয়েছে, দেহে জ্বর জ্বর উত্তাপ, বুক টিপ টিপ করছে। আর, কেউ তাকে এ-অবস্থায় দেখলে মনে করতে পারত : শোভন একটা গুরুতর অপরাধ লুকোচ্ছে, ছোটোবেলায় বাবার পকেট থেকে একটা টাকা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে দোলের দিন পিচকিরি কিনেছিল! তার কলকাতাবাসের অভিজ্ঞতাগুলি তার চেতনায় প্রহার করছে। শোভনের মনে হল সে শব্দের কারখানায় প্রবেশ করছে,

শব্দ উঠছে-নামছে, ভেঙেচুরে যাচ্ছে। তারপর শব্দগুলো একেকটা আকার নিচ্ছে, হাত, বাহু, কোমর, জানু, পায়ের পাতা, এবং আধখানা কপাল, মুখ, ঠোঁট…। তারপর মনে হল মশারিটা নেমে এসে তাকে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে আবৃত করে ফেলেছে, তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে, গলা শুকনো, এবং একটা মৃত্যুভয় তাকে বিদ্ধ করতে লাগল।

'মা—' প্রাণপণে চিৎকার করল শোভন।

'কী রে?'

'জল খাব।'

মালার গলা: 'আমি দিচ্ছি মাসিমা।'

মালা জল নিয়ে হাজির হল। 'নিন মশায়।'

শোভন অবাকের ভান করল: 'তুমি কতক্ষণ?'

'আহা, আর ঢঙ করতে হবে না…'

শোভন শক্ত আঙুলে ওর কবজি চেপে ধরল।

'আ, ছাড়ো, লাগে যে।'

'এত দেরী করলে কেন আসতে?'

'কী করব? ঘরে এসে দেখলাম ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছ।'

'ঘুম ভাঙালে না কেন?'

'বয়ে গেছে।'

'মালা—'

'আবার তুমি ওইভাবে তাকাচ্ছ আমার দিকে। তুমি না ভীষণ খারাপ হয়ে গেছ।'

'আমার জিনিস, কেন তাকাব না?'

'তোমার জিনিস। আহা।'

'তবে কার?'

'কারুর নয়। আমি নিজের।'

'মালা—'

'হাতের কাছে পেলেই ভাব আসে, না? তোমাদের চিনতে বাকি নেই। কী হচ্ছে? আমার আঙুল খিমচোচ্ছ কেন?'

'বেশ করছি।'

'এমন চুল ধরে টানব না…এই, এই—মাসিমা ও-ঘরে না?'

'মা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'হ্যাঁ। তোমায় বলেছে।'

'মালা—'

'আবার। মা-সি-মা—অসভ্য, অসভ্য, ভারি ছোটোলোক...' মালা আঁচলে ঠোঁট মুছতে-মুছতে সরে গেল।

শোভন উঠে দাঁড়াল। 'আমার ঘুম নষ্ট করে দিলে—'

মালা ফুঁসে উঠল: 'চুপ করো। ছোটোলোক কোথাকার। আর কখ্‌খনো আসব না তোমার কাছে।'

শোভন বলল, 'কাল দুপুরে আসছ না?'

'না। না। না।' মালা মুখে আঁচল রাখল: 'সিগারেট খাও কেন? আমার সমস্ত জামাকাপড়ে গন্ধ হয়ে গেছে।'

শোভন বললে, 'আর খাব না।'

'আহা, সাধুপুরুষ।' মালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে ওর গলা শোনা গেল: 'মাসিমা, আমি যাচ্ছি—'

গ্রীষ্ম-স্বেদ-গন্ধে চারদেয়ালের ঘেরাটোপে দুপুর মূর্ছিত হয়ে রইল।

গায়ের গেঞ্জিটা ভিজে লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে। কপালে এখনো ঘামের বিন্দু। শোভন দেখল এই ঘরে একটা ভিজে ভারি গন্ধ আটকে গেছে। শোভন আবার চিত হয়ে শুল। মাথার ওপরে কড়িকাঠ ক্ষয়ে গেছে, আর কোণে মাকড়সার জাল। একটা টিকটিকি। তারই সমবয়সী হবে বোধকরি।

বিকেলে শোভন একা-একা মহানন্দার ধারে ঘুরে বেড়াল। মহানন্দায় এখুনি চড়া পড়তে আরম্ভ করেছে। ঝিরঝির করে রুপোলী জলধারা বয়ে যাচ্ছে। এপারে কাঠের আড়ত, পাড়ে বড় বড় শালকাঠ শুয়ে আছে। মিত্রদের বেড়া-দেয়া পটলের ক্ষেত। আর দু একটি জেলে-নৌকো।

ইস্কুল পালিয়ে এক নির্জন দুপুরে বিমলেন্দুর সঙ্গে এখানে চলে এসেছিল। ছই দেয়া নৌকোয় শুয়ে শুয়ে ওরা গল্প করছিল। বিমলেন্দু তার থেকে বছর তিনেকের বড় ছিল। সে সিগারেট খেত। বিমলেন্দুর গল্পগুলি আত্মজীবনী এবং হঠাৎ বড় হয়ে ওঠার গল্প। সেই বিমলেন্দু তিন দিনের জ্বরে মারা গেল। ওর জন্যে একদিন ইস্কুলে ছুটি পেয়েছিল। বিমলেন্দুই বোধহয় তার জীবনের মৃত্যুর প্রথম অভিজ্ঞতা। আশ্চর্য, সব

মানুষই একদিন মরবে, শোভনের মনে হল। এবং বিষণ্ণ একটি বোধে সে শূন্য হয়ে গেল।

বালিস্তরে চুপচাপ বসে রইল। আকাশে এক ঝাঁক পাখি, আকাশটা মুহুর্মুহু রঙ পালটাচ্ছে, নৌকো থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। তারপর আকাশ-নদী-বালুভূমি পাতলা অন্ধকারের পরদায় একাকার হয়ে গেল। ওপারে দু' একটি আলোর বিন্দু, জলে আলোর সাপ, মন্দিরের কাঁসরঘণ্টা।

পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মা বেরুনোর শাড়ি পরে শোভনের ঘরে পা দিয়ে বললেন, 'আমি তোর পিসিমার ওখানে যাচ্ছি। তুই আজ আর বেরুসনি যেন।'

শোভন জিগ্যেস করল : 'কখন ফিরবে?'

মা বললেন, 'সন্ধ্যের আগেই ফিরব। সদরের দরজাটা বন্ধ করে দে।'

শোভন দরজা বন্ধ করে ফিরে এল।

উঠোনে পেঁপে গাছটা হাওয়ায় পাতা নাড়াচ্ছে। কুয়োতলায় জল নিয়ে দুটো কাকের কলহ।

সমস্ত বাড়িটা এখন নিঝুম। যেন এইমাত্র এই খালি বাড়িটার সর্বস্বত্ব পেয়েছে, শোভনের মনে হল। মার ঘরে এসে কৌটো থেকে মশলা নিয়ে মুখে পুরল। বাইরের ঘরে চেয়ারে পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট খাবে কিনা ভাবল। কী ভেবে খেল না।

কটা বেজেছে? আড়াইটে? পিওন চিঠি দিয়ে গেল। সুধন্যর চিঠি। ওদের কুশল সংবাদ। শোভন কবে আসছে? মা বাবার শরীর কেমন ইত্যাদি। চিঠিটা রেখে দিয়ে নিজের ঘরে এল। জল খেল। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে একটা বই মুখে দিল। কিন্তু একটি অক্ষরও পড়তে পারল না; তার মনে হল কেমন এক উদ্বিগ্ন অস্থিরতা তার মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। মুহূর্তগুলি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আর, প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাবার সময় যেন তাকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। সময় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। শোভন নিজেকে বন্দী ভাবল। অথচ, ইচ্ছে করলে দরজায় তালা দিয়ে মহানন্দার ধারে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় চলে যেতে পারে। কিন্তু, শোভন কিছুই করবে না, এমনিভাবে শয্যা আঁকড়ে থাকবে এবং সময় হাঙর হয়ে তাকে দাঁতে কাটতে থাকবে।

শোভন উঠে দাঁড়াল। আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার চোখ লাল, আবার সেই জ্বর জ্বর অনুভূতি, গলা শুকনো, এবং নিশ্বাস যেন ছোটো হয়ে আসছে।

সহসা শোভনের মনে হল সে এখন স্বাভাবিক মানুষ নয়, এবং তার ভারুতা, সংকোচ, অপরাধবোধ, আত্মসচেতনতা যাবতীয় তালগোল পাকিয়ে বোঝার মতো তাকে চেপে ধরেছে।

বাইরে দরজায় শব্দ হল। বাবা এলেন? না, বাতাস। শোভন কী মনে মনে চাইছিল কেউ আসুক, এসে এই নিমজ্জমান নির্জনতা থেকে তাকে উদ্ধার করুক। অথচ, কেউ আসবে না, কারু আসা বস্তুত সে চায়ও না।

শোভন আবার ঘরে ফিরে গেল। আবার জল গড়িয়ে খেল। এবং মনে করল চেষ্টা করে একবার ঘুমে তলিয়ে যেতে পারলে মনের এই অস্বাভাবিকতা কাটবে। শোভন চোখে হাত চাপা দিয়ে শুল। এবং প্রতিমুহূর্ত মনে করল সে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ বন্ধ রাখতে সাহস হয় না, কে জানে কখন সে এসে ফিরে যায়!

এমন মিশ্র অনুভূতি কোনোদিন এমন করে তাকে দ্বিধাবিভক্ত করেনি। এবং এই বিচিত্র বোধটারও আসল উৎস সে আবিষ্কার করতে পারল না।

সিঁড়িতে শব্দ।

ডুরেশাড়ি আটকানো মালার শরীর হেঁটে এল।

'কী করে এলে?'

মালা হাসল। 'আর ইয়ারকি করতে হবে না। খিড়কির দরজা কে ভেজিয়ে রেখেছিল?'

'আমি!'

''না ভূত। মাসিমা কোথায়?'

'মা পিসিমার বাড়ি গেলেন।'

মালার চোখে সন্দেহ: 'ও তাই আমাকে আজ দুপুরে আসতে বলা!'

শোভন বললে, 'না সত্যি, আমি জানতাম না।'

মালা ঘরে ঢুকল।

শোভন বললে, 'বসবে না?

মালা বললে, 'থাক।'

মালা পিছন ফিরে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াল।

শোভন কথা না বলে ওকে অনুসরণ করছিল। একটা ভোঁতা উত্তেজনার ধাক্কা আবার শোভনের নিশ্বাসগুলি ছোটো করে দিচ্ছে। আয়নায় কী একবার দেখবে ওর চেহারাটা। সত্যিই কী তার জ্বর আসছে।

মালা তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার এসব ভালো লাগে না—'

শোভনের হঠাৎ রাগ হল। বললে, 'তুমি কী মনে করো আমি জেনেশুনে সুযোগ নিয়েছি? ইচ্ছে হয় চলে যেতো পারো।'

'বাবা, আবার রাগ আছে!' মালা ওর দিকে এগিয়ে এসে ধপ করে পাশে বসে পড়ল। 'কালকে কী করেছ মনে নেই?'

শোভন ওর বাহুমূল আকর্ষণ করে ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিল। মালার সম্পূর্ণ মুখটা এখন শোভনের চোখের নীচে। মালা চোখ বন্ধ করে রয়েছে। ওর চোখের পাপড়ি থরথর করে কাঁপছে।

'মালা—'

'উঁ?'

মালার না, নিজেরই হৃৎপিণ্ডের যেন শব্দ শুনতে পেল শোভন। মালার ঠোঁটের নীচে একটা ছোট্ট ব্রন হয়েছে। শোভন সেখানে আঙুল রাখল।

বাইরে দুপুর ঝাঁঝাঁ করছে।

'মালা, তুমি ঘামছ—'

'আর নিজে?'

বস্তুত গ্রীষ্ম দুঃসহ হয়ে উঠেছে। চাপা ঘরে একফোঁটা হাওয়া বেরুবার পথ পায় না।

'মালা—'

'কী'

'মালা—'

দরদর করে ঘামছে দুজনে। মালার ভিজে চুলগুলো খসে পড়েছে। মালা হাসছে।

মালা পাশ ফিরে ওর কাছে সরে এল। ঘুমের গলায় বললে, 'আমাকে ছেড়ে যেও না।'

শোভন ওর চুলে আঙুল বুলোল : 'না।'

'আর নয় লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।'

শোভন দেখল ও সত্যিসত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর কপাল ঘামে টস-টসে, গলার খাঁজে ঘাম, চোখ বন্ধ, আর আরক্ত ঠোঁটদুটো ঈষৎ কাঁপছে।

শোভন বারান্দায় বেরিয়ে এল। তোয়ালেয় গায়ের ঘাম মুছল। তারপর জল গড়িয়ে খেল। এখন একটা সিগারেট খেলে মন্দ হয় না।

মালা ঘুমোচ্ছে, নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায়।

এখন কটা বাজে? চারটে। বাবার কী আসবার সময় হল! শোভন মালার মাথার কাছে বসল। মেয়েটা পাগলের মতো ঘুমোচ্ছে। বাবা কখন আসবেন? পুনরায় মুহূর্তগুলি তাকে উৎপীড়ন করতে লাগল। নিদ্রিত মালা এখন তার কাছে একটা গুরুভার দায়িত্ব। যতক্ষণ না সে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে ততক্ষণ বোঝাটা নামবে না। মালাকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে। মালা ঘুমের ঘোরে 'উ' বলে পাশ ফিরল। ওর শাড়ির প্রান্ত পায়ের গোড়ালি ছেড়ে ঈষৎ উঁচুতে গুটিয়ে গেছে। কেমন এলোমেলো হয়ে সে পড়ে রয়েছে। আর সম্পূর্ণ নিঃসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

'মালা—'

'উঁ?'

'বাড়ি যাবে না।'

'না।'

'না কী? বাবার আসবার সময় হল—'

'হুঁ—' মালা শোভনের ডান হাত বুকের কাছে টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুল।

শোভনের চোখ জ্বালা করছে এবং ঘুম পাচ্ছে। এতক্ষণ বোঝেনি। সে শক্ত হয়ে বসে রইল।

তারপর কখন মালা উঠে পড়েছে, জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়েছে, তারপর শোভনের দিকে চেয়ে একটু হেসে সে বললে, 'যাচ্ছি।' তারপর আয়নায় দাঁড়িয়ে : 'চুলের কী অবস্থা করেছ? শাড়িটা পর্যন্ত...কী করে বাড়ি যাই বলো তো? ছোটলোক একেবারে!' মালা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল এবং শাড়িটা যথাসম্ভব ভদ্রস্থ করে নিল। তারপর নীচু হয়ে উঠোনে নেমে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শোভন কুয়োতলায় নেমে এল। এবং কান রাখল পার্টিশনের ওপারে।

না, ও বাড়িটাও নিঝুম। মালা বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছেছে, আর হঠাৎ এই ফিরে আসা নিয়ে কেউ মাথাব্যথা করেনি। মালা এখন কী করবে? মালা…মনে মনে আবৃত্তি করল শোভন, তারপর আরো দীর্ঘ সময় কেটে

গেল, না বাবা ফিরলেন না। বোধহয় পিসিমার বাড়ি হয়ে মাকে সঙ্গী করে ফিরবেন।

শোভনের এখন মনে হল মালা আর একটু থাকতে পারত। আবার মালার অস্তিত্ব তাকে তীব্র করে তুলল। শোভন বাইরের বারান্দায় দাঁড়াল। রোদের কড়া রঙ গলে পড়ছে।

'কে?'

'নাও তোমার চা, মা পাঠিয়ে দিলেন—' মালা বললে। মালা শাড়ি বদলে এসেছে, মুখে-চোখে জল দেবার জন্যে ওকে তাজা দেখাচ্ছে। খোলা চুল যত্ন করে আঁচড়েছে।

'হাঁ করে কী দেখছ? নাও ধরো। চলি।'

'মালা—'

'কেন?'

'জল খাব—'

'আচ্ছা?' মালা জল গড়িয়ে দিল। 'চলি।' ফিরে দাঁড়িয়ে: 'কী জানো, তোমাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করল, তাই…' মালা গুনগুন করতে-করতে ছুটে চলে গেল।

রাস্তায় ছাতা হাতে বাবাকে এবার আসতে দেখা গেল। হাতে ফুলকপি। এই অসময়ে বাবা কপি কোথায় পেলেন। দূর থেকে বাবার মুখ দেখল শোভন, হাঁটার ভঙ্গি। যেন কোন শৈশব থেকে বাবাকে এইভাবে কোর্ট থেকে ফিরতে দেখছে: মাথায় ছাতা, গায়ে কালো কোট আর শাদা প্যান্ট, হাতে থলিতে কখনো কোনদিন বাজারের টুকিটাকি। বাবার এই মূর্তি স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। শোভন ইস্কুল থেকে ফিরত চারটেয়, বাবা সাড়ে চারটে কী পৌনে পাঁচটা, কোনদিন রাস্তাতেই দেখা হয়ে যেত। বাবা রাস্তায় কথা বলতেন না, কিংবা অন্য চিন্তায় থাকার জন্যে তাকে লক্ষ্য করতেন না। 'বা-বা।' ছোটখাট হ্রস্ব মানুষ, চিন্তাক্লিষ্ট এবং সর্বদা ক্লান্ত। শোভনের মনে হয় এই সমস্ত স্মৃতিগুলিই বাবা, সর্বকালের, সর্বযুগের, কোন একটি বিশেষ মানুষ নন, কেবল একটি প্রতীক 'বা-বা'।

কোনদিন এই ধরনের ভাবেনি শোভন, কিন্তু আজ এই বিকেলে অদ্ভুত এক মোলায়েম উদারতাবোধ করছে সে। সত্যিসত্যিই সে যেন বৃহৎ হয়ে গেছে, কল্পনায় সে এক পর্বতচূড়ায় উঠে পড়েছে, সেখান থেকে সমস্ত পৃথিবী মসৃণ দেখাচ্ছে, কোথাও উঁচু-নীচু নেই, কোথাও কোন ক্ষুদ্রতা আর বিরাটত্ব নেই।

মালার সূর্যকরোজ্জ্বল মুখ মনের দিগন্তে ভেসে উঠল। 'কী জানো, তোমাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করল, তাই' শোভন খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল এবং তার মনে হল তার মুঠোয় এক সাম্রাজ্য এসে গেছে, নিজেকে ধনী, গর্বিত বোধ হল। 'কী জানো, তোমাকে…'

বাবা সিঁড়িতে পা রেখে বারান্দায় উঠে এলেন।

'কে? ও শোভন।'

শোভন বললে, 'আজকে আপনার ফিরতে দেরী হয়েছে।'

'এই একটু প্রাণকেষ্টর সঙ্গে গল্প করতে-করতে বাজার ঘুরে এলাম—' বাবা হাসলেন।

'কপির দাম কত নিল?'

'সাত আনা। অসময়ের ফসল, ভাবলাম…; নে। এটা রাখ তো। তোর মা কী ফিরেছে?'

'না।'

'আচ্ছা।' বাবা ঘরে ঢুকলেন ধড়াচূড়া বদলাতে।

শোভন রান্নার ঘরে কপি রেখে এল।

বাবা বললেন, 'আমাকে এক গ্লাস জল দিবি?'

শোভন জিগ্যেস করল: 'চা খাবেন না?'

'তোর মা আসুক।

'আমি করে দিচ্ছি।'

'তুই।' বাবা হাসলেন।

'পারব না?' শোভনও হাসল: 'টেস্ট পরীক্ষার সময় আপনার অসুখ করল। মা মামার বাড়ি। সে সময় আমি দু'দিন রান্না করে খেয়েছিলাম।'

বাবা আবার হাসলেন। 'তাহলে ভাখ।'

শোভন চা করে নিয়ে এল।

বাবা বললেন, 'বোস। তুই তো সামনের সপ্তাহে যাবি? দেখি

গাজোলের মক্কেলরা কিছু টাকা দিয়ে যাবে। তোর সঙ্গে পঁচাশ টাকার মতো দেব। শীতের আগেই একটা চাদর কিনে নিবি। এখন শস্তা হবে।'

শোভন বললে, 'আচ্ছা।'

'দিনকাল এমন পড়েছে।'

বাবা আজ তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছেন দেখে শোভন বিস্মিত ও খুশি হল। তার মনে হল মা বাড়িতে থাকলে সম্ভবত বাবা এত কথা বলতেন না!

বাবা বললেন, 'তুই যদি বেরুতে চাস যা, আমি তো বাড়িতে রইলাম।'

এর পরের দৃশ্য কলকাতাগামী ট্রেন রাতের অন্ধকার ভেদ করে ছুটেছে। বেঞ্চের এক প্রান্তে শোভন। বাবা এসেছিলেন স্টেশনে, উপদেশ দিলেন কলকাতায় যেন সাবধানে চলাফেরা করে।

ট্রেন ছুটেছে। গাড়ি ভরতি ঘুম। শোভন সিগারেট ধরাল। থার্ড ক্লাশ কামরা, যথেষ্ট ভিড়। মেঝেয় পর্যন্ত গাদাগাদি করে মানুষ। শোভন জানলার বাইরে মুখ রাখল। আকাশ প্রান্তর কালিতে লেপা-পোঁছা। বিদায় নেবার সময় মালার মুখের চিত্র মনে পড়ছে। কালো আকাশপটে এক জোড়া নক্ষত্রের আলো। মালা কী কাঁদছিল। শোভনের কান্না পায়নি। তার মনে হচ্ছিল: তার ইচ্ছাগুলোর সাড়া নেই, স্পন্দন নেই, একটা নির্বোধ শূন্যতায় সে মাঠের মতো ধুঁকছিল। তার বুকের সীমানায় মালার স্পন্দমান শরীর হাওয়া-লাগা মাধবীলতার মত দুলছিল, দীর্ঘশ্বাস, আর শিশিরবিন্দু। যত দূরত্ব বেড়ে চলেছে মালার অস্তিত্বের গন্ধ যেন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। তারপর ওই শহর, মা-বাবা আর সমূহ স্মৃতির সঙ্গে মালাও একাকার হয়ে গেল। এই ট্রেনে সে একা, এবং এর পর থেকে নিঃসঙ্গ সংগ্রামই তাকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরবে।

পাশের যাত্রী তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। শোভন ফিরে তাকাল। তারই বয়েসী, অথবা কয়েক বছরের বড় হতে পারে।

'আপনি শেয়ালদায় নামবেন?'

শোভন বললে 'হ্যাঁ।'

'আমিও কলকাতায় যাচ্ছি। এই প্রথম। দিদির বাড়ি।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি কলকাতায় কোন দিকে থাকেন?'

'মানিকতলা ছাড়িয়ে।'

'মানিকতলা!' যুবক পকেট থেকে ঠিকানা বের করল: 'আমার দিদির বাড়ি মুদিয়ালি রোড। চেনেন?'

শোভন বললে, 'বোধহয় দক্ষিণে।'

'হ্যাঁ। দাদা লিখেছে লেকের ধারে।'

'স্টেশনে কেউ আপনাকে নিতে আসবে নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ। সেই রকমই তো কথা।'

'আপনার নাম কিন্তু জানা হল না?' শোভন হাসল।

'আমার নাম কুমুদ ভৌমিক।'

শোভন বললে, 'আচ্ছা? এই সময়ে কলকাতায়?'

কুমুদ বললে, 'জামাইবাবু আমার জন্যে একটা চাকরি ঠিক করেছেন।'

শোভন বললে, 'ও।'

'আপাতত দিদির বাড়িতেই থাকতে হবে। দিদির তো ছেলে নেই। তিনটিই মেয়ে।'

'ভালোই থাকবেন।' শোভন বললে।

কুমুদ বললে, 'আপনি বুঝি অনেকদিন কলকাতায়?'

শোভন বললে, 'না, বছর দুয়েক মাত্র।'

'কী করেন?'

'কলেজে পড়ি।' শোভন ওকে সিগারেট এগিয়ে দিল।

কুমুদ হাসল। 'আমি সিগারেট খাইনে।'

ট্রেন গড়াতে গড়াতে এগিয়ে চলে। গাড়িভরতি ঘুম। বৃদ্ধ কাশছে। একটা বাচ্চা তারস্বরে চিৎকার জুড়ল।

শোভন জানলায় মাথা রাখল। অন্ধকার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বাবার মুখ, মার মুখ। মালার কথা সে এখন মনে করবে না। হৃদয়ের অনেক গভীরে সে লুকিয়ে রয়েছে। 'যদি পারো, চিঠি দিও।' মালা। চিঠি! 'কী জানো, তোমাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করল, তাই...' মালা। চিঠি! নরম একটা অনুভূতি শোভনকে সরস রাখল। 'মা-লা।' ট্রেন ছুটেছে। কুমুদ কী ঘুমিয়ে পড়ল। শোভন আবার জানলার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটা দ্বন্দ্ব থেকে কিছুতেই সে মুক্ত হতে পারে না। তার এই নিঃসঙ্গ নিঃসহায় জীবনের সঙ্গে কোনসূত্রে মালাকে সে মেলাবে?

মালা একটা দায়িত্ব, আবার সে মনে মনে উচ্চারণ করল: অথচ তার কোনো দায়িত্ব বহন করবার শক্তি নেই। মালা কী সেটা বোঝে না, নাকি সেও নিরুপায়। মালা শিবরাত্রি করে এবং…। কয়েক বছর আগে এ খবরে একটা রোমাঞ্চিত হর্ষ ছিল, কিন্তু এখন ভয় করে, আতঙ্ক জাগে। হয়তো মালা যত গুরুত্বপূর্ণভাবে ঘটনাটাকে উপলব্ধি [illegible]

[illegible] পারে না।

মালা কী জানে সংসারটাকে, একটা যুবকের জগৎকে, তার পৃথিবী, সংগ্রাম, জীবনধারণ ও জীবিকার সেই ঘর্মাক্ত ইতিহাস। শোভনকে বি-এ পাশ করতে হবে, কেরানী হতে হবে। এবং এরই মধ্যে শোভনকে বড় হতে হবে, তার শরীর-চেতনার সহস্র জটিলতার মার খেতে-খেতে। কারণ মহানগরী তার নগরবাসের দাম কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে। সুনন্দ। সুনন্দকে সে ভয় করে। সুনন্দ একদা ওর গালে চড় মেরেছিল বলেই নয়। শোভন ভয় করে বলেই বোধহয় ওর বেপরোয়া জীবনযাত্রার প্রতি একটা নিষিদ্ধ কৌতূহলও আছে। অর্থকষ্ট তার জীবনের অনেক স্বাভাবিকতাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে অথচ কলকাতাকে টাকায় কেনা যায়। কলকাতা গরম ফুলুরির মতো নগদ বিদায়ের প্রত্যাশায় বসে আছে। মানুষের ইচ্ছা-বাসনাকে পর্যন্ত সে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। নিরবধি কালে সে বিশ্বাসী নয়। 'আজই এবং এখুনি।'

বস্তুত শোভন যে ঘটনাবলীকে এইভাবে পরিষ্কার ভাবতে পারছিল তা নয়। তবে তার কাজগুলি ভাবনাগুলি তাকে একেক সময়ে যাচাই করতে হয়। এই মুহূর্তে সে নিজেকে প্রশ্ন করল: মালা আর তোমার পরস্পরের চাওয়ার রকমটি কী এক? শোভন উত্তর দিতে যেন দেরি করল। মালার নতুন শরীরের লোভটাই কী তাকে নেশাগ্রস্ত করেনি! মালা বুঝেছিল, তাই তার দৃষ্টিকে সে সমালোচনা করেছিল। কিন্তু বুঝেও কী সে ধরা দেয়নি। কেন? সেও কী নির্লোভ ছিল, মনে হয় না। তবে কী তারা উভয়েই লোভী! ভালোবাসা! ভালোবাসা কী? এই কামনা কী? তার পাঁচ আঙুলে জড়ানো মালার ভিজে ভারি চুলগুলো, ওর চিবুক, গ্রীবা, এবং সেই ভাসন্ত চিলের ডানার মতো ভ্রূযুগল, তার নীচে কালো নরম চোখে মোমের মতো আলো, আর ওর ছোটো ছোটো নিশ্বাসের তরঙ্গ, (শোভন চোখ বন্ধ করল) সহসা শাদা আলোয় ভুবন ভরে গেল, আর এক ঝাঁক পাখি অপরূপ গ্রীবাভঙ্গি করে গান গাইতে

গাইতে আকাশপরিক্রমা করে গেল। আরক্ত ভিজে গোলাপের মতো ঠোঁট দুটো, গলে' গলে' গলে'...

শোভন সিগারেট ধরাল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সারা শরীর দুলছে। অতন্দ্র চোখে সে রাত্রিকে দেখতে লাগল।

শেয়ালদা স্টেশনে গাড়ি থামল। ছাইছাই ভোর। প্ল্যাটফরমে ব্যস্ততা। কুলির হাঁকাহাঁকি।

শোভন সুটকেস হাতে তুলে নিল।

কুমুদ পেছনে বেডিং হাতে।

'আমি শেয়ালদা স্টেশন প্রথম দেখলাম...' কুমুদ ভীরু গলায় বললে।

তারপর গেট পেরিয়ে দুজনে বাইরে এল।

'আপনাকে কেউ নিতে এসেছে?' শোভন জিগ্যেস করল।

'কই, কাউকে দেখছিনে তো।'

'তবে?'

'আমি তো একা যেতে পারব না। হয়তো ওরা আমার চিঠি পায়নি। শোভনবাবু, জানি আপনার কষ্ট হবে...'

শোভন বললে, 'না আর কষ্ট কী? চলুন একটা ট্যাকসি করি।'

একটা পরোপকার করবার সুযোগ পেয়ে বরং খুশিই হল শোভন।

ট্যাকসি ছুটল। বালিগঞ্জ। ট্যাকসিঅলা মুদিয়ালি রোড চেনে। ঠিকানা দেখে ঠিক বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল।

কুমুদ গাড়ি থেকেই চিৎকার করল: 'গাতু, ইতু—'

বারান্দায় দুজন মেয়ের মুখ। 'আরে মামা এসেছে, মামা এসেছে—'

শোভন সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমে এবার এগিয়ে ট্রাম ধরবার কথা চিন্তা করল। গাতু ইতু এবার মামাকে ঘিরে ধরেছে। শোভন পিছন ফিরে না তাকিয়ে এগোতে শুরু করল।

'আরে, পালাচ্ছেন কোথায়? বারে, আসুন চা খেয়ে যাবেন।'

কুমুদ আলাপ করিয়ে দিল: 'গায়ত্রী আর ও ইতি।'

শোভন বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, 'দেখুন, আমাকে এবার যেতে হবে। অনেকটা পথ। সেই মানিকতলা ছাড়িয়ে।'

গায়ত্রী বললে, 'বেশ তো। মাকে বলে যান।'

শোভন কিছু বলবার আগেই ইতি তার সুটকেশ কেড়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

গায়ত্রী হাসল। 'চলুন। সুটকেস না হলে তো যাওয়া হবে না।'

'সত্যি দেখুন।'

দোতলায় উঠে বারান্দার বেতের চেয়ারে ওকে বসতে হল।

গায়ত্রীর মা এসে বললেন, 'সে কি বাবা, এ বেলায় আর তোমার যাওয়া হবে না। ও বেলায় বিশ্রাম করে চা খেয়ে যেও।'

শোভন চিন্তিত হল।

ইতি কোথা থেকে অ্যালবাম নিয়ে ছুটে এল। 'এই দেখুন আমাদের ছবি—'

শোভন অগত্যা অ্যালবাম উলটোতে লাগল।

'এইটে দিদির ছবি—' ইতি পরিচয় করিয়ে দিলে।

'নাচছেন নাকি?'

'না, ওইভাবে ছবি তুলেছে।'

'আচ্ছা।'

ইতি বললে, 'আরো আছে। দিদি ছবি তুলতে খুব ভালবাসে কিনা? সতুদা ছবি তুলে দেয়।'

'সতুদা!'

'কালীঘাটে থাকে। ছুটির দিন আমরা ওর সঙ্গে লেকে বেড়াতে যাই। আমি, দিদি, ছোটো।'

শোভন আবার বললে, 'আচ্ছা।'

মার ডাকে ইতি ভেতরে ছুটে গেল।

আপাতত গায়ত্রীকেই দেখতে লাগল শোভন। তারই বয়েসী হবে, কিংবা দু' এক বছরের বড় হতে পারে। জামা কাপড়ে চুলে অদ্ভুত সাজতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো।

গায়ত্রী এসে বললে, 'আপনি মুখ হাত ধোবেন তো? চা হয়ে গেছে।'

শোভন গায়ত্রীর দিকে তাকাল। যেন ফোটোর সঙ্গে ওকে মিলিয়ে দেখছে। গায়ত্রী কী হাসল।

'আসুন।'

শোভন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

গায়ত্রীই চা নিয়ে এল।

শোভন বললে, 'কুমুদবাবু কোথায় ?'

'মামা মার সঙ্গে গল্প করছে। আপনি খান।'

গায়ত্রী চলে গেল না। বারান্দার রেলিঙ ধরে দাঁড়াল।

'আমি সাউথে এর আগে আসিনি।'

গায়ত্রী বললে, 'এবার আসবেন। আসবেন না ?'

'কেন ?'

'বারে, আমাদের সঙ্গে আলাপ হল। আপনি বুঝি কলেজে পড়েন ?'

'হ্যাঁ।'

'আসবেন তো ?'

'জানেন তো অতদূর থেকে আসা। চেষ্টা করব।'

'রবিবারে আসবেন। লেকে বেড়াতে যাব।'

'দেখি।' শোভনকে চিন্তিত অন্যমনস্ক দেখাল।

সমূহ ঘটনাকে শোভনের বানানো মনে হচ্ছে। যেমনটি উপন্যাসে পড়া যায়। কুমুদবাবুর সঙ্গে সহসা আলাপ, তারপর এখানে। এবং গায়ত্রী। রাতজাগা ধকলের পর এখানকার এই পরিবেশ ভালো লাগছে শোভনের। গায়ত্রীই বো'ধহয় ভালোলাগার শ্রেষ্ঠ কারণ। মেয়েটির স্বভাবে কোন জড়তা নেই, উন্মুক্ত মাঠের মতো, যথেচ্ছ হাওয়া বিচরণ করে। আর, ট্রেনে চাপা গুমটের পর এই উন্মুক্ত হাওয়াটার জন্যে হঠাৎ তীব্রতা বোধ করল সে। তার মনে হল এই তীব্রতার স্বাদ ভিন্ন। শোভন এখন বুঝতে পারল সে কলকাতায় পা দিয়েছে এবং এই মহানগরী তার মনের ওপর একটা হালকা ঝিরঝিরে বাতাস শুরু করেছে। 'আজই এবং এখুনি' এমন একটি মনোভাব ইতিমধ্যেই তার ইন্দ্রিয়কে খরতর করে তুলেছে।

শোভন যদি পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারত তাহলে বুঝত তার স্বভাবেই একটা অগভীর, খেলো অংশ রয়েছে। যার জন্যে তাকে বলতে পারা যায় : 'তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন।'

বিকেলে পাতায় কাঁপা রোদ থাকতে থাকতেই শোভন ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। রেলিঙে ওর সম্পূর্ণ শরীরের আদল। বুক থেকে কী একটা ঠেলে উঠতে চাইল শোভনের।

মসীমাখা কলকাতা সন্ধ্যা হতে-না-হতেই তার মুখমণ্ডল আবৃত করে

ফেলেছে। রাস্তায় লোক চলাচল ক্ষীণ। ট্রাম-বাস ঊর্ধ্বশ্বাসে গন্তব্য ধরবার তাড়ায়। ঝড়ের বেগে লরী রাস্তা পার হচ্ছে।

নিঃশব্দে বাড়িতে এল শোভন। সুটকেস হাতে ঘরে।

'কে? শোভন?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির সকলে ভালো তো?'

'হ্যাঁ।'

এ-বাড়িতে আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই। শোভন জামা কাপড় বদলাল। তারপর বিছানা পেতে নিয়ে লম্বা হয়ে পড়ল। আগে সুধন্য এল। পরে সুনন্দ।

'ভালো ছিলি তো?'

'হুঁ—'

একটা সপ্তাহ কেটে গেল।

শনিবার বেলা থাকতে ফিরে শোভন দেখল জামা কাপড় সমস্ত ময়লা। অথচ কালকে রবিবার। গায়ত্রীদের ওখানে যেতে হবে। এক প্রস্থ জামা কাপড় বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু রাখবে কী করে। চারখানার মধ্যে একটা জামা ছিঁড়ে গেছে। শখ করে যে টেনিস শার্টটা বানিয়েছে, সেটাও ময়লা।

জামা কাপড় বগলে নিয়ে শোভন কলকাতায় নামল। দোকান থেকে সাবান কিনে নিয়ে এল। রাঁধুনিকে বলে রাখল ভাতের ফ্যান রাখতে। সর্বাঙ্গে সাবানের ফেনা আর জলে জলজপ্রাণী হয়ে শোভন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। এবার ছাদে গিয়ে জামা কাপড় টানটান করে মেলে দিল। সন্ধ্যার বাতাসে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। সকালে ইস্ত্রি করতে দিয়ে এলেই চলবে।

কালীর দোকানে এক গ্লাস চা নিয়ে বসল।

কী-একটা কাজ যেন ভুল হচ্ছে। মালাকে চিঠি লিখতে হবে। মার চিঠির সঙ্গে অবশ্য দু' লাইন ওকে লিখেছে। রোজই রাত্রে ফিরে ভেবেছে লিখবে। কেমন কুঁড়েমি পায়। তাছাড়া—সত্যি কী লেখা যায়? কেমন আছো—ভালো আছি, ইত্যাদি। মালার হাতের লেখা এখন তার মনে পড়ছে। চিঠির জবাব ও নিশ্চয়ই দেবে। এখন বাড়িতে ফিরে চিঠি

লিখতে কোন বাধা নেই। কারণ সুনন্দ-সুধন্য নেই। ওরা থাকলে খেপাবে মনে মনে চিঠি মুসাবিদা করতে লাগল।

বাড়ি ফিরে সত্যিই চিঠি লেখার আয়োজন করল শোভন।

"নিরাপদে পৌঁছেছি, যার চিঠিতে জেনেছ। ট্রেনে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে, কুমুদবাবু···" শোভন কলম কামড়াতে লাগল: গায়ত্রীর কথাটা ওকে লেখা যায় কিনা। না, থাক। বরং কলকাতায় কিছু মজার কথা বানিয়ে লেখা যাক। তারপর—মালার লেখাপড়া সম্বন্ধে দু'চার লাইন লেখা যায়। চিঠি বেশিদূর এগোল না। আবার পরে লিখবে ভেবে রেখে দিল।

শোভন ছাদে উঠে এল। ধুতি প্রায় শুকিয়ে এসেছে। জামাটা এখনো ভিজে। পিছন ফিরলে এখান থেকে হাওড়ার ব্রিজ দেখা যায়।

রবিবার এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সারতে দেরি হয়।

তিনটে নাগাদ জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে গেল শোভন।

সুনন্দ বললে, 'বেরুচ্ছিস'নাকি ?

শোভন বললে, 'একটু কাজ আছে।'

'কাজ !'

'বালিগঞ্জে যাব।'

সুনন্দ চোখ টিপে বললে, 'কী ব্যাপার ?'

'পরে বলব।'

'ফেঁসেছ বাবা। ভালোয় ভালোয় ফিরে এস বাপধন।'

ইতি তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল: 'এসেছেন এসেছেন।'

শোভন লজ্জিত হাসল। 'মা কোথায় ?'

'মায়ের খোঁজে এসেছেন নাকি মশায় ?'

'কুমুদবাবু—'

'মামা বাজারে গেছে।'

শোভন বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসল।

'দিদি বাথরুমে, এখুনি বেরুবে—'

কোমরে আলগাভাবে শাড়ি জড়ানো। গায়ত্রীর চুল থেকে জল ঝরছে। ভুর ভুর করছে সাবানের গন্ধ।

'যাক এলেন তাহলে ?' গায়ত্রীর চোখে বিদ্যুত। গায়ত্রী ক্ষিপ্র সাপের

মতো এঘর-ওঘর করছে। পাশের ঘর থেকে ওর গুনগুন ভেসে এল।

শোভন আরক্ত লজ্জায় চুপ করে বসে রইল।

তারপর পোশাকে উচ্চকিত হয়ে গায়ত্রী বেরিয়ে এল।

'চলুন। যাই।'

পাশাপাশি গায়ত্রী। সামনে ইতি।

'আবার কবে আসছেন?'

'অ্যাঁ?'

'আর আসবেন না বুঝি?'

'আসব।'

ওরা লেকে নেমে এল। ইতি ছুটছে।

গায়ত্রী বললে, 'ইতিটা ভীষণ ছেলেমানুষ।'

শোভন হাসল।

'এখানে বসবেন?'

'আচ্ছা।'

রোদ পড়ে এসেছে। প্রচণ্ড হাওয়া দিয়েছে।

গায়ত্রীর শাড়ির আঁচল বার বার খসে পড়ছে। গায়ত্রীর শাদা কাঁধ, বাহুর ভাঁজ দেখল শোভন। শোভনের মাথা ঝাঁঝাঁ করছে, আর চোখে নিদাঘের জ্বালা। গলা শুকিয়ে আসছে কী।

'কথা বলছেন না যে?'

'দেখছি।'

গায়ত্রী হাসল। হাসলে ওর চোখ ছোটো হয়ে আসে, আর গালে ভাঁজ পড়ে। ওর ঠোঁট রঙে পালিশ করা।

'আপনি বুঝি মেয়েদের সঙ্গে আগে মেশেননি?'

'না।' শোভন মিথ্যা বলতে পেরে বাঁচল।

'আচ্ছা?' গায়ত্রী ছোট্ট হাসল।

ইতি মাঠময় ছুটোছুটি করছে।

গায়ত্রী ওর ব্যাগ খুলল। 'এইটে আপনার জন্যে।'

শোভন মুঠোতে তুলে নিল রুমালটা। নাকে গন্ধ শুঁকলো।

'পছন্দ হয়েছে? আমি নিজে ফুল তুলেছি।'

শোভন হাসল। গায়ত্রীর ভিজে নরম মুঠো নিজের হাতে তুলে নিল।

'ওরা দেখছে।'

শোভন ঘাবড়ে গিয়ে হাত ছেড়ে দিল।

গায়ত্রী মুখে রুমাল চেপে হিল-হিল করে হাসছে। ওর উর্ধ্বাঙ্গ কাঁপছে।

শোভন নিরুপায় ভঙ্গিতে ওর বেপথু শরীরের দিকে চেয়ে রইল। গলা থেকে কী একটা ঠেলে উঠতে চাইছে।

গাছের পাতা কাঁপছে। পলাতক রোদ গাছের পাতায়।

'আপনি সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন ?'

'কী সিনেমা ?'

গায়ত্রী বললে। 'সামনের রবিবারে যাবেন ?'

'দেখি।'

'টিকিট আগে কাটতে হবে।'

'আচ্ছা।' শোভনকে চিন্তিত দেখাল।

স্কার্টের নীচে ইতির পা দু'টো ভীষণ দাপাদাপি করছে।

গায়ত্রীর ডান হাত শোভনের কোলে। শোভন ওর কাঁধে হাত রাখল। কারণ গাছতলায় স্থানটা এখন নির্জন। ইতি অনেক দূর ছুটে গেছে।

শোভনের শরীর জ্বলছে। অসহায় একটা হিংসা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। গায়ত্রীর শরীরটা তার গায়ে মুঠো মুঠো আগুন ছুঁড়ে মারছে। শোভনের চোখের দিকে তখন কেউ তাকালে মনে করতে পারত সে ভীষণ পরিশ্রম করে একটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

গায়ত্রী কী তার অবস্থাটা বুঝতে পারছে। সে কি হাসছে। একটা ঘাসের শিষ দাঁত দিয়ে কাটছে সে।

একদল ছেলে তাদের দিকে তাকিয়ে অশ্লীল শিস দিতে দিতে চলে গেল।

শোভনের মুখ লাল হল।

গায়ত্রী খিল খিল-খিল করে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

ইতি বললে, 'শোভনদা, আইসক্রীম খাব।'

তিনটে আইসক্রীম কিনল ওরা।

'গায়ত্রী বললে, 'চলুন। এবার একটু হাঁটি।'

গায়ত্রীর শাড়ি খস-খস করে শব্দ তুলে হাওয়ায় উড়ছে। এখন আঁচল সামলাতে সে প্রাণান্ত। গায়ত্রী এগিয়ে চলেছে। আবার ওর শাদা কাঁধ,

বাহুকোণ, এবং ভারি কটিদেশ পিপাসার মতো একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল শোভনের মনে। হঠাৎ মালার স্মৃতি মনে পড়ল। মালার সান্নিধ্য এমন করে পিপাসার্ত করে না। গায়ত্রীর সাজ-পোশাকের আড়ালে ওর পূর্ণাঙ্গ শরীরটা স্পষ্ট একটা আমন্ত্রণের মতো তাকে টানছে। শোভনের সমস্ত অস্তিত্ব এখন শারীরিকতার চূড়ায় আরোহণ করছে।

শোভন হঠাৎ বললে, 'আমাকে এবার ফিরতে হবে।'

গায়ত্রী দাঁড়িয়ে পড়ল। 'যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

গায়ত্রী কী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'চলুন। তাহলে ফেরা যাক।'

বাড়িতে ফিরে শোভন প্রতিজ্ঞা করল আর সে যাবে না ওদের বাড়ি। কোনো মানে হয় না। একটা দিনে দু টাকা বেরিয়ে গেছে। সারা মাস চলবে কী করে। আবার রবিবারে যাওয়া মানে সিনেমা টিকিটের খরচ, তারপর ইত্যির আইসক্রীম আছে।

শোভন নিজের মনে হাসল। 'প্রেমে ভীষণ খরচ।'

বস্তুত আগামী রবিবার পাঁচ টাকার মতো খরচ করার মতো অবস্থা তার থাকবে না। যে বাড়িতে টিউশানি করছিল তারা পুরী চলে গেছেন। 'ভিক্ষা করো, চুরি করো, ধার করো'—কোন পন্থাই তার পক্ষে সুলভ নয়। যতই বাস্তব পরিস্থিতি ভেবে সে হেরে যাচ্ছে ততই গায়ত্রীর ওপর রাগ হচ্ছে। তার বোঝা উচিত ছিল শোভন ছাত্র, বাড়তি পয়সা খরচ করবার অবস্থা তার থাকে না। একেই তো মানিকতলা থেকে বালিগঞ্জ যাতায়াতের খরচ আছে। এই মাসে তাকে টানাটুনি করে চালাতে হবে। বাবা চাদর কেনার টাকা দিয়েছেন, তাও কেনা হবে না। ওই চাদরটা কেনা হলে তার একটা বিশিষ্ট অর্থ থাকবে, যেহেতু এর পিছনে সন্তানের জন্যে বাবার মমতাময় সতর্কতা জড়ানো আছে।

তার চেয়ে এই শেষ। গুড বাই, গায়ত্রী।

তারপর হোঁচট খেতে খেতে আর একটা সপ্তাহ এগিয়ে এল। ঘুম থেকে উঠেই মনে হল আজ রবিবার। আর মনে হতেই একটা অবাধ্য অস্থিরতা তাকে ঠেলা মারতে থাকল। গায়ত্রীর কাছে কেবল আজকের জন্যেই যেতে অবশ্য পারে। মনে রাখতে হবে: আজই শেষ। শোভন যদি স্পষ্ট ভাবতে পারত তাহলে এমন উপমা দিত: একটা বাজে

খেলো উপন্যাস, ভালো লাগছে না, তবু শেষটায় কী হয় এর জন্যে ছাড়তে পারছে না। গায়ত্রীর সুগন্ধিত রুমাল তার পকেটে আছে, ব্যবহার করেনি। তাছাড়া তার ভিজে করতল, কাঁধের শাদা অংশ এবং বাহুকোণ। সামনে শিকারকে দেখে যেমন শ্বাপদ ফুলে ওঠে তেমনি একটা হিংসা তার চেতনাকে ক্ষুরধার করে তুলল। শোভন আজ আর হারবে না, তার রক্তে একটা জেদ পেয়ে বসে।

দুপুরের পড়ন্ত রোদে গায়ত্রীদের বাড়িটা বুড়ো বেড়ালের মতো ঝিমোচ্ছে। সকলে কি ঘুমোচ্ছে, কোথা থেকে কারুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে না।

অন্ধকার সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে কেমন দমে গেল শোভন। অবশ্য এখুনি অলক্ষ্যে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু নিঃশব্দচরণে শোভন দোতলায় উঠে এল। সারা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। তবে কী এরা কোথাও বেরিয়েছেন, এইভাবে বাড়ি খোলা রেখে।

শোভন কান খাড়া করে দিল। কোথা থেকে চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে না? দক্ষিণের বন্ধদরজা ঘরটা থেকে কী। শোভন এগিয়ে গেল। গায়ত্রীর গলা না! দরজায় টোকা দেবে কিনা ভাবল শোভন। জানলার নীচে সরে এল। ঘরের অন্ধকার ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। তারপর চোখের পরদা থেকে অন্ধকারটা সরাতে যাবার আগেই সশব্দে দরজা খুলে গেল, আর আলুথালু বসন, স্খলিত চুল ঘামে গলা গায়ত্রী দরজা থেকে শোভনকে ঠেলে নিয়ে হলঘরে শোফায় যেন টাল সামলাতে না পেরে ওর দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শোভন কিছু বলতে পারল না, একটা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে গায়ত্রীকে দেখল—ঘামে গলা কুৎসিত, কপাল চোখের পাতায় আঠার মতো ঘাম, ওর বাহু, গ্রীবা এবং বাসী ফুলের মতো গন্ধ, শোভনকে একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। শোভনের মনে হল সে মরে গেছে, আর একটা কচ্ছপ তার শরীরের মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

বারান্দার দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল কী। যেন কেউ জুতো পায়ে আস্তে হেঁটে গেল।

গায়ত্রী ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, শোভনের দিকে তর্জনী দেখিয়ে মৌন থাকবার শাসানি দিয়ে ছুটে গেল, 'আসছি—'

শোভন শোফার ওপর মৃতের মতো পড়ে রইল।

খানিক পরে হাসিমুখে ঘরে এল গায়ত্রী। হাতে ধূমায়িত চায়ের পাত্র।

শোভন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। তারপর চায়ে চুমুক দিল।

'মা বোনদের নিয়ে একটু আগে বেরিয়েছে—' কৈফিয়তের গলায় বললে গায়ত্রী।

শোভন কিছু বললে না।

'লেকের দিকে যাবেন?'

'না। আমি যাব এখন।'

'কেন?'

'এম্নি।'

'আচ্ছা।'

শোভন উঠে দাঁড়াল। কেমন খালিখালি লাগছে। একটা নির্বোধ শূন্যতা তাকে ঘিরে নৃত্য করছে। শোভন সিঁড়ির মুখে ফিরে দাঁড়াল।

'একটা কথা বলব।' শোভন একটু নামল, ভেবে নিল কথাগুলো: 'আমি আপনার যোগ্য নই সেটা জানতাম, তবু ইচ্ছেগুলো…।' শোভন আবার দম নিল: 'যে মানুষ কোনো দোষ করেনি তাকে কষ্ট দেবেন না।'

গায়ত্রী কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। শোভন পিঠের ওপর ওর নির্বাক অস্তিত্বকে বুঝতে পারছিল, কুঁজো হয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

রাস্তায় নেমে শোভন ভাবল: এখন কোথায় যায়। মার খাওয়া মূক জন্তুর মত নিজেকে লাগছে এখন। রাস্তার লোক কী তার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারবে!

শোভনের হঠাৎ বাবার একটা উক্তি মনে পড়ে গেল: 'দিনকাল এমন পড়েছে, আর এই সময়… !'

এই নিষ্করুণ কলকাতা, এই অন্ধকার, আর মানুষ, এই বিশ্বাসহীনতা…

দিনকতক বাড়িতে গুম হয়ে রইল।

তারপর এক গভীর রাত্রে সুদীর্ঘ রচনা লিখে বসল সে। লিখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। সুনন্দ সুধন্য পর্যন্ত প্রশংসা করল।

'মাইরি, এত্ত ভাব তোর কী করে আসে।' সুনন্দ পিঠ চাপড়ে দিল। 'লেখ, তোর হবে।'

শোভন কলেজ যায়, আর বাড়ি আসে। আর লেখা চর্চা করে। তারপর একদিন দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। একটি লেখা দিয়ে এল

এক পত্রিকার আপিসে। তারপর, যেমন হয়, ব্যাপারটা ভুলে গেল একেবারে।

এই সেদিন সন্ধ্যেবেলা বুক পোস্টে একটা পত্রিকা ফেলে গেল পিওন। এ বাড়িতে এটা একটা অনিয়ম। শোভন দুরু-দুরু বুকে পত্রিকাটা খোলে। সূচীপত্রে চোখ আটকে গেল ওর।

ছাপার অক্ষরে নিজের নাম যে এত প্রিয় হতে পারে, কে জানত। হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরের ঘরে ছুটে এল শোভন।

'এই গ্যাখো' সুনন্দর সামনে মেলে ধরল পত্রিকা।

'তোর লেখা বেরিয়েছে?'

'হুঁ—'

সুনন্দ বললে, 'নে সিগ্রেট খা। কেমন বলেছিলাম না, লেখ তোর হবে। বাবা, আমরা মেটাল দেখলে বুঝতে পারি।'

সুনন্দ জোরে জোরে লেখা পড়তে লাগল।

শোভন লজ্জা পেয়ে বললে, 'এই, আস্তে পড়ো।'

'ওরে বাবা, এ কী লিখেছিস, মেয়েরা হৃদয়হীন অবিশ্বাসী—' সুনন্দ হসে বললে, 'বাবা, কোন মেয়ের হাতের কাঁকনের ঘা খেয়েছ? এতো আত্মজীবনী বাপধন।"

'এই, কী হচ্ছে।'

'মেয়ে নিয়ে অত কাব্যি করিসনি বাবা, হৃদয়টিদয় স্রেফ বাজে। কেবল বানানো।' হো-হো করে হেসে উঠল সুনন্দ।

সুধন্য প্রতিবাদ করল: 'দাদা, তুমি ওকে ওইভাবে তোমার দলে টানতে পারো না। ভালো মেয়ে নিশ্চয়ই আছে, নইলে সংসার চলত না।'

সুনন্দ বললে, 'তোর ওই আদর্শবাদের বুলি রাখ। মেয়েদের তুই কতটুকু জানিস?'

'তাই বলে তোমার জানাটাই ঠিক নয়। তুমি ভালো মেয়ে গ্যাখোনি।'

'যা যা চুপ কর। বাজে বকিসনে।'

শোভন নতুন এক প্রেমে পড়ল। আত্মপ্রেম। অদ্ভুত এক আনন্দ-উত্তেজনা-বেদনা-বিরহের জগতে সে বাস শুরু করল। এ জগতের একচ্ছত্র সম্রাট সে। বৃহত্তর পৃথিবীর সম্পর্কে একটা উদাসীনতা, উপেক্ষা গড়ে তুলল। মাঝে মাঝে জানলা টপকে বাইরের জগতের কিছু পরিচিত প্রতীক তার নিজস্ব পৃথিবীতে ছায়া ফেলে বইকি। কিন্তু সেগুলোর

কোনো জীবন্ত রক্তমাংসের আবেদন নেই তার কাছে। যেন তার রচনার সামগ্রী হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করা চলে।

পর পর কয়েক মাসে আরো কয়েকটি নতুন পত্রিকায় শোভনের লেখা বেরুল।

শোভন ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করল। সুনন্দ পাশ করতে পারেনি। সুধন্য পাশ করেছে।

মা লিখেছিলেন ছুটিতে বাড়িতে আসতে। শোভন অবকাশ পাইনি। একটি নতুন পত্রিকা তার উপন্যাস ধারাবাহিক ছাপবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেই উপন্যাসটা শেষ করতে হল।

পত্রিকা আপিসেই তরুণ কবি অজয় বসুর সঙ্গে আলাপ।

অনুরোধ করলে: 'চলুন না। আমাদের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে।'

উপন্যাস শেষ করে আপাতত রিক্ত লাগছিল শোভনের। বললে, 'চলুন।'

লালবাগে অজয়দের বাড়ি। ওর বাবা ইস্কুল টিচার। অজয় ওর বোন যমুনা এবং ছোটো ভাই সুজয়। ছোট্ট সংসার। ওরা ওকে দুদিনেই অন্তরঙ্গ করে নিল।

বিকেলে ভাগীরথীর তীরে ঘুরে বেড়ানো। একদিন খোশবাগ, কাটরা মসজিদ, হাজারদুয়ারী, নিমোখারাম দেউড়ি। তারপর দূরের পাল্লায় বহরমপুর।

এ বাড়িতে যমুনাই বোধহয় তাকে এড়িয়ে চলে। ভয়ংকর চাপা স্বভাবের মেয়ে। স্বল্পভাষী। আর যমুনার এই নির্জন স্বভাবটাই শোভনকে কেমন কৌতূহলী করে তুলল। একটু লম্বা বলে কুঁজো মনে হয়। শ্যামলা গায়ের রঙ, চোখ দুটো আয়ত, কিন্তু নিরাসক্ত।

বহুদিনের ঘুমন্ত রক্ত জেগে উঠল।

বিকেলের রাঙা রোদে সবে ঘুম থেকে উঠেছে চা নিয়ে এল যমুনা।

শোভন বললে, 'বসুন।'

যমুনা বললে, 'কাজ আছে যে।'

'অতিথিকে সঙ্গদান করাও গৃহস্থের কর্তব্য নয় কি?' শোভন বললে।

'আপনার সঙ্গে কথায় পারব না। আপনি লেখক মানুষ।'

'সত্যি, আপনি আমার লেখা পড়েছেন?'

'বাড়িতে পত্রিকা আসে। পড়ি বইকি। এমন বানিয়ে বানিয়ে লেখেন আপনারা!'

'ভালো লাগে?'

'আমরা মুখ্য মানুষ অত বুঝিনে।'

শোভন একটু আহত হল কী।

যমুনা হঠাৎ সাহস করে বললে, 'আচ্ছা, মেয়েদের মনের কথা আপনারা কী করে বোঝেন বলুন তো?'

শোভন গর্ববোধ করল। 'কেন?'

'আমরা মেয়েরা, কখনো ওভাবে ভাবতে পারিনে।'

'বোধহয় আপনারা নিজেকে চেনেন না, তাই......'

'হবে।' যমুনা হাসল: 'সত্যি যদি আপনাদের গল্পের মেয়ে হতে পারতাম।'

'গল্পের মেয়ে!'

'নয়তো কী! সত্যি সত্যি কোনো মেয়ে কী ওরকম ভাবে, ওরকম কাজ করে...'

শোভন বোকার মতো চুপ করে গেল।

যমুনা চলে গেল।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বুদ্ধিমানের মতো ভাবল শোভন: আসলে মেয়েটার গল্প-উপন্যাস পড়ার মেজাজ গড়ে ওঠেনি, রসবোধ দানা বেঁধে ওঠেনি। কিন্তু এত বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও শোভনের সাহিত্যিক অহংকার আহত হয়। এই একফোঁটা মেয়ের কাছে কোথায় যেন হার হচ্ছে তার।

আর একদিন যমুনার সঙ্গে সাহিত্য-প্রসঙ্গে আলোচনা করবার আগ্রহ রয়ে গেল তার।

সেদিন ভাগীরথীর তীরে আবার কথাটা উঠল।

যমুনা হাসল। 'আপনি আমাকে শুধু-শুধু জেরা করছেন। আমি কিছুই জানিনে।'

শোভন বললে, 'না জানা থেকেই শুরু হোক।'

যমুনা বললে, 'অপরাধ নেবেন না। আমি যেটুকু ভাবতে পারি, তাতে মনে হয় অভিজ্ঞতার বাইরে না যাওয়াই ভালো।'

'কী রকম?'

'নিজের কথা লেখাই নিরাপদ। তাহলে ঠকতে হয় না, বিষয়টা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।'

'তার মানে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই?'

'নেই বলিনি।' যমুনা হাসল: 'আছে। লেখেন না।'

শোভন রাগ করে কিছু জবাব দিল না।

'দেখলেন তো আমি কিছুই জানিনে, আমার মূর্খতা কেবল আপনাকে রাগিয়ে দিচ্ছে।'

'দিক। তবু আমি শেষ পর্যন্ত যেতে চাই—'

'কোথায় যাবেন? গন্তব্য জানা আছে?' যমুনা ফের হাসল। 'আচ্ছা শোভনবাবু, গল্প মানেই কী মেয়ে, আর কোনো বিষয় নেই? কে বলেছে মেয়েদের নিয়েই লিখতে হবে? শরৎবাবু সকলে হন না।'

শোভন আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মেয়ে ছাড়া গল্প—'

যমুনার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। 'কেন, মেয়েরা মানুষ নয়? আমাকে দেখছেন না? সংসারের আরো দশটা প্রাণীর মতোই আমাদের ভাবতে হয় কী বাজার আসবে, কী ছাইপাঁশ দিয়ে বাড়ির লোকদের পেট ভরাব, দাদার কলেজের টাকা পাঠানো, ভায়ের বই কেনা, সমস্ত কিছুই ভাবতে হয়। আপনাদের লেখা পড়ে মনে হয় মেয়েরা যেন হাত ধুয়ে বসে রয়েছে প্রেমে পড়বার জন্যে!'

শোভন রেগে উঠে বললে, 'তার মানে তুমি বলতে চাও প্রেমট্রেম বলে কিছু নেই?'

যমুনা জলের দিকে চোখ রেখে বললে, 'জানিনে। তবে চামচ দিয়ে একেক টুকরো কেটে নিয়ে বলব এইটেই সত্য, এইটেই সম্পূর্ণ. তার মতো মিথ্যে কিছু নেই। যদি আমি আপনাকে নিয়ে লিখি 'আপনি শুধু লেখেন' তাহলে কী সেটা সত্য হবে? আপনি খান ঘুমোন কলেজে যান মা-বাবার কথা ভাবেন এইগুলিই আপনাকে সম্পূর্ণ করে, গোটা মানুষ করে, নয় কি? দোহাই আপনার রাগ করবেন না লক্ষ্মীটি।'

শোভন আবার ভাবল: এই মেয়েটি যেন তার সাহিত্যিক অহংকারকে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে বলে কোমর বেঁধেছে। অথচ ব্যাপারটাকে ওর কোনরকম হীনমন্যতা বলে যদি ভাবতে পারত, তাহলে সান্ত্বনা পেত শোভন। অন্তত, এ মেয়েটির বক্তব্য এবং বিশ্বাসে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এমন মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়া যায় না, অথচ গ্রহণ করাও কষ্টকর। অপিচ এর স্তাবকতা-মুক্ত সাহচর্য প্রয়োজনীয়।

চলে আসার আগের দিন নিভৃতে পেয়ে শোভন বললে, 'চলে যাচ্ছি। এরপর ভুলে যাবে তো?'

যমুনা বললে, 'মনে রাখার দায় তো কারুরই নেই। যদি ভুলে যাই আপনার খুব ক্ষতি হবে কী?'

শোভন বললে, 'হবে।'

যমুনা হাসল। 'চিন্তায় ফেললেন। আমার মতো সামান্য মেয়েকে মনে রেখে আপনার কী লাভ?'

শোভন স্তব্ধগলায় বললে, 'কেউ মনে রেখেছে একথা ভাবতে পারলে মাঝে মধ্যে ফিরে আসবার ইচ্ছেটা খাঁটি মনে হয়।'

যমুনা চোখ নামাল। 'এখানে আসতে আপনার কোনো অজুহাতের দরকার হবে না।'

শোভন ওর হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিল। বললে, 'সাহিত্য করি বলে নয়, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে নির্ভরতা চায়, বিশ্বাস, প্রীতি, বন্ধুত্ব—'

'আপনি অমন করে বলবেন না, আমি তো আমার শক্তিকে চিনি। বেশ তো আপনার ভালো লাগলে যখন খুশি চলে আসবেন।'

'যমুনা—'

'এসো। আমি—আমরা অপেক্ষা করব।'

তখন বটগাছে বাদুড়গুলো চক্রাকারে ঘুরছিল। আর, সূর্য ডুবছিল ওপারের গাছের শিরে।

যমুনার দৃষ্টি সামনের দিকে। মাথাটা দু পায়ের জোড়ের ওপর। একটু কুঁজো হয়ে বসে।

'আশ্চর্য, এমনও হয়…' ফিশফিশ করে বললে যমুনা।

শোভন ওর দিকে চেয়ে রইল।

'সত্যি বলছি, দাদার সঙ্গে তোমাকে দেখে খুব রাগ হয়েছিল। প্রাণপণে এড়িয়ে চলেছিলাম, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমি কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। এই বয়েসে মিথ্যা ছাড়া কিছু দেখিনি, হয়তো এই ভালো হয়েছে, দ্বিতীয়বার আর-একটা মিথ্যায় পড়ে ক্লান্ত হইনি।'

শোভন মৌন।

যমুনা বাহু প্রসারিত করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। 'দেখেছ একটু আরাম পেলেই ঘুমোতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের স্বভাব।'

শোভন হাসল। 'ছেলেটি কে?'

যমুনাও হাসল। 'কেন? তুমি কী তার সঙ্গে লড়াই করতে যাবে? সে এখন কলকাতায়, ডাক্তারী পড়ছে। না, ভাখো পরিমলের ওপর আমার কোনো রাগ নেই। ও আমার অনেক ক্ষতি করতে পারত, করেনি।'

শোভন বললে, 'তাহলে আমার কাহিনী শোনো—'

যমুনা হাসল। 'বুঝেছি দুজনেই ঘর-পোড়া গোরু। তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনো মেয়েই তার প্রিয়জনের পূর্বপ্রণয়ের কাহিনী ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে না।'

'কেন? নিজে ঘরপোড়া হলেও?'

'হ্যাঁ। মেয়েরা চায় সমস্ত অগৌরব, সমস্ত দুঃখ যেন তারা একাই বহন করে, আর তাদের পুরুষটি যেন এই সমস্ত গ্লানির ঊর্ধ্বে থাকে।'

'তাহলে তো আমার নীরব থাকাই ভালো।'

'তাই থাকো।'

শোভন বললে, 'চিঠি দেবে তো?'

যমুনা বললে, 'না।'

'কেন?'

'যখনি খারাপ লাগবে চলে এসো।'

'এঁরা কী ভাববেন?'

যমুনা হাসল। 'কিছুই ভাববেন না। আমার মা-বাবা মানুষকে বিশ্বাস করতে পেরে বেঁচে গেছেন।'

'আচ্ছা একটা কথা বলবে, সত্যি কী মনে করো আমার কিছু হবে?' শোভন জিগ্যেস করল।

যমুনা বললে, 'কিসের?'

'বলছি আমার দ্বারা লেখাটেখা হবে কী?'

যমুনা হাসল। 'না-হলে হবে না। চেষ্টা করতে দোষ কী?'

'এই, সত্যি বলো না—'

'আমার বলার ওপরেই কী নির্ভর করছে—'

'এই—'

'ভীষণ ছেলেমানুষ তুমি। নিজের প্রশংসা অত শুনতে নেই শোভনবাবু। চলো, এবার ফেরা যাক।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে যমুনা বললে, 'শোনো, দাদাকে আমাদের কথা কিছু বোলো না।'

আবার কলকাতা।

দীর্ঘ দু বছর পর।

অজয় কবিতা লিখেছে। পৃথিবীকে কল্পনা করেছে জননীর সঙ্গে, সন্তানের দীর্ঘ রোগভোগের পর আরোগ্য খবরে প্রথম রাত্রিতে ক্লান্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ছেন মা। মুখে গোধূলি সূর্যের সৌন্দর্য।

বাবার চিঠিতে বাবা অভিযোগ করেছেন: শোভন নাকি পড়াশোনায় বিলক্ষণ অমনোযোগী হয়েছে এবং আড্ডা হই-হই করে মূল্যবান ছাত্রজীবনকে ক্ষয় করছে।

যমুনার চিঠি আসেনি। অথচ সপ্তাহে একটি করে চিঠি লিখতে সে ভোলেনি। আজ দুটো হপ্তা তার খবর নেই। অজয়কে জিগ্যেস করেও কোনো সদুত্তর পায়নি। একেক সময়ে মনে হয় যমুনার সঙ্গে অজয়ের কোথায় একটা বিরোধ আছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যে উৎরে আলবাগ পৌঁছল শোভন।

কাল রাত্রে বোধহয় এদিকে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় জল-কাদা। আর, কয়েকটি খড়ো ঘরের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করল শোভন।

অজয়ের বাবা বললেন, 'কে শোভন? এসো বাবা। যমুনা-মা বলছিল তোমার আসার কথা। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

শোভন প্রণাম করল। 'আপনি বেরুচ্ছেন নাকি?'

'আর বলো কেন? টিউশানি। তুমি বিশ্রাম করো।'

যমুনা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ওর দিকে এগিয়ে এল।

'সত্যি এলে তাহলে?' যমুনা হাসল।

শোভন গম্ভীর হয়ে বললে, 'আসব না জানলে কী এমন হাসি বেরুত?'

যমুনা বললে, 'রাগ করছ না তো? হঠাৎ তোমাকে ছুটিয়ে নিয়ে এলাম।'

'তোমার কী মনে হয়?'

যমুনা হাসল না। বললে, 'তুমি রোগা হয়ে গেছ।'

'তাই বুঝি?'

'বোসো। তোমার খাবারের ব্যবস্থা করি।'

শোভন ওকে আটকাল। 'আগে বলো কেন ডেকেছ?'

যমুনা বললে, 'এখন নয়। রাত্তিরে।'

শোভন বললে, 'আচ্ছা তুমি গল্প লেখো না কেন? এমন সাসপেন্সে রাখতে পারো মানুষকে।'

'এসো মুখ-হাত ধুয়ে নেবে।'

'মা কোথায়?'

'পুজোর ঘরে।' যমুনা বললে, 'এই, তুমি যে আসছ দাদা জানে? জানে না তো? ভালোই হয়েছে।'

নারকেল গাছের মাথায় হলুদ চাঁদ উঠল।

ছাদে মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে যমুনা। শোভন চাঁদের দিকে চোখ রেখে বসেছিল।

সিঁড়িতে যমুনার পায়ের আওয়াজ। গা ধুয়ে আসতে ওর দেরি হয়েছে। যমুনা কাশছিল।

শোভন বললে, 'আবার কাশিটাশিও হচ্ছে দেখছি।'

যমুনা আবার কাশল। 'কাল ঠাণ্ডা লেগেছে।'

শোভন বললে, 'তাহলে এই বৈকালীন বিলাসটুকু না করলেই তো চলত।'

'ওরে বাবা, এই গরমে—'

শোভন চাঁদের বুকে চোখ রাখল। যমুনা ছাদের আলিশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওকে একটু অস্থির মনে হচ্ছে কী। শোভন ওর গতির দিকে চোখ নামাল। ওধারের ছাদে কে গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। গানের কলিগুলো বোঝা না-গেলেও ভাঙা-ভাঙা স্বর হাওয়ায় জুঁইফুলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

যমুনা পায়ে-পায়ে শোভনের দিকে এগিয়ে এল। তারপর বসল মাদুরের প্রান্তে। হাঁটুর ভাঁজে মুখ রেখে নরম করে তাকাল শোভনের দিকে।

'কি ভাবছ?' যমুনা হঠাৎ নীরবতা ভাঙল।

'কিছু না।'

'আমি তোমাকে দেখছি। এমন করে…'

শোভন চুপ করে রইল।

যমুনা একটু থেমে বললে 'পরিমল গত সপ্তাহে এসেছিল…'

শোভন একটু চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'ও নাকি ভীষণ অনুতপ্ত, আমার মার্জনা পেলে ও তার অন্যায় সংশোধন করতে পারে…' যমুনা হাঁটু থেকে মাথা তুলল: 'তুমি শুনছ তো?'

শোভন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'ও যে এমন করবে, বুঝতে পারিনি, আমার হাত ধরে যখন সে কাঁদছিল, আমি দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম…'

শোভন মূক।

যমুনা কাশছিল। তারপর কাশি থামিয়ে বললে, 'তারপর এক সময় সে চলে গেল। আমি ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারিনি।'

শোভন চুপ।

'তারপর সেদিন ওর চিঠি পেলাম। কলকাতা থেকে লিখেছে। তুমি দেখবে চিঠিটা?'

শোভন বললে, 'না।'

যমুনা বললে, 'তবে থাক। আচ্ছা, ও আমাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলল কেন? বলো তো এখন আমি কী করি?'

চাঁদের ওপরে পাতলা মেঘের আস্তরণ। জ্যোৎস্নার ছায়া ঘনায়।

'অথচ—ভেবেছিলাম যদি ও কোনোদিন আবার আসে ভীষণ অপমান করে তাড়িয়ে দেবো। কিন্তু পারলাম না তো। ও এমন বিশ্রীভাবে কাঁদছিল…। বুঝতে পারছিলাম এখন ওর কান্নার কোনো মানে হয় না, অন্তত আমার কাছে তার কোনো দাম নেই। ও আমাকে আবার অপমান করে গেল, আর আমি কিছুই বলতে পারলাম না।' যমুনা কাঁদছিল।

শোভন প্রস্তরের মতো জমাট হয়ে রইল।

'কারুর কাছে একথা আমি বলতে পারিনি, এই কয়েকদিন নিজে জ্বলেছি। না-পেরে তোমাকে আসতে লিখলাম। আমি তোমার কাছে মিথ্যা হতে চাইনি, তুমি আমাকে বুঝবে…'

শোভন একটু থেমে বললে, 'তোমার কী ওর জন্যে কোনো দুর্বলতা এখনো আছে?'

যমুনা ভাঙা গলায় বললে, 'নেই কী করে বলি? অনেক ছোটো বয়েস থেকে ওকে দেখেছি, ও আমাদের বাড়িতে এসেছে, একসঙ্গে খেলেছি, ঝগড়া করেছি, মারামারি করেছি। আমরা বড় হয়েছি…'

শোভন বললে, 'ও যদি সত্যি অনুতপ্ত হয়ে থাকে—'

'সে কী করে হয়। ও নিজেকেই বিশ্বাস করে না, ওর নিজেরই জোর নেই। আমি তো জানি ও আবার নিজেকে সরিয়ে নেবে, আবার অনুতাপ করবে। আমিও তো মানুষ, ওর অনুতাপগুলোকে আমি ভালোবাসতে পারিনে।'

শোভন আবার মৌন হয়ে রইল।

'জানো ও এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে যে কালকের চিঠিতে সে দাদার সুপারিশ সঙ্গে করে পাঠিয়েছে।'

'দাদা!'

'হ্যাঁ দাদা।' যমুনা মুখে আঁচল দিয়ে কাশির ধমক থামাল: 'ওর পক্ষে যেটা সহজ ছিল সেটা সে কোনদিনই করতে পারেনি। তার মানে ওর নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। এরপর ও যদি লালবাগের সমস্ত মানুষকে এ-ব্যাপারে লাগায় আশ্চর্য হব না।'

শোভন আবার চুপ করে রইল।

'এই—' যমুনা ডাকল: 'তুমি অমন চুপ করে থাকলে আমার একটুও ভালো লাগবে না।'

শোভন হাসল। 'কী বলব?'

'কেন? কিছু বলতে পারো না, করতে? পারো না আমার ভার নিতে?'

শোভন কাঁপুনি বোধ করল।

'চলো না আমাকে নিয়ে কোথাও, দূরে, অনেক দূরে—'

শোভন মৃদু গলায় বলল, 'যাব।'

'যাবে? সত্যি বলছ?'

'যাব।' রুদ্ধনিশ্বাসে জানাল শোভন।

যমুনা হেসে উঠল, কাশির ধমক, দম নিয়ে বললে, 'দেখলে তো কী বোঝা তোমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি, আমরা এমন স্বার্থপর…'

শোভন ঘন গলায় বললে, 'আমি কারুর ভার বহন করতে পারি এটাও কী আমার কাছে কম গৌরবের!'

'কিন্তু, আমি কী দেবো তোমাকে, আমার ইচ্ছে আবেগগুলো…' যমুনা যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল: 'কেন আগে তুমি আমার কাছে এলে না?'

শোভন বললে, 'পরে আসার জন্যে আমার কোনো লোকসান হয়নি যমুনা।'

'হয়েছে হয়েছে। তুমি জানো না।'

শোভনের কোলে উপুড় হয়ে-পড়া যমুনার দেহ ফুলে ফুলে উঠছে।

শোভন চাঁদের দিকে তাকাল। নারকেল গাছের পাতাগুলো দুলছে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ।

শোভনের মনে হল এই অনন্ত আকাশের তলায় সে যেন বড় হয়ে গেছে। আর, তার মাথা স্বর্গকে ছুঁয়েছে। শোভন ওর পিঠে হাত রাখল, আঙুল দিয়ে সে যেন সময়ের চুলে বিলি কাটছে।

শোভন কলকাতায় ফিরে এল। ওর স্বভাবের চারদিকে যেন সহস্রজট নিঃশব্দতা নেমে এসেছে। গম্ভীর এবং চিন্তাক্লিষ্ট।

টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করল শোভন।

সুনন্দ বললে, 'বাবা তোকে একবার দেখা করতে বলেছেন।'

শোভন বললে, 'আমাকে!'

'হ্যাঁ।'

শোভন তেতলার ঘরে বহুদিন পর পা দিল।

'এসো শোভন। ছ্যাখো কথাটা অনেকদিন ধরে বলব বলব ভাবছি। তোমার বাবাকেও কাল এই মর্মে চিঠি দিলাম। দেখছ তো দিনকাল, এই দুর্বৎসর—নায়েব লিখেছে এবার খাজনা আর আদায় হচ্ছে না। তাই এই দুর্দিনে বাধ্য হয়ে সংসারের খরচ কমাতে হচ্ছে। তোমার বাবাকেও তাই লিখে দিয়েছি। আর, এখন তো তোমাদের ওখানে কলেজ হয়েছে—'

শোভন বললে, 'আমাকে কবে যেতে হবে?'

'তোমার হাতে তো এখন টাকা নেই বোধহয়। মনে না করলে আমার কাছ থেকে ট্রেনভাড়া নিয়ে যেতে পারো।'

শোভন বললে, 'আচ্ছা।'

শোভন নতুন করে এই পৃথিবীর সম্মুখীন হল। দীর্ঘ ব্যাধির পর প্রথমদিন পথ্য খেয়ে রুগী যেমন বাইরের আলোতে হাঁটতে গিয়ে দুর্বলতা বোধ করে, শোভনেরও তেমন মনে হল।

দুপুরের টা-টা রোদে ফুটপাথ ধরে সে অনেকদিন পর হাঁটতে শুরু করল। অগণিত ব্যস্ত লোকের মুখ। এত মানুষ কোথায় যায়! এদের সকলেরই কী আশ্রয় আছে!

শোভন যেন আজ নিজেকে একলা পেয়েছে। নাকি সে চিরকালই একলা। তার এই জীবনটা তার নিজেরই, নিজের হাতে তৈরি। এই জীবনে কারুর ছায়া নেই। না বাবা, না মা। এখন তবে সে কিসের ভরসায় ওঁদের কাছে ফিরে যাবে। ওরা কেউ তো তার জীবনকে চেনে না, বুঝবে না। তবু, ক্লান্ত বিহঙ্গের মতো তাকে বাড়িতেই ফিরতে হবে। বাবা-মার আশাহত ভাঙাচোরা মুখের চেহারা তার চোখের সামনে নড়ে ওঠে। বাবা কিছু বলবেন না, মা হয়তো কাঁদবেন। তাঁরা সন্তানের ওপর অনেক আশা করেছিলেন। আশা! শোভন হাসল: বি-এ পাশ কেরানী জীবনের শখ আহ্লাদ। ওরা কেউ তার ডাক্তার কী হাকিম হবার স্বপ্ন ছাখেননি। শোভনের ওদের জন্য আন্তরিক দুঃখ হল।

আশ্চর্য, শোভন ভেবে চলল: এই মহানগরে সে একদিন ছিল। এবং দু-একদিন পরে আর থাকবে না। এই শহরের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। কারণ সে এ শহরে ছিল বটে, কিন্তু এ শহরের ছিল না। সত্যি, ভাবতে গেলে, এতবড় শহরটাকে এর আগে এমন করে কোনোদিন ছাখেনি। কলেজ করেছে, বাড়ি এসেছে, পাড়ায় ঘুরেছে। অথবা সম্পাদকের দপ্তরে। এই মহানগর তার কাছে কলেজ-বাড়ি-সম্পাদকীয় দপ্তর মাত্র! শোভন তাই এতদিন এ শহরে ছিল, বলতে পারে না। সে শহরের ভেতরে গণ্ডীঘেরা আর একটি জগৎ গড়ে তুলেছিল। সে জগৎ তারই বানানো। এবং যেদিন সে থাকবে না, সেদিন এই বানানো জগৎটিও অদৃশ্য হবে।

অথচ সে অনেক কিছু করতে পারত। বৃহত্তের সমীপে মানুষ নাকি বৃহৎ হয়! কিন্তু এই বড় শহর তার ভাবনা-কল্পনায় কেন বড় আকারের ঐশ্বর্য ধরে দিল না।

শোভন এবার নিজেকেই শাসন করল: তুমি লেখাপড়া করতে এসেছিলে! করোনি! তুমি সুযোগের অসদ্ব্যবহার করেছ।

শোভন স্বীকার করল: করেছে। এর জন্যে সে কাউকে দায়ী করে না।

কে ডাকল তার নাম ধরে? শোভন ফিরে দাঁড়াল।

'অজয়বাবু—'

'কতক্ষণ থেকে আপনাকে ডাকছি। এই রোদে কোথায় চলেছেন?'

শোভন বললে, 'না। কোথাও নয়।'

অজয় আশ্চর্য চোখে চেয়ে রইল।

'একটু হাঁটছি। কী জানেন অজয়বাবু, এর আগে শহরকে কখনো এইভাবে দেখিনি।'

অজয় জিগ্যেস করল: 'আপনি কী অসুস্থ? আপনাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে।'

শোভন বললে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

অজয় বললে, 'বাড়ি যাচ্ছেন?'

শোভন বললে, 'তাই।'

'কবে ফিরছেন?'

'অ্যাঁ। না ফিরছি নে।'

'সেকি! কেন?

শোভন বললে, 'পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম কিনা। সকলের দ্বারা সব কাজ হয় না।'

অজয় অবাক হয়ে বললে, 'আপনার আজ কী হয়েছে বলুন তো?'

শোভন হাসল। 'ভারি মজার এই জীবনটা না অজয়বাবু? এখন মনে হচ্ছে মানুষের দুটো জীবন দরকার। একটা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে, আরেকটা জীবন অভিজ্ঞতা মাফিক কাজ করার জন্যে।'

অজয় বললে, 'আপনি বড় বেশি ভাবেন শোভনবাবু—'

শোভন বললে, 'না ভাই, ভাবনার ভান করি। নইলে মা-বাবার একটি মাত্র লক্ষ্য আমার বি-এ পাশ করা তাই পারলাম না।'

'আপনি টেস্টের রেজাল্টের জন্যে মন খারাপ করছেন। পড়াশোনা করেননি, নইলে আপনার মতো বুদ্ধিমান—'

শোভন আর কথা বাড়াল না। 'আচ্ছা চলি।'

অনেক বেলা করে শোভন যখন বাড়িতে ফিরল পা টলছে, সারা গায়ে আগুনের প্রদাহ, চোখ লাল এবং চোখের সামনে কেমন একটা অন্ধকার দলা পাকিয়ে নৃত্য করছে।

শোভন কোনোরকমে সিঁড়ি ধরে ধরে ভারি পাদুটো টেনে দোতলায় উঠল। ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ল বিছানার ওপর।

'শোভন—শোভন—কী হয়েছে তোমার?'

সুধন্য।

'আমি মরছি…' শোভন বিড়বিড় করে বললে।

'ইয়ারকি কোরো না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' সুধন্যর গলায় উদ্বেগ, আগ্রহ।

'সুধন্য, আমি তলিয়ে যাচ্ছি, আমাকে ধরো…'

'আঃ, কী হচ্ছে—চিৎকার কোরো না।'

'এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না…ফটিক বাবা আমার…'

'শোভন, তোমার অসুখ করেছে। শোভন, শুনছ?'

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিলি হায়, তাই ভাবি মনে—'

'শোভন, তোমাকে ঘুমোতে হবে। তোমার বিশ্রাম চাই।'

'নারকেল গাছের মাথায় কী প্রকাণ্ড হলুদ চাঁদ, আমরা সকলেই হলুদ হয়ে যাচ্ছি। যমুনা বড় কষ্ট। Lady shall I lie on your lap?'

সুধন্য জোর করে মাথার ওপরে ফ্যানটা ছেড়ে দিল।

শোভনের শরীর দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। ওর চোখদুটো বড় লাল। আর, মাতালের মতো সে প্রলাপ বকছে।

ট্রেন রাত্রির বুক চিরে ছুটে চলেছে।

শহর, শহরতলি, কারখানার চিমনি, অট্টালিকা, পীচের রাস্তা, বিদ্যুৎস্রোত, যাবতীয় লেপেপুঁছে গিয়ে এখন ঘন গাছগাছালি, ক্ষেত, পুকুর, ডোবা, আর অর্ধনগ্ন মানুষের জটলা।

শোভনের চোখের পরদায় তার গোটা জীবনটা আর একবার ডুবে উঠল। জানলার বাইরে কালো নক্ষত্রজ্বলা ভারি আকাশ, মায়ের কোলের মতো। মা, অস্ফুটে বললে শোভন: মা একটি বোধ, অনুভূতি। যমুনা এবং মা…। আজো কী আকাশে সেই হলুদরঙা চাঁদ উঠবে, নারকেলের পাতা কাঁপবে। শোভন নিজেকে রিক্ত মনে করল। এবং বুদ্ধিমানের মতো ভাবল: এই ভালো হল। এই আড়াই শ' মাইল দূরত্ব থেকে যমুনা আর তার স্মৃতিকে রক্তাক্ত করতে পারবে না। এবং এই দূরত্বের ঢেউ ভেঙে পরস্পর কেউ কাছে আসতে পারবে না। যমুনা একদিন জানবে তার পলায়ন-কাহিনী। তারপর হেসে নিজের মনেই বলবে: 'ছেলেরা এমনি হয়।' তারপর একদিন শোভন নামক অস্তিত্বের চেতনাকে ভুলে যাবে, যাবে। এরপর আবার কী সে পরিমলকে নিমন্ত্রণ করবে!

শোভন মরে গেছে, বোধ অনুভূতি অসাড়। এবং দূরত্ব থেকে জীবনকে

দেখতে পারছে। পশ্চাতের জীবনভূমিটা আর একজনের। যদিও তারও নাম শোভন, কিন্তু সে নয়।

শোভন সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়িতে পা দিল। আর বেরুল না বাড়ি থেকে। নিজেকে আটকে রাখল ঘরের মধ্যে। বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মা রাগ করলে চান করে খেয়ে আসে। আবার ঘরে এসে ঢোকে। সকাল গলে' দুপুর হয়, বিকেলের চিতায় সন্ধ্যা জ্বলে। রাত্রি নামে গুমট।

তারপর নিজের বাহ্যিক অস্তিত্বও সে ভুলে গেল। জামাকাপড় ময়লা, গায়ের গেঞ্জি এবং পাতলুন তেলচিটে। মুখভরতি দাড়ি, যোগীর মতো দীর্ঘ পিঙ্গল চুলের বোঝা।

সেদিন দুপুরে নিঃশব্দে মালা এসে ওর শয্যার কাছে দাঁড়ল।

'শোভনদা—'

শোভন চোখ তুলে তাকাল। শাদা শূন্য চোখ।

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'মালা। কেমন আছ?'

'কই, আমাকে বসতে বললে না তো?'

'বোসো।'

মালা বসল।

'রাগ করেছ আমার ওপর? আমি কালকেই মামার বাড়ি থেকে ফিরছি।'

শোভন কিছু বললে না।

মালা বললে, 'আমার সঙ্গে কথা বলবে না বুঝি?'

শোভন বললে, 'তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ।'

মালা বললে, 'আমাকে কী তুমি ছোটো করে রাখতে চাও?'

শোভন হাসল শুধু।

'তুমি একেবারে বদলে গেছ। মাসিমা বলছিলেন: তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলো না। কেন, কী হয়েছে তোমার?'

শোভন চুপ করে রইল।

'আমরা তো তোমার কাছে কোনো দোষ করিনি। যারা ভালবাসে তাদের কষ্ট দিতে হয় বুঝি?'

শোভন মালার দিকে চাইল, শাদাটে দৃষ্টি। সে ভীষণ ঘামছে। অসহ্য গ্রীষ্ম এ ঘরে।

মালা ওর চোখের দিকে চাইছে, ওর কুঁজো হয়ে বসা শরীরের দিকে।

শোভন স্থির, কপালে কুঞ্চন। জানলার বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। হঠাৎ মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল শোভনের, ঠোঁটদুটো কাঁপল। তারপর বললে, 'আমার কাছে আর এসো না, মালা।'

মালার চোখদুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। 'জানি, তুমি আমাকে অপমান করবে। কিন্তু তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারো না। যতদিন মাসিমা মেসোমশায় আছেন ততদিন তোমার কোনো আদেশ আমি মানব না।'

শোভন চুপ।

'তুমি অমানুষ হয়ে গেছ, ছোটো হয়ে গেছ, শোভনদা—'

শোভন মূক।

'আজ তোমার কাছে সবকিছু খেলা হতে পারে, হয়তো আমরা, এই মফস্বলের সাধারণ মেয়েরা, তোমার কাছে খুব শস্তা। একদিন আদর করা যায়, একদিন ফেলে দেয়া যায়।'

'মালা, আমার এসব ভালো লাগছে না।'

'আমি নিরুপায়। হয়তো আর কোনোদিন এসব কথা বলা হবে না তোমার কাছে। আমি বিশ্বাস করে তোমাকে সবকিছু দিতে পেরেছিলাম বলেই কী আমি দোষ করেছি। তোমার কী ধারণা আমি সকলের কাছেই এইভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি ?'

'মালা—'

'আমি জানিনে কী হয়েছে তোমার, জানতেও চাইনে। কিন্তু যাবার আগে বলে যেতে চাই এমন করে কোনো মানুষকে কষ্ট দিতে নেই। তাতে তুমিও সুখী হবে না।'

'মালা, একজন বেকার, অশক্ত লোকের কাছে তুমি কি চাও ?'

'আমি জানিনে তুমি বেকার কিনা, অশক্ত কিনা। কিন্তু বেকার বলেই তোমাকে ছেড়ে দেবো এমন খেলো মেয়ে আমাকে ভাবলে কী করে, শোভনদা। ধরো যদি আমার শক্ত অসুখ হত, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারতে ?'

শোভন আবার চুপ।

মালা বললে, 'শোভনদা, তোমার মতো আমি বড় শহর দেখিনি।

এখানেই মানুষ হয়েছি, বড় হয়েছি, বিশ্বাস করেছি, ভালোবেসেছি। আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, তবে আমার ক্ষতি করবে কেন?'

'ক্ষতি!'

'নয়? শোভনদা, তুমি মেয়েদের চেনো না। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আমাদের নেই।'

শোভন আশ্চর্য চোখে তাকাল মালার দিকে। এ মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে। কিন্তু মালা কী জানে জীবনটাও অনেক বড় এবং জটিল। এই জীবনযুদ্ধ, শোভন ভাবল: বিশ্বাস-প্রীতি-ভালোবাসা।

'শোভনদা, আমি যাচ্ছি—' মালা উঠে দাঁড়াল।

'একটু বোসো।' শোভন ক্লান্ত গলায় বললে।

মালা বসল। 'তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে, শোভনদা—'

শোভন বললে, 'হ্যাঁ। খুব কষ্ট, মালা। আমি পারছিনে—'

'কোথায় কষ্ট তোমার?' মালা ওর বুকে হাত রাখল। 'কী করে তোমার শরীরকে নষ্ট করেছ বলো তো?'

'মালা—'

'কী?'

'তুমি আমাকে আজো বিশ্বাস করো?'

'তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই, শোভনদা। তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে?'

'মালা, আমি খারাপ হয়ে গেছি, নষ্ট হয়ে গেছি—'

'কেন নষ্ট হলে, কেন খারাপ হলে? আমার কথা কেন তোমার মনে থাকল না?'

'মালা—'

'আমাকে ভয় দেখিও না, শোভনদা। তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে একটু বাঁচতে দাও। তোমাকে বলিনি, মাসিমা জানেন। আমার বাড়ির লোক কেউ আমাকে পছন্দ করে না। আমার অপরাধ আমি ওদের মনোমত ছেলেকে বিয়ে করতে চাইনি।'

'মালা—'

'মাসিমা জানেন। আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারিনে।'

শোভন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আবার মস্তিষ্কে সেই গুরুভার যন্ত্রণাটা।

চোখের সামনে অন্ধকার দুলছে। মালা তাকে কেন বিশ্বাস করল? সে তাকে কী দিতে পেরেছে। ওর বিশ্বাস এত জোর পেল কী করে! কান্নার মতো স্বাদ শোভনকে দুমড়ে মুচড়ে দিল: অথচ, মালার বিষয়টা এমন করে কোনোদিন তার ভাবনায় দানা বাঁধেনি। কেন? ও সরল বলে, বিনা পরিশ্রমে ওকে পেয়েছে বলে! হায়রে কৈশোর, আর তার মুগ্ধবোধ দিনগুলি!

'মালা, কাল দুপুরে একবার আসবে?'

'আসব। আমি যাচ্ছি শোভনদা।' মালা চলে গেল।

জানালার বাইরে নিস্পন্দ মধ্যাহ্ন। ইলিশের আঁশের মতো রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে।

সহসা একটা নিরবয়ব, মূক ভয় শোভনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। বুকে চাপ ধরছে, নিশ্বাস রোধ হয়ে আসছে। এই বেঁচে থাকার বোধগুলি তাকে অস্থির করে দিচ্ছে। এখন তার কত বয়েস হল একুশ না বাইশ। এই একুশ বছরের জীবনটা তাকে নাজেহাল করে দিয়েছে। একুশ বছরের পর আর মানুষের জীবন বাড়ে না। এই-ই শোভনের সম্পূর্ণ জীবন, যা তাকে বহন করতে হবে। এর হাত থেকে তার অব্যাহতি নেই। মানুষ যদি আরেকটা জীবন পেত, একটা ভুল করার আরেকটা ভুলগুলিকে কাজে লাগানোর। হায়, মানুষের একটাই জীবন!

কিন্তু, মালাকে সে কেন কাল আসতে বললে। কী বলবে তাকে। জানিনে। শোভন সময় নিতে চায়। কিসের সময়? ভাববার। শোভন নতুন করে ভাবতে চায়, যেন সে এতদিন ভাবেনি। মালা, অনেক বড় হয়ে গেছে, এত বড় যে এখন শোভনের ভয় করে। এই মেয়েটি কৈশোর থেকে সবকিছু কৃপণের মতো সঞ্চয় করেছে, তার পুতুলের সংসার, পুরনো বলে কোনোকিছু নষ্ট করেনি, ফেলে দেয়নি। অথচ, ও যে এত সঞ্চয় করবে কে জানত। শোভনও জানে না। পুতুলের সংসার তার কাছে সত্য, জীবন্ত। সত্য তার শিবরাত্রির কামনাগুলি।

মালা মাকে সব বলেছে, তার কামনাগুলি, তার শপথগুলি। এবং মা—

শোভন ভাবল: এবং মা তাকে স্বীকার করেছেন! তার অর্থ মা-ও এমন একটি ইচ্ছা নিভৃতে লালন করতেন! অথচ সে ভাবছিল এতদিন সে একা, স্বাধীন। এখন বুঝতে পারছে সে এতগুলো মানুষের ইচ্ছার

শিকলে বাঁধা। শোভনের সমস্ত ব্যাপারটাই একটা জটিল ধাঁধার মতো মনে হয়।

তাহলে শোভনের কোনো স্বাধীন নির্বাচন নেই! ব্যক্তিগতভাবে সে কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। পারে না! তবে সেই খোলা ছাদে হলুদ চাঁদের স্বপ্ন, নারকেলপাতার ঝিরিঝিরি। এবং…

লালবাগ থেকে এই শহরের দূরত্ব অনেক। এই দূরত্বের ঢেউ ভেঙে যমুনা কোনোদিনই আসতে পারবে না। যমুনা হাসবে, কারণ জীবনে বিশ্বাসভঙ্গ সে দেখেছে, দ্বিতীয়বার দেখবে।

কিন্তু, মালা…মালাকে কী সে ভালোবাসে। মালা…ভালোবাসা…। না, মালাকে সে ভালোবাসেনি। শোভন ভাবল: বোধহয় আজ, আজ থেকেই সে মালাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু, এই নতুন অনুভূতিই তাকে দীর্ণ করে দিচ্ছে। কারণ মালা আর তার সম্পর্কের মধ্যে একটা শূন্য গহ্বর রচিত হয়ে গেছে। এ শূন্যতা কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। হবে না। আর, নিশিদিন অন্ধের মতো এই শূন্যতাকেই হাতড়াতে হবে।

শোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরদিন সকালে শোভনের আচরণ দেখে বাড়ির লোক অবাক হল। অনেক সকালে শয্যাত্যাগ করেছে তারপর অনেকক্ষণ ধরে আয়নায় দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকর্ম করেছে। তারপর সে নিজের মনেই সাবান মেখে চান করল।

মা চা এনে দিলেন।

'মা—' শোভন হাসল।

'তুই কী কোথাও বেরুবি নাকি?'

'হ্যাঁ। একবার কলেজে যাব। দেখি যদি এখানে সীট পাওয়া যায়।'

মা হাসলেন না কাঁদলেন। 'এতদিনে সুমতি হল তোর?'

শোভন বললে, 'মা তুমি খুশি হয়েছ?'

মা বললেন, 'তুই সুখী হলেই আমরা খুশি। যাই তোর বাবাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

শোভন বাড়ি থেকে বেরুল। বহুদিন পর সকালের প্রসন্ন আলোয় হৃদয় ভরে উঠল। এটা কী ঋতু, শোভন মনে করতে পারল না। ঋতুগুলি সব একরকম। আকাশের রোদ এখনো তরুণ। শোভন অনেক পথ হেঁটে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

অনেক বেলা করে ফিরল শোভন। মা বসে আছেন। বাবা কোর্টে বেরিয়ে পড়েছেন।

মা বললেন, 'কাজ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। কালকেই ভরতি হয়ে যাব।'

'আয় খাবি আয়—'

খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে ফিরে এল শোভন।

তার মনে পড়ল একটা প্রয়োজনীয় কাজ বাকি রয়ে গেছে। শোভন টেবিলে কাগজ নিয়ে বসল। এখুনি জরুরি চিঠিটা লিখতে হবে। কলম খুলে তৈরি হল সে। কিন্তু পত্ররচনার মতো সামান্য কাজটাও যে এত কঠিন, এর আগে উপলব্ধি হয়নি। যেন তারই কোনো প্রিয়জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম দিচ্ছে। যমুনা, যমুনা, যমুনা,—অন্যমনস্কে কয়েকবার হিজিবিজি কাটল কাগজের বুকে। আর, কে জানত ওই অক্ষরগুলো ভেদ করে যমুনার মুখ জলছবির মতো জলজ্বল করে উঠবে। যমুনার পিঠের ওপর ভিজে ভারি চুলের রাশ, সদ্যোস্নাত প্রতিমার মতো নরম ওর মুখ, এবং শরীরের ঘন গন্ধ…

শোভন স্থির হয়ে বসে রয়েছে। যমুনার ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি। ওর কপালের টিপ দপ দপ করছে।

এবং অকস্মাৎ হাওয়া-লাগা পালের মতো ওর সমস্ত শরীরটা ফুলে ফেঁপে ওঠে এই বদ্ধ ঘরটাকে আচ্ছাদিত করে দিল। শোভন পুনরায় স্থির, পাথর। শোভন বিস্ফারিত চোখে ওর ওই বিশাল অস্তিত্বের দিকে তাকিয়ে রইল।

সহসা শোভনের মনে হল প্রচণ্ড একটা ধুলির ঝড়, অন্ধকার দামাল, আর সে হাহা প্রান্তরের খোলা আকাশের নীচে ঠা ঠা করে কাঁপছে। বুকের ভেতরে কী একটা ঠেলে উঠছে, ঠোঁট জ্বলছে…একটা মৃত্যুর মতো অনুভূতি বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে তাকে।

'পৃথিবী গোল আবার আমাদের দেখা হবে…'

শোভন চিৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ করতে পারল না। তার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর কোনোদিন তার গলায় আওয়াজ ফুটে বেরুবে না। শোভন ভয় পেল, মাকে কী ডাকবে সে। সত্যিই কী সে মরে যাচ্ছে। শোভন হুড়মুড় করে টেবিলের ওপর ভেঙে পড়ল।

'শোভনদা—'

কে? যমুনা?

'মালা!'

দরজার চৌকাঠে মালার শরীর, মালা দরজা আটকে আছে। ওর পরনে ঘোর লাল রঙের শাড়ি। লাল রঙটা যেন চোখের সামনে নাচছে, লাল, বেগুনী, খয়েরী, তারপর কালো হয়।

'মালা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে—'

'এই তো আমি—'

'মালা, এত লাল কেন, বাইরে কোথাও কী রক্তপাত হচ্ছে?'

'কী বলছ পাগলের মতো।'

'মালা, পৃথিবীর বয়েস কত হল?'

মালা হাসল। 'বাইশ—'

'মালা একটা গল্প শুনবে? একটা মেয়ের গল্প? নদীর নামে নাম—'

'কী নাম নদীর?'

'যমুনা, কাচের মতো রঙ, গ্রীষ্মে পায়ে হেঁটে তার বুকের ওপর দিয়ে মানুষ হেঁটে যায়, শীতে…'

'মহানন্দা?'

'না যমুনা।'

'তারপর?'

'এক বর্ষায় যমুনা উঠে এল এক যুবকের কাছে। বলল: আমাকে গ্রহণ করো। যুবক অঞ্জলি ভরে তাকে পান করল।'

মালা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'যাঃ তোমার যত বানানো। নদী কী কখনো উঠে আসতে পারে?'

'তারপর একদিন যুবক চলে গেল, আর যমুনা বালির পাহাড়ের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল। যুবকটি বলেছিল: ফিরে আসব। ফিরে এল না।'

মালা বললে, 'বাবা, বাঁচা গেছে। ফিরে এলে তো আবার কাহিনী শুরু হত।'

শোভন বললে, 'মালা, সেই যুবক আমি।'

মালা হাসল। 'আর, সেই যমুনা?'

'যমুনা আর একটি মেয়ে।'

মালা বললে, 'কোথায় থাকে ?'

'মুর্শিদাবাদ, লালবাগ।'

'তাকে বুঝি তুমি কথা দিয়েছিলে ?'

হ্যাঁ।'

'কেন ? যে কথা রাখতে পারবে না ?' মালা একটু চুপ করে থেকে বললে : 'এই কথা বলবার জন্তেই তুমি আমাকে ডেকেছিলে ?'

শোভন বললে, 'তাই।'

মালা কয়েক পা এগিয়ে এলো, তারপর জানলায় পিঠ রেখে সোজা শোভনের দিকে ফিরে দাঁড়াল। 'এ কথা আমার শুনে কী লাভ ? আমি তো শুনতে চাইনি।'

শোভন বললে, 'আমি তোমার কাছে কোনো কিছু লুকোব না।'

মালা বললে, 'এসব শুনে আমি কী করব ?'

'আমাকে খাঁটি হতে হবে মালা।'

'খাঁটি !' মালা অপলকে ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। 'আরেকটু কম খাঁটি হলে তোমার কী খুব ক্ষতি হত, শোভনদা ! তোমার ভালোবাসার কাহিনী শুনে আমার কী উপকার হবে ? আমি তো গল্প লিখতে পারিনে, এই শহরে এরই মধ্যে আমাকে থাকতে হবে।' একটু থেমে : 'আচ্ছা শোভনদা, মানুষের তো একটা হৃদয়, সেই একটা হৃদয় নিয়ে সে কতবার ভালোবাসতে পারে ?'

'মালা, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো—'

'শোভনদা, আমি অনেক ছোটো, জীবনের কিছুই জানিনে, সেইজন্তেই বুঝি আমাকে মাড়িয়ে যাওয়া চলে—'

'মালা—'

'শোভনদা, আমি আঘাত সইতে পারি, কিন্তু তোমার অবহেলা নয়।'

'মালা, শোনো—'

'আমাকে বলতে দাও, শোভনদা। আমি ভয় দেখাতে জানিনে তাই আমাকে কেউ ভয় পায় না। তুমি জানো : মালা তোমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে তাই নির্ভয়ে তুমি তোমার প্রেমের কাহিনী আমাকে শোনাতে পারো।'

'মালা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বুঝতে পারিনি তুমি

আঘাত পাবে।' শোভনের মস্তিষ্কে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে: 'মালা, আমি আমার কাজের কোনো সাফাই দিতে চাইনে তোমার কাছে। আমার ন্যায়অন্যায় পাপপুণ্য বোধগুলি আমার একার। তার জন্যে ভুগতে হবে আমাকেই। হয়তো এখন, এই মুহূর্তে আমরা কেউ পরস্পরের কাছে সহজ হতে পারব না। কিন্তু আমার দিক থেকে এইটুকু বলতে পারি আমি চেষ্টা করব একটু একটু করে তোমার দিকে এগোতে, তোমার কাছে সহজ হতে, সত্য হতে।'

মালা চৌকাঠের বাইরে পা তুলেছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, পিছন ফিরে শোভনের কুঁজো হয়ে বসা শীর্ণ শরীরের ওপর চোখ রাখল। এই মানুষটিকে সে ভালোবাসে। কিন্তু সে এমন রিক্ত হয়ে এল কেন তার কাছে। মালা যে অনেক ভেবেছিল, অনেক স্বপ্ন বাসনা। মালা ওকে শান্তি দিতে পারে, কিন্তু সে নিজেই কী এখন শান্তি পাচ্ছে না!

মালা লঘুপায়ে এগিয়ে এল।

'এই—'

শোভন কেঁপে উঠল। একটা উত্তাপ-স্পন্দন-সৌরভ তাকে জড়িয়ে ধরছে। শোভন কী বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই শোকের মতো একটা অনুভূতি তাকে ঘন করে রাখল। মালার শরীরটা যেন বিশাল হয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছে, শোভন প্রাণপণে সে আশ্রয়কে জড়িয়ে ধরল।

মালা বললে, 'আমাকে একটু বাঁচতে দিও, আমি আর কিছু চাইনে তোমার কাছে।'

মধ্যাহ্ন

আজকের দিনের মানুষের ট্রাজেডি তাদের সামনে লক্ষ্য নেই। জীবন আর যাই বলো পালছেঁড়া হালভাঙা নৌকো নয়। বাবা বলেন: জীবন ধারণের জন্যেও দরকার জীবন-ধারণা।' খাটে সোজা হয়ে বসে নির্মলা, পাদুটো মেঝেতে ঘষা খাচ্ছিল। কোমর থেকে ওর জঙ্ঘাদেশ তরাঙ্গিত হচ্ছিল, খাটটা দুলছিল।

নিরঞ্জন খাটে মুখোমুখি বসে বাইরে জানলার দিকে তাকিয়ে। শীতের পাঁশুটে আকাশ। বাঁদিকে চোখ রেখে খাটের গায়ে জড়ানো ফুলশয্যার ফুলগুলি দেখছিল, এখনো শুকিয়ে যায় নি, তারি গন্ধ এখনো ঘরের চার-দেয়ালে দম আটকে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। আলনায় তার শিল্কের পাঞ্জাবী, সোনার বোতামে আলো ঠিকরে পড়েছে।

মুখ ফিরিয়ে নির্মলার দেহের ওপর চোখ রাখল। বুদ্ধি আর স্বাস্থ্যে ওর উদ্দীপ্ত মুখ। যৌবন যেন স্থির শিখার মতো দীপ্ত। শ্যামল বলা চলে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে ওর কালো চোখের তারা একটু মেটে রঙ মাখানো। কপাল ছোটো। ঠোঁটদুটো ঈষৎ পুরু এবং কালচে রক্তের মতো রঙ। ছত্রিশ বছর শীত-গ্রীষ্ম পার করে দেয়া মেয়েটিকে নিশ্চয়ই তরুণ বলা যায় না। অভিজ্ঞতায় বুদ্ধিতে সপ্রতিভ।

হেসে বলে 'তোমার বাবা তো শুনেছি কালেকট্রির পেশকার ছিলেন...'

নির্মলা বললে, 'না, আমি তাঁর কথা বলছিনে।'

'পালিত মশায়ের কথা বলছ।' নিরঞ্জন বোকার মতো হাসল: 'আচ্ছা উনি তোমাকে পালন করবেন বলেই কী পালিত উপাধি নিয়েছিলেন?

নির্মলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'গুরুজনদের সম্পর্কে রসিকতা শোনা আমার ঠিক অভ্যেস নেই।'

'না। আমি ঠিক রসিকতা করিনি। কেনই বা করব। হাজার হোক তিনিই তো আমার শ্বশুর এখন।' নিরঞ্জন একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা শুধু শুধু পালিত মশায় তোমাকে পালিতকন্যা নিতে গেলেন কেন?'

'আমরা ছিলাম তিন বোন। আমিই বড়। মেজ পড়াশুনো করছে। ছোটোর বিয়ে হয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই আমার কতকগুলো আদর্শ ছিল।

দশজনের জন্যে কিছু করা। আমার এই আদর্শই পালিত মশায়কে কাছে টানল। বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বাবার কাছে তিনি আমাকে চেয়ে নিলেন।'

'পালিত মশায় তো শুনেছি বিয়ে করেন নি—'

'করেছিলেন। মা মারা গেছেন। বাবা আর বিয়ে করেননি। ভালোই হয়েছে না হলে বাবার কাছ থেকে সমাজ এত কাজ পেত না। সংসার তাঁকে বাঁধত, টেনে ছোটো করে রাখত। বাবা আর বাঁধা পড়তে চাননি।'

নিরঞ্জন এবার একটু হাসল।

নির্মলা সন্দেহ চোখে তাকাল।

'তুমি জেরা করতে শুরু করলে দেখছি। ব্যাপার কি?'

'না। অগ্নি। কী জানো বিয়ের পরে তোমার সব কথা জানতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন?'

'বা, করবে না? জীবনের সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়, আত্মার দোসরও বলতে পারো, একটা গোটা মানুষকে জানতে হলে অতীত জানাও প্রয়োজন।'

'বর্তমানে যা জেনেছ তাই কী সব নয়?'

'না।'

'মনে থাকে যেন জানবার অধিকার আমারও আছে।'

'নিশ্চয়ই। জানবে বইকি।' নিরঞ্জন পরিচ্ছন্ন হাসল। 'আচ্ছা: তারপর কী হলো?'

নির্মলা বললে, 'কিসের?'

'কি ভাবে আদর্শের দীক্ষা চলল?'

'বাবা বললেন আগে পড়াশোনা। পড়াশোনা চলল। দর্শনে এম. এ. পাশ করলাম। বাবা বললেন: এবার সংগীত। ওস্তাদ রেখে তিনবছর গান বাজনা চলল।'

'গানবাজনা!'

'বাবা বললেন: একমাত্র সংগীতই হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে পারে।'

'তারপর?'

'আবার কী!'

'না। জিজ্ঞেস করছি তোমার গানের শ্রোতা কে ছিল?'

'কেউ না। বাইরে জনসমাজে গান গাওয়া বাবা পছন্দ করতেন না। জনসমাজের স্তুতি সাধনার ব্যাঘাত করে।'

'তবে গান শিখলে কেন?'

'বাবা ভালোবাসতেন। রোজ রাত্রে বাইরের কোলাহল বন্ধ হয়ে এলে ঘরে বসে আমি গান গাইতাম। বাবা শুনতেন।'

নিরঞ্জন আবার একটি সিগারেট ধরাল।

'শোনো—অনেকক্ষণ থেকে তোমাকে বলব ভাবছি। এসব চলবে না।' নির্মলা বললে।

নিরঞ্জন বললে, 'কী?'

'সিগারেট খাওয়া।'

'কেন? এ ব্যাপারেও তোমার বাবার কোন থিওরি আছে নাকি?'

'তুমি রাগ করো আর যাই করো, তোমাকে তা পালন করতেই হবে।'

'আগে যুক্তিটা শুনি?'

'প্রয়োজনকে বাড়াতে নেই। বেঁচে-থাকার পক্ষে যতটুকু দরকার...'

নিরঞ্জন বললে, 'তুমি কী বিশ্বাস করো আমি আটত্রিশ পেরিয়েছি? এই আটত্রিশ বছর আমিও কিছু ধ্যানধারণা সঞ্চয় করে বড় হয়েছি। উপদেশ পালন করার একটা বয়েস থাকে।'

'উপদেশ! বেশ আমি কিছু বলতে চাইনে। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঠিক আজকের হালকা ছেলেদের মতো নও। জীবন সম্পর্কে তোমার চিন্তা আছে, দায়িত্ব আছে। সমাজের নৈতিকতার স্থায়ী মূল্য সম্পর্কে তুমি অন্তত বিচারশীল হবে—'

নিরঞ্জন বললে, 'কে ভাববে আমাদের মাত্র তিনদিন হল বিয়ে হয়েছে।'

নির্মলা বললে, 'বিয়েটাকে তুমি একটা সাধারণ ব্যাপার বলে ভাবো। এটাকে স্বাভাবিক কর্তব্য ছাড়া আর নতুন কী ভাবা যায়।'

'অন্তত আমাদের বাপঠাকুরদা সেই ভাবেই ভাবতে শিখিয়েছেন—'

'ভুল শিখিয়েছেন। আমি অন্তত অমন স্থূল জিনিসে বিশ্বাস করিনে।'

'তুমি সন্তান চাওনা? মা হতে চাওনা?'

'সন্তান না-চাওয়ার সঙ্গে মা হওয়ার বাধা কী' নির্মলা ভ্রূ কুঁচকালো: 'সন্তান হওয়া একটা প্রাকৃতিক ঘটনা, তা যে কেউ হতে পারে। কিন্তু মা একটা আদর্শ, তা যে কেউ হতে পারে না।'

'তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তার মানে তুমি বুঝতে চেষ্টা করছ না। সেটা আমার দোষ নয়।'

'আর একবার বোঝাও।' নিরঞ্জন বললে: 'সত্যি তুমি সন্তান চাও না? পারিবারিক জীবন?'

নির্মলা বললে, 'চাই চাই। তবে আরো দশজনে যেমন চায় তেমনটি নয়। আমি পার্টনার হতে চাই, জীবন-সঙ্গিনী। জীবন সম্পর্কে একটা লক্ষ্য আমাদের থাকবে, সেই লক্ষ্যের সমীপে পৌঁছতেই আমাদের একমাত্র আয়োজন।'

নিরঞ্জন চুপ করে রইল। নির্মলার চোখের তারা কখনো ছোটো কখনো দীর্ঘ হচ্ছে। ওর পুরু কালচে ঠোঁট মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে কাঁপছে। ওর জঙ্ঘাদেশ এখন স্তব্ধ, খাটের গায়ে ভারি হয়ে আটকে গেছে। হাতের আঙুলগুলি মটকাচ্ছে সে।

'সন্তান বহনই আদর্শ স্ত্রীর পরিচয় নয়। আরো অনেক কিছু বহন করতে হয়। সামাজিক দায়, দশজনের কাছে অঙ্গীকার। মেয়ে হওয়া নয় মানুষ হতে হবে। পরিপূর্ণ মানুষ। তোমাদের পুরুষশাসিত সমাজ এতদিন মেয়েদের ভিন্নতর মূল্য স্বীকার করেনি। ফলে মেয়েরা ছোটো হয়েছে। আমাদের ছোটো করে কিছু তোমরাও বড় হতে পারনি।'

নিরঞ্জন নিশ্বাস ফেলল।

'তুমি জানো আমারও একটা আদর্শ আছে। এই আদর্শকে বিয়ের সময় তুমি স্বীকার করে নিয়েছ।'

নিরঞ্জন বললে, 'আমাদের কী আটপৌরে জীবন থাকবে না? ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা—'

নির্মলা বললে, 'থাকবে বইকি। সেগুলো আমাদের আদর্শের লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। তুমি যদি এই মুহূর্তে আমাকে বলো: তুমি সন্তান চাও, ঘরোয়া স্বার্থপরের জীবন চাও, তা হয়তো তোমাকে দিতে পারবো না। কারণ সেটা তুমি যে কোনো মেয়ের কাছে পেতে পারতে, আমাকে বিয়ে করবার প্রয়োজন হত না।'

নিরঞ্জন বললে, 'তোমার বাবা এত ঝুঁকি নিয়ে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে গেলেন কেন? মানে তোমার বিয়ে করারই দরকার ছিল না।'

'ছিল। বাবা খুঁজছিলেন তোমারই মতো একজন যুবককে। যার

কোনো পিছটান নেই, নেই কোনো বন্ধন। অতি শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়েছ। পিসিমার বাড়িতে তুমি মানুষ। বাবার ধারণা ছিল তোমার মতো যুবক ছোটোখাটো স্বার্থ-ভুলে বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। বাবার বয়েস হচ্ছে, আমার নিঃসঙ্গতাও তিনি বুঝেছিলেন, তাই চেয়েছিলেন তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকার কাউকে দিয়ে যেতে। তুমিই সেই নির্বাচন।'

নিরঞ্জন বললে, 'আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়েও তিনি আমাকে কাছে পেতে পারতেন। অন্যের আদর্শের জের টানতে বিয়ের জোয়ালে বেঁধে দেয়া আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী নয় কি? তোমার কথা মতো একদা বাপপিতামহগণ বংশরক্ষার জন্যে সন্তানের বিয়ে দিতেন, আর তোমার বাবা আদর্শ রক্ষার জন্যে! দুটোই কী চাপিয়ে দেয়া নয়?'

নির্মলা এবার চুপ।

নিরঞ্জন বললে, 'দ্যাখো ভুল করি, ঠিক করি, জীবনটা আমার, আমারই নিজস্ব। সে-স্বাধীনতা কোন মতেই খর্ব করা চলবে না। ছোটোবেলায় আমার বাপ-মা মারা গিয়ে হয়তো এই একক সত্তাই আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। পিসিমার বাড়িতেও আমি একা। সুখ ছিল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাঁরাও কোনোদিন আমার বাপমার কর্তৃত্ব চাননি। কলেজে পড়েছি ইচ্ছেমতো। বি. এ পাশ করে ল পড়তে-পড়তে ছেড়ে দিলাম। কাউকে জবাবদিহি করতে হল না। তারপর—তোমার বাবার জামাই করার প্রস্তাব যখন এল পিসিমা আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি ভেবে দেখলাম মন্দ কী, অনেক দিন তো এঁদের আশ্রয়ে থাকলাম, এবার বদল হোক।—আশা করি তুমি বিরক্ত হচ্ছো না?'

নির্মলার আঙুলগুলি অকারণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। ওর মধ্যে চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

'আমরা ভেবেছিলাম—' নির্মলা শেষ করল না।

'তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের দিক থেকেই আমাকে ভেবেছিলে। ব্যবহার হতে অবশ্যই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জিনিসটা সত্যি কাজের কিনা তাও তো দেখতে হবে। তোমাদের প্রয়োজনের চাহিদা মতো আমি খাপ খেয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু সংসারের আকর্ষণ বলে আমার কিছু নেই। কিন্তু এটা ভেবে দেখা উচিত ছিল যার দায় নেই তার দায়িত্বও নেই।

এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে একটু-একটু করে তোমাদের প্রয়োজনীয় হতে পারি।'

'অনেক রাত হয়েছে—' নির্মলা বললে।

নিরঞ্জন বললে, 'হ্যাঁ। এসো।'

'কাল বাবার কাছে যাচ্ছো তো ?'

'যাব।'

'বাবার সঙ্গে যখন আলাপ হবে দেখবে তোমার অনেক ভুল ভেঙে যাবে ?'

নিরঞ্জন হাসল।

নির্মলা বললে 'আমরা এমন কিছু করতে পারিনে যাতে উনি ব্যথা পান। ভেবে দ্যাখো তো এতবড় একটা মানুষ কখনো কারুর কাছে কিছু পাননি। তাঁর এই ত্যাগ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা—এমন নিঃশব্দ সেবা—'

নিরঞ্জন হাই তুলল।

২

গলাবন্ধ গরমকোট ছোটো ধুতি পায়ে কেডস হ্রস্ব রোগা এবং কালো মানুষটিকে আজ যেন নতুন করে দেখল নিরঞ্জন। বিয়ের কোলাহলে বিশেষ করে চেনবার অবকাশ ছিল না।

'এসো বাবা। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো ?' আশুতোষ পালিত এগিয়ে এসে যুগলকে অভ্যর্থনা করলেন।

নিরঞ্জন চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। শহরের কলরব থেকে নির্জন জায়গাটা। যতদূরে চোখ যায় ধু ধু প্রান্তর, তাল-নারকেলের ছেঁড়া ছেঁড়া ঝোপ, আর চাষিদের খড়ের ছাউনি। মাঝখানে বাঙলো টাইপের বাড়ি। ডানদিকে ইস্কুল, তার পাশে কারখানাঘর, হাতে-কলমে কাজ শেখানো হয় গ্রামের মানুষদের। সমবায়ে চাষের জমি। গ্রামজীবনের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠান।

বিশ্রামের পর ঘুরে ঘুরে দেখালেন পালিত মশায়। তাঁর সামান্য কিছু সেবার আয়োজন। নিজেদের পাওয়ার হাউস। বিজলী। কলের জল। ইস্কুল, ল্যাবরেটারি, ওয়ার্কশপ, এমন কি হাসপাতাল পর্যন্ত। নার্শিং শেখারও ব্যবস্থা আছে।

'তোমরা শহরের মানুষ। অনেক দেখেছ। আমাদের এই গেঁয়ো লোকদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা—' হাসলেন পালিত মশায়।

নিরঞ্জন হাসল। 'সত্যি আমি এতটা ভাবতে পারিনি।'

আশুতোষ বললেন, 'এ আর এমন কী বাবা। যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। বয়েস তো হয়েছে।'

নিরঞ্জন বললে, 'আপনার আদর্শের কথা আমি শুনেছি। নির্মলা আমাকে সবই বলেছে।'

আশুতোষ বললেন, 'ও বেটী আমাকে খুব ভালোবাসে কিনা, তাই বাড়িয়ে বলা অভ্যেস—'

নিরঞ্জন এই সমুহ কর্মযজ্ঞের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে রইল।

'আদর্শটাদর্শ কোনো কাজের কথা নয়।' আশুতোষ ঘন ঘন মাথা নাড়লেন: 'কী জানো ওদের হাতে স্বর্গটর্গ এনে দিতে চাইনে। অন্তত হাতদুটো খাটিয়ে বাঁচুক, এইটেই আমার লক্ষ্য। কর্মই নারায়ণ, তাই না?'

নিরঞ্জন বললে, 'এই বিরাট প্রতিষ্ঠান আপনার একার পক্ষে কী করে সম্ভব হল?'

'যে কাজ করতে চায় তাকে নারায়ণ দেন। বাপঠাকুরদার কিছু ছোটোখাটো জমিদারি ছিল। ভাবলাম একা মানুষ সামলাতে পারবনা, একটা গতি হোক, তাই লাগিয়ে দিলাম চাষাভুষো মানুষগুলোকে। তা দেখলাম বাবা, কাজের অধিকার দিলে এই গেঁয়ো ভূতেরাও অসুরের মত কাজ করে।' আশুতোষ একসঙ্গে এত কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন। 'আমার বয়েস হয়েছে। এখনো অনেক কাজ বাকি। তোমরা দুজন আমার দুবাহু। আমি যা পারিনি তোমরা তা পারবে।'

নিরঞ্জন বললে, 'চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমার নিজের ওপর খুব বিশ্বাস নেই।'

নির্মলা হাসল শুধু।

'চলো। অনেকক্ষণ খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। দেখি গণেশ তোমাদের কী খেতে দেয়।' আশুতোষ বললেন।

খাওয়া দাওয়ার পর নিমগাছের শীতল ছায়ায় বসে পালিতমশায় অনেক গল্প করলেন। পল্লীর বহুবিধ সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায়। কাঁচাপাকা ছোটো করে ছাঁটা চুল, মুখে মেচেতার দাগ, চোখের কোণে অজস্র

রেখা। মানুষটার ভেতরে কোনো স্বপ্নবিলাস বা দার্শনিকতা ছিল না। মাটি আর মাটির মানুষ ছাড়া তাঁর বাস্তব চিন্তায় অন্যকিছু নেই। জমি, সেচের সমস্যা, বীজ, সার, ধান, রবিশস্য।

নিরঞ্জন একবার বললে, 'সমস্ত সমস্যাগুলিই তো প্রয়োজনের। এর বাইরে মানুষের আর কিছু থাকতে পারে কিনা?'

আশুতোষ বললেন, 'হৃদয়ের কথা বলছ তো? হৃদয় তো আর কাল্পনিক বিষয় নয়, জমিজলমাটির দৈনিক সংগ্রামের সঙ্গেই তার যোগ। যে কাজ করে, অন্যের শ্রমে বাঁচে না, অলস অকর্মন্য নয়, তার হৃদয়বৃত্তি এদিকেই পরিচালিত হয়। জমি চাষের সঙ্গে হৃদয়েরও চাষ হয়।'

নিরঞ্জন ওঁর কথা শোনে আর চিন্তা করে। এই মানুষটি অত্যন্ত সহজ, সরল। ওঁর এই সরলতাই এক আকর্ষণ। এবং আছে স্বাভাবিক বিশ্বাস-প্রবণতা। বিশ্বাস করতে পেরেই যেন খুশি। ময়লা রোগাটে শরীর সারা গায়ে মাটির সোঁদা গন্ধ। নিরঞ্জন গ্রাম দেখেনি। শহরবাসী আরো দশজনের মতেই গ্রাম সম্বন্ধে তারও একটা রোমান্টিক আর্তি আছে: কিন্তু—

কিন্তু মনে হয় না নিত্য সংস্পর্শে এই জীবনটাকে সে ভালোবাসতে পারবে। এখানে গতি নেই, তার বৈরাগী মন এখানে উধাও দিগন্তে পাখা মেলতে পারবে না। গ্রামের ছোটো আকাশ, দিগন্ত যেন ধনুকের মতো মাটিকে স্পর্শ করেছে। কিংবা একটা কঠিন আতংকই সে অনুভব করে, বাস্তব, রূঢ়, গদ্য।

কী-একটা কথা বলে আশুতোষ হাসছিলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'ক্লান্তি কী আমারও আসে না, বাবা। কিন্তু আমার মেয়ে নির্মলা কিছুতেই আমাকে থামতে দেবে না। পিছন থেকে সব সময় তাড়া দিচ্ছে। একেক সময় ভাবি গতিটা ওরই, যেমন করে এঞ্জিনের ঠেলা খেয়ে মালগাড়ি-গুলো একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে ছুটতে থাকে, এই বুড়োরও অবস্থা তাই।'

'নির্মলাও বুঝি আপনার মত খাটতে পারে?'

'আরে ওই তো এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। সকলে ওকে চেনে। ও-ই তো আসল কর্ত্রী, সম্পাদক। আমাকে শুধু জলঘটের মতো সভাপতি করে বসিয়ে রেখেছে।'

নিরঞ্জনের মনে হয় কাজ যারা করে তাদের কাজের প্রতি একটা নেশা আছে। সে নেশা তাকেও আকর্ষণ করে। কানের কাছে অনেকক্ষণ থেকে

সুর বাজছে। কাজের মৌমাছির গুঞ্জন। ইস্কুলে, কামার শালায়, বীক্ষণাগারে কাজের তরঙ্গ বয়ে চলেছে। এখানকার গাছপালা লতাপাতায় যেন কাজেরই ছন্দ। এই অবিরাম কর্মের নর্তনের সামনে নিজের অলস-অস্তিত্বে যেন লজ্জাই পায় নিরঞ্জন।

এখানে পা দেবার পর থেকে নির্মলার খোঁজ পাওয়া ভার। সে এই কাজের প্রবাহে কোথায় হারিয়ে গেছে। নিরঞ্জন একা-একা অনেকক্ষণ ইতস্তত ঘুরে বেড়াল। মাঠ পেরিয়ে কাঁদরের ধারে নেমে এল। শীতের প্রকোপে জল অনেক নীচে তিরতির করে বইছে। ওপারে দিগন্তে সূর্য ডুবছে, তার বর্ণালী খণ্ড খণ্ড মেঘে আলোকসজ্জা পরেছে। নিবিড় গম্ভীর সন্ধ্যা নামছে।

'জামাইবাবু, কর্তাবাবা আপনাকে একবার ডাকছেন—'

নিরঞ্জন মুখ ফিরিয়ে দেখল গণেশ।

'তোদের দিদিমনি কোথায় রে?'

'কর্তাবাবার কাছে। কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করছেন।'

'আচ্ছা। চল।' যেতে যেতে নিরঞ্জনের একবার মনে হল সারাদিনে একটিবারও নির্মলার সঙ্গে দেখা হয়নি। কাজের নেশায় সেও তলিয়ে গেছে। অথচ আজ চারদিন হল তাদের বিয়ে হয়েছে! নিরঞ্জন কী রোমান্সের কথা ভাবছে। ত্রিশোর্ধ মেয়ের কাছে! যে এতবড় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র। নাঃ নিরঞ্জন কোনোদিন তার এই সামান্য প্রাপ্যগুলি মুখ ফুটে চাইতে পারবে না। বড লজ্জা করে। এই বৃহৎ কাজের আকাশের তলায় নিরঞ্জন একটি ব্যক্তি, অণু-পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র। অব্যক্ত নির্জন বেদনায় বুকের ভেতর টনটন করে ওঠে। তার চেয়ে অনেক সহজ এই তাল তাল কাজের মধ্যে নিজেকে নিবিশেষে তলিয়ে দেয়া। কাজের ভেতরেই ওকে স্পর্শ করা যাবে।

অনেকদিন পর শৈশবের অস্ফুট প্রত্যূষ ভেঙে তার মৃত মায়ের মুখ একবার ভেসে উঠল। নিরঞ্জন উদ্‌গত আবেগকে সামলে নিল।

'এই যে এসো বাবা। তোমার কথাই হচ্ছিল।' আশুতোষ মৃদু হাসলেন: 'বেটী বলছিল তুমি নাকি আমাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে না? সত্যি নাকি বাবা?'

'আমি এখানে কাজ করব।' নিরঞ্জন গলায় অসম্ভব জোর দিয়ে ঘোষণা করল।'

'আমি জানি—' আশুতোষ গর্বিত হলেন : 'মানুষ চিনতে আমি ভুল করিনি।'

নির্মলা অবাক চোখে তাকাল নিরঞ্জনের দিকে। 'তুমি সত্যি বলছ? কাজ করবে আমাদের সঙ্গে।'

নিরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললে, 'যদি মনে করো আমার দ্বারা কোনো কাজ হবে—'

নির্মলা বললে 'ভালোই হল।'

নিরঞ্জন অনেকক্ষণ চেয়ারে বসে দেখল ওই অসমবয়সী দুটি কাজপাগল মানুষকে। ফাইলের অরণ্যে ডোবা। নির্মলা চিঠির খশড়া করছে। কখনো আশুতোষ নির্দেশ দিচ্ছেন। নিরঞ্জন অনেক সময় চুপ করে বসে রইল। একটা নির্জন একাকিত্ব তার হৃদয়কে ভেঙে চূর্ণ করে দিচ্ছে। স্থূল বেদনায় সমস্ত শরীর ভারি লাগে নিরঞ্জনের।

নিরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। 'আমার মাথাটা ভীষণ ধরেছে।'

'অ্যাঁ। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ বিসুখ না করে বসে। গ্রামের ঠাণ্ডা।' আশুতোষ ব্যস্ত হলেন : 'নির্মলা মা—'

নির্মলা স্বামীর দিকে ফিরে বললে, 'তুমি ঘরে গিয়ে শোও। আমি এখুনি আসছি।'

নিরঞ্জন পা টেনে বেরিয়ে এল। করিডরের অন্ধকারকে দুহাতে সরাতে-সরাতে সে ঘরের দরজা স্পর্শ করল। দরজা ঠেলতেই একরাশ শীতল অন্ধকার তাকে জড়িয়ে ধরল। হোঁচট সামলে নিয়ে নিচু কাতর গলায় একবার উচ্চারণ করল 'মাগো।' সত্যি কী তার মাথা ধরেছে! মাথা ধরলে কেমন লাগে! সে কী করে বুঝল তার মাথা ধরেছে। নিরঞ্জনের এতক্ষণ পর মনে হল সে করুণা ভিক্ষা করেছে। করুণা ভিক্ষা করেছে এমন একজন নিকটতম ব্যক্তির কাছে যা সম্ভ্রমহানিকর।

নির্মলা কী এখুনি এসে পড়বে! কাজের উত্তেজনায় টসটসে ওর মুখের চেহারা, ওর কালো মেটে চোখের তারা, মোটা ভুরুর ঈষৎ কুঞ্চন। অকস্মাৎ, অকস্মাৎই নিজেকে বন্দী মনে হল নিরঞ্জনের, পুরু জালের বেড়ায় আটকানো মাছির মতো। এবং এইমাত্র বন্দীদশার মধ্যে দিয়ে সে নতুন করে স্বাধীনতার তীব্র স্বাদ বুঝতে পারল। নিরঞ্জন ভাবল সে এই অন্ধকারে নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে পারে। হয়তো দৌড়ে গেলে পাঁচমাইল পথ পার হয়ে রাত্রির শেষ ট্রেন ধরতে পারবে।

কিন্তু, আশ্চর্য নিরঞ্জন কিছু করল না, করতে পারল না। কারণ নির্মলার আসার মুহূর্তটুকু সময়ের হিসাবে মাপতে পারছে না। নিরঞ্জনের বস্তুত মনে হল তার ভয়ানক মাথা ধরেছে। কপালের শিরা দুটো দপ্‌দপ্‌ করছে। চোখ ঝাঁঝাঁ করছে।

করিডরে স্লিপারের শব্দ।

'কী ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? নাও—এই ওষুধটুকু খেয়ে নাও—' নির্মলা।

নিরঞ্জন ওষুধের পাত্র নয়, ওর মণিবন্ধ খপ করে চেপে ধরল। কিন্তু, কতক্ষণ, নির্মলার কবজিটা যেন সাপের নির্মোকের মতো ভীতিপ্রদ ঠাণ্ডা। নিরঞ্জনের হৃৎপিণ্ডের রক্ত হিলহিল করে কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে গেল, আর বোবা একটা গোঙানি মুমূর্ষু শিশুর মতো লেগে রইল ঘরের মধ্যে।

নিরঞ্জনের মনে হল সে মরে গেছে।

৩

দীর্ঘ তিনবছর কাজ করবার পর এক ঘনঘোর বর্ষায় নিরঞ্জন নিখোঁজ হয়ে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত কেউ ওর কথা ভাবে নি। হয়তো দূরে কোথাও গেছে এখুনি ফিরে আসবে!

আপিসের কাজকর্ম সারতে প্রতিদিনের মতোই দেরি হল নির্মলার। তারপর একটি একটি করে আলো নিবল। বর্ষার অন্ধকার ব্যাঙের একঘেয়ে শব্দে উৎকট হয়ে উঠল।

পালিত মশায়ের কাছে রাত্রির সংগীত শেষ করে ঘরে ফিরে এসে এখন মনে পড়ল নিরঞ্জন ফেরে নি। নির্মলা জানলার সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকারে তালগাছের মাথাটা প্রেতের মতো দেখাচ্ছে। তরল অন্ধকারে আকাশ পৃথিবী লেপেপুঁছে গেছে।

আলনায় নিরঞ্জনের পাঞ্জাবিটা ঝুলছে। বিয়ের জামাটা, ঘাড় ছিঁড়ে গেছে, ময়লা চিট ধরেছে।

'কে?'

'আমি গণেশ।'

'এত রাত্রে!'

'জামাইবাবুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

'চিঠি!' শক্ত মেয়ে নির্মলা কী কাঁপল একটু। 'দেখি—'

বাইরে অঝোর বর্ষণ। আধো অন্ধকারে চিঠি হাতে নির্মলা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"পৃথিবীতে সব মানুষ সব কাজের উপযুক্ত নয় এইটে যখন বুঝতে পারা গেল তার সংশোধনের চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী। এই দীর্ঘ তিনবছর আমি কাজের মানুষ হয়েছি কিন্তু কাজকে ভালোবাসনি। তার কারণ হয়তো এই হবে কাজের একটা নির্দিষ্ট চরিত্র আমার চোখে ধরা পড়ে নি। কাজের জন্যে কাজ কোনোক্রমেই একটি নীতি নয়।

এখানে সব মানুষের কানেই একটি মন্ত্র শোনানো হচ্ছে: কাজ। যে কাজ করবে তার কোনো স্বাধীন নির্বাচন নেই। কর্তৃপক্ষ নামক একটি উপরতলার নির্দেশ তাদের কাজে নিযুক্ত করে রেখেছে। ফলে কাজের হাত দুটো একজনের, মস্তিষ্ক আর একজনের। হাতের সঙ্গে মস্তিষ্কের এই ব্যবধান একটা যান্ত্রিক পদ্ধতির সৃষ্টি করছে। প্রাণীজগতে এই নিয়ম চলে সৃজনক্ষম মানুষের বেলায় এটা নির্মম অত্যাচার। তাই অত্যাচারের ঘায়ে এখানকার সমস্ত কর্মীর গায়ে কালসিটের দাগ।

আরো দশজন মানুষের সঙ্গে আমিও একজন কর্মী হয়ে উঠেছিলাম। এবং তোমার চোখে সানন্দ স্বীকৃতি ছিল আমার এই নির্বিশেষ কর্মীসত্তার প্রতি। বস্তুত আমি প্রতিদিন তোমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম, আমার স্থান হচ্ছিল কর্মীদেরই মাঝখানে। এই ভাবে দশজনের মধ্যে মিশে যেতে পারাটা অবশ্যই প্রতিভার পরিচয়।

কিন্তু খটকা লাগছিল এক জায়গায়। আমার স্বামীত্বের অহংকারে। অন্যেরা কাজ করে, কারণ কোনো সম্পর্কের দায় নেই তাদের। তুমি যদি আমার স্ত্রী না হতে তাহলে হয়তো আমার পক্ষে কাজ করা সহজ ছিল। কখনো কেউ একজন লোক, কখনো বিশেষ একজন স্বামী, এই দ্বৈত-পীড়নে আমি পর্যুদস্ত হচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না কোন পরিচয়টা তোমার কাছে সত্য। কাজ করতে গেলে আমাকে প্রথমত এই ধাঁধাটাই সমাধান করতে হবে।

জনতা ছোটোখাটো অভাব-অভিযোগ নিয়ে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমি বুঝতে পারিনে আমি জনতার না তোমার। দাঁড়াতে গেলে একটি পক্ষ নিতেই হবে। কিন্তু আমার ধারণা ওরাও একেক সময়

আমাকে বিশ্বাস করতে চাইত না এবং আমাকে ওদের সুবিধা আদায়ের সুলভ যন্ত্র মনে করত। আর সেই সময় আমার সংকোচ দ্বিগুণিত হত।

আমার ভূমিকাটুকু সুবিধাবাদী হয়ে উঠত। কারণ কর্মী আর কর্তৃপক্ষের মাঝখানে আমার অস্তিত্বকে ওরা চিহ্নিত করতে চাইত। অথচ তুমি জানো আমি তা কোনোদিনই ছিলাম না। আমার কর্তৃত্বের দায় ছিল না, বরং কাজের প্রতি সায় ছিল। তবু আমি ওদেরই একজন হতে পারছিলাম না।

অথচ কাজ করতে গেলে আগে আমার পায়ের তলার নির্দিষ্ট স্থানটি চিনে নেয়া দরকার। আমি কখনো কখনো ওদের হয়ে দরবার করেছি তোমার কাছে। অথচ তোমাকে পুরোপুরি সম্পাদকও ভাবতে পারি নি। ফলে দরবারটা নিছক প্রার্থনায় পরিণত হয়েছে। কখনো আমার কথা শুনে ওদের অভিযোগ দূর করতে চেষ্টা করেছ। কিন্তু আমার এটা ভালো লাগেনি। ভালো লাগেনি এইকারণে ওদের মনে আমি কোনো অধিকারবোধ জন্মাতে পারি নি।

আমার এই অবস্থাটা তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয় কল্পনা করতে পারো। আমি কারুর ভালো করতে না পারি ক্ষতি করতে পারিনে। ওদের ভালো করার নামে আমি ওদের ক্ষতিই করছিলাম।

আমি ওদের কাছে একটা মিথ্যা আশ্রয় ছিলাম। ওরা পক্ষাপক্ষ চিনতে পারছিল না। কাজেই আমার ছলনাটুকু ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হল।

আমার মনে হয় তোমাদের সমস্ত পদ্ধতিতে কোথাও একটা গোলমাল আছে। যাবতীয় পুরনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বোধহয় এমনটা ঘটে। প্রতিষ্ঠান যতই প্রাচীন হয় তার একটা আকৃতি গড়ে ওঠে এবং একসময় কতকগুলি স্থায়ী ধারণার শেকলে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। তারপর যে-উদ্দেশ্যে একদিন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সেই জীবন্ত উদ্দেশ্যটাই যায় হারিয়ে। প্রতিষ্ঠানিক ছাঁচের অনেক বাইরে পড়ে থাকে মানুষগুলো। বিরাটবপু প্রতিষ্ঠান তাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিমানুষের ট্রাজেডি এইখানেই। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিও একদা এই পরিণতিতে পৌঁছোয়: জনতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েও সে জন-প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে না। পরিচালকবর্গের একটি চক্র গড়ে ওঠে।

আপাতত কলকাতায় যাচ্ছি। আমার এক সতীর্থ দৈনিক কাগজের

আপিসে চাকরি করে। আশ্বাস দিয়েছে ওদের দপ্তরে আমার একটা ধান্দা হয়ে যেতে পারে।......"

বাইরের বৃষ্টির শেষ নেই। বর্ষার রাত্রি ঘন হয়ে উঠেছে।

নির্মলা চিঠি শেষ করে অনেকক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিছু ভাবতে চেষ্টা করছে সে। পারছে না। ভাবনাগুলি যেন অনেক—অনেক কাল আগেই একটা কঠিন অবয়বে পরিণত হয়েছে। দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে এমন একটি ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কোনোদিন চিন্তা করার অবকাশ আসেনি। এ-বিষয় তার আয়ত্তে নয়, অন্তত কোনো ফাইলের নোট্‌শীটে এর উল্লেখ নেই। নিরঞ্জনের মন্তব্যগুলি ইতিপূর্বে তার কোনো হিসেবের মধ্যে পড়েনি। নির্মলা তার প্রতিষ্ঠানের শাশ্বত রূপের সঙ্গে ওর কথাগুলো অসংলগ্ন বোধ করল। একটা অনিয়ম, বিশৃংখলা। এবং আরও মনে হল নিরঞ্জন একজন বিদ্রোহী প্রজা। এই বিদ্রোহই নির্মলার চিন্তার জগৎকে জটিল করে তুলছে। যদি নিরঞ্জনের বিদ্রোহ তার একার বিরুদ্ধে হত, তাহলে তাকে চেনা যেত, হাতের নাগালে পাওয়া যেত। কিন্তু নিরঞ্জনের বিদ্রোহ নির্মলার বিরুদ্ধে নয়। এখানকার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে। নির্মলার ধ্যান, বিশ্বাস, আদর্শ সব কিছুর ওপর সে অনাস্থার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। এতবড় বিরুদ্ধতার আঘাত নির্মলা এর আগে কোনোদিন তার রক্তে অনুভব করেনি।

'নির্মলা মা, অনেক রাত হয়েছে—' পালিত মশায়ের কণ্ঠস্বর।

নির্মলা কোনো উত্তর করল না।

অভ্যস্ত গতিতে অন্য দিনের মতোই অন্যমনস্কে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের জট ছাড়াতে লাগল। সারাদিনে এই অবসরটুকুই তার কেশচর্চা। চিবুকে একটা ব্রন হয়েছে। চোখের মেটে মণি। কপালে ঈষৎ কুঞ্চন, ভ্রূ কোঁচকালো নির্মলা।

এবং আর-একবার তার মনে হল নিরঞ্জন চলে গেছে। এখানকার আরো-দশটা কাজের সঙ্গে সে জড়িয়ে গিয়েছিল চেতনায়। এক ধরনের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এই ঘর, এই পাশাপাশি খাট, এই নিরঞ্জন, টেবিলে ঢাকা জলের গ্লাস, যাবতীয় অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

এখন অনেক রাত। ঘুমে বোঝাই গভীর রাত্রির গাড়ি ছাই ছাই ভোরেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে।

নবেন্দু বললে, 'এর কোনো অর্থ হয় না।'

নিরঞ্জন হেসে বললে, 'কী ?'

'বিয়ের পর বউ থাকবে এক জায়গায় আর তুমি অন্ধকার ঘরে শুয়ে কড়িকাঠ গুনবে।'

নিরঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, 'তাই বলো।'

'না-না উড়িয়ে দিলে চলবে না। বিয়ের পরও যদি একলা থাকতে হয় তাহলে এসব কাণ্ড কারখানার কী দরকার ছিল !'

নিরঞ্জন কী-বোঝাতে চাইল, তার আগেই নবেন্দু হাত নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠল : 'দ্যাখো ওসব ফ্রেমে-বাঁধানো কথা রেখে দাও। ফ্যামিলি লাইফ ইজ এ ফ্যামিলি লাইফ। এটা একটা প্রয়োজন। তা নাহলে দায়িত্ব আসবে কেন।'

নিরঞ্জন বললে, 'তুমি বিষয়টা বুঝতে চাইছ না। আমার প্রয়োজনের দিকে চেয়ে ওর মহৎ সামাজিক একটা আদর্শ তো নষ্ট করে দিতে পারিনে। যতদিন পারে করুক না কেন, তারপর না-পারলে চলে আসবে।'

নবেন্দু বললে 'তুমি কী পেলে ?'

নিরঞ্জন বললে, 'সব সময় কী হিসেব করে চলা যায়, নবেন্দু। কাছে থাকলেও সব সময় কাছে পাওয়া যায় না। আমি আঁকড়ে ধরে রাখিনি বলেই ও ওর আদর্শ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। আজকের দিনে এরকম ঘটনা বড় দেখা যায় না।'

নবেন্দু বললে, 'এটা বঞ্চিতের যুক্তি। দাম্পত্য জীবনে কতকগুলো কর্তব্য আছে। সেগুলো কী করে পূর্ণ হবে! আমি তো বাবা ভাবতেই পারিনে। রাত্তিরে বাড়ি ফিরব আর সুষমা আমার পাশে নেই! আমার সাত বছরের মেয়ে শান্তু বাড়িতে পা দেবামাত্র তার ইস্কুলের রাজ্যের অভিজ্ঞতা বলে আমাকে হিমসিম খাওয়াবে না! জানো সুষমাকে বাপের বাড়িতে পর্যন্ত যেতে দিইনে।'

নিরঞ্জন হাসল।

'হাসবেই তো—' নবেন্দু মুখ গোঁজ করে বললে, 'আমরা মৌলিক হবার চেষ্টা করিনে কিনা।'

নিরঞ্জন বললে, 'না তা নয়। আচ্ছা ধরো তোমার স্ত্রী দূরে কোথাও চাকরি করেন তাহলে কী করতে ?'

'কাছে বদলি করবার চেষ্টা করতাম। না হত ওর চাকরি ছাড়তে হত। দ্যাখো ভাই দুটো পয়সা বেশি এলে সংসারের অনেক প্রয়োজন মিটত সত্যি কথা, জীবনে শান্তি আসত না। বউয়ের রোজগারে একটা প্রেসার কুকার কেনার লোভটাকে বড় করে কখনোই দেখতাম না। জানিনে তোমার মতো বড়লোক হলে কী করতাম!'

'বড়লোক! গালাগাল দিচ্ছো কেন?'

'একই কথা। পালিতমশায়ের মতো ব্যক্তি তোমার শ্বশুর। নাম-ডাকঅলা লোক। শুনেছি অনেক পয়সাও আছে। তাঁরই মেয়ে তো। আসলে কী জানো। ওই গ্ল্যামারই তোমার সর্বনাশ করেছে।'

'তুমি কী বলছ নবেন্দু।'

'দ্যাখো ভাই যখন বন্ধুত্ব মেনেই নিয়েছ হারাবার ভয়ে মন রেখে কথা বলতে পারব না। তোমার সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি। সুষমারও তাই মত। ও তো তোমাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। বলে: যে-পুরুষকে দেখলে মেয়েদের করুণা হয় তার মতো অভাগা আর কেউ নেই। আর তোমার স্ত্রী সম্পর্কে তো আরোই। বিয়ের পর যে স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকতে চায় না সে নাকি—'

নিরঞ্জন এবার রাগল। 'তাহলে আমি তোমাদের একটি আলোচনার বস্তু হয়ে পড়েছি কী বলো? দ্যাখো নবেন্দু এটা আমার নেহাত-ই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমাদের মতো গড়পড়তা মানুষ যারা বিয়েকে মনে করো প্রজনন আর বংশবৃদ্ধি সে জাতীয় অশ্লীল স্থূল জৈবিকতার অন্ধ শিকার হওয়াকে আমি…'

নবেন্দু বিবর্ণ হল। 'তুমি এমন রাগবে জানলে…। হ্যাঁ ভাই, সত্যি আমরা অত্যন্ত মামুলি মানুষ। বড় স্বপ্ন দেখিনে, উচ্চাকাংক্ষাও নেই। আরো দশটা আবেগের মতো শরীরে পিতৃত্বেরও একটা আবেগ বোধ করি, স্বীকার করতে লজ্জা কী।'

নিরঞ্জন চুপ করে রইল। বহুদিন এমন মেজাজ খারাপ হয়নি। তারও যে একটা মেজাজ আছে জানা ছিল না। এখন রাগ করে কেমন অস্বাভাবিক উত্তেজনা বোধ করছে। আর, বিশ্রী রকমের অবসাদ আর ক্লান্তি নেমে আসছে। সে ঠিক এই ভাবে নবেন্দুকে বলতে চায়নি। নবেন্দু আসলে তো কোনো জটিল মানুষ নয়, যা বিশ্বাস করে সরল মনে বলে। ওর

সরলতাই কী তবে রাগের কারণ! নাকি নিরঞ্জনের অস্তিত্বের প্রচণ্ড অহংকার!

নবেন্দুর কাছে ক্ষমা চাইবার আগেই সে মুখ কালি করে চলে গেল।

নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ভোঁতামুখ একটা যন্ত্রণা তাকে কুঁরে কুঁরে খেতে লাগল। গ্ল্যামারের কথা কী বলে গেল নবেন্দু! পালিত-মশায়ের গ্ল্যামার। কিন্তু নিরঞ্জন তো তাঁর প্রতিপত্তিকে নিজের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করেনি। কেরিয়ার তৈরি করার কোনো সংকল্প তার নেই। পালিতমশায় তার শ্বশুর একথা সে ভুলতে চাইলেও লোকে ভুলতে দেবে না। কে জানে নবেন্দু হয়তো তার চাকরির সুপারিশের সময় কর্তৃপক্ষকে ওর এই উজ্জ্বল পরিচয়টুকু দিতে ভোলেনি। হয়তো চাকরি পাওয়ার সুবিধেই হয়েছে এর ফলে। নিরঞ্জন আবার ক্লান্ত হল। পুরু ঠোঁট কালো চোখ প্রাজ্ঞ নির্মলার চেহারাটা ভারি পরদার মতো তার চোখের সামনে ঝুলতে লাগল। নির্মলা, তার স্ত্রী। এখন মনে হল নিরঞ্জনের সে তাকে ভয় করে। একটা হীনমন্যতা তাকে ন্যুব্জ করে রাখছে। নির্মলা দূরে থেকেও তার ভীতিময় অস্তিত্বের শেকলে তাকে বেঁধে রেখেছে। নাহলে সে, নিরঞ্জন, তার অত সাধের বিলাস সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিল কেন! কেন সে রেস্তোরায় যেতে পারে না, সিনেমায় যাবার মতো উৎসাহ পায় না। এবং সেদিন শ্বশুর-মশায়ের জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে দুশো টাকা ইনসিওর করে পাঠালে সে গ্রহণ করতে পারল কী করে! নিরঞ্জন নিজের মনের কাছে হতাশ হল। অবশ্যই সে ওঁদের কাছ থেকে কোনো কিছুই দাবি করে না, কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে বলেই অস্বীকার করাও আর-এক সমস্যা। আসলে সে উত্তেজনা এড়াতে চায়, গোলমাল। তাই নিঃশব্দে মেনে-নেয়া।

এর মধ্যে মাঝে মাঝে শনিবার কী রবিবার ছুটি কাটাতে নির্মলা তার বাড়িতে পা দিয়েছে বইকি। খেয়েছে দেয়েছে ঘুমিয়েছে, আর তারই নিজস্ব কাজে নির্মলা বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। নিরঞ্জন নিজের কাজ করেছে। সারাদিন আপিসে। রাত্রে কখনো যোগাযোগ হলে দুজনে নীরবেই একসঙ্গে খেয়েছে। তক্তপোশ একটিই বলে ইচ্ছে করে নিরঞ্জন মেঝের আলাদা বিছানা পেতে নিয়েছে। এই দিনগুলিতে তেমন কথা জমেনি। নিরঞ্জনের মনের ওপর একটা গুমোট ছিল। এবং নির্মলার আচরণে এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যে গুমোট ভাঙে। একদিন বোধহয় রেগে ওঠবার মতো কারণ খুঁজে

পেয়েছিল নিরঞ্জন। নির্মলা বাজারের পয়সা ব্যাগ খুলে দিতে গিয়েছিল। নিরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বলেছিল: 'থাক। দরকার হবে না।'

নির্মলা ভ্রূ তুলেছিল, চোখ লাল করে জিজ্ঞেস করেছিল: 'কেন? আমি কি একদিন দিতে পারিনে?' নিরঞ্জন বলেছিল: 'বাড়ি আমার। গৃহস্বামীর অধিকার আর অতিথির অধিকার এক জাতীয় নয়।' নির্মলা চুপ করে গিয়েছিল। এমন কি রান্নার ঘরে পা দেবার ঝুঁকি নেয়নি নির্মলা। নিরঞ্জনের ভৃত্য নিবারণ যা পরিবেশন করত তাই ছিল খাদ্যের তালিকায়। মাছ কিছু বেশি আসত, ডিম এবং মাংস। অতিথি সৎকারে ত্রুটি ছিল না নিরঞ্জনের। এই দিনগুলিতে নিরঞ্জন আশ্চর্য শান্ত আর শীতল থাকত। কোনোদিন নবেন্দু এসে পড়ত। দু একটি ঠাট্টা তামাশা হত। বলত: 'তোমার উনি বুঝি ভয়ংকর পর্দানসীন।' নিরঞ্জন এড়িয়ে যেত। বস্তুত তার বন্ধুদের সম্পর্কে নির্মলার উদাসীনতা ছিল। হয়তো মনে করত নিরঞ্জন বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত। এবং আজকের লঘু প্রকৃতির যুবকদের সম্পর্কে নির্মলা শ্রদ্ধাহীন। এসব বন্ধুরা সিগারেট খায়, সিনেমা দেখে এবং আর কী না করে। নিরঞ্জন কোনো সময়ে নির্মলাকে পীড়াপীড়ি করত না। বোধহয় একবার সে বেরিয়েছিল নবেন্দুর সামনে। নিরঞ্জন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওর হাত তুলে নমস্কার করা, কথা বলার মধ্যে কেমন এক অস্বাভাবিকতা ছিল। তাড়াতাড়ি কথা বলা, আর হুড়মুড় করে একটি বাক্যের পরে আর একটি বাক্য এসে বিশ্রী রকমের জড়িয়ে যাওয়া। এক ধরনের নার্ভাশনেশ বলে মনে হত নিরঞ্জনের। নিরঞ্জনের আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে হয়নি।

নবেন্দু চলে যাবার পর নিরঞ্জন এই সকল কথাই ভাবছিল। মন বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। নিরঞ্জন চিন্তা করে, সে কী চায়। আর তখনই অবাক হয়ে লক্ষ্য করে তার চাইবার কিছুই নেই। কোনোদিন কিছুই চায় নি সে। তার মা-বাবা ছোটো বেলায় তাকে ছেড়ে গিয়ে না চাইবারই শিক্ষা দিয়ে গেছে। বিয়ের পর পিসিমার কাছেও যায়নি। সেবার পিসিমা এসেছিলেন। নিজের চোখেই সংসার দেখে গেছেন। কোনো প্রশ্ন করেন নি। প্রশ্ন করলেও কোনো উত্তর পেতেন কিনা কে জানে। দুএকটি শারীরিক প্রশ্ন। নিয়ম পালনের কিছু উপদেশ। আর বেশি সময় কাটত দক্ষিণেশ্বর বেলুড়। এবং মেয়ে দেখার বাতিক, যে ছেলের

তিনি বিয়ে দেবেন না কোনোদিনই। নিরঞ্জন জানে না পিসিমার সঙ্গে দেখা হলে নির্মলার সঙ্গে ওঁর কী কথা হত। তবে পিসিমার তীর্থদর্শনের সঙ্গী হতে ভালোবাসত নির্মলা।

না: নিরঞ্জন বুঝতে পারত না কী চায় সে, কী পেলে তার ভালো হবে। একেক সময় ভাবে নির্মলা যদি কোনোদিন তার কাছে স্থায়ীভাবে থাকতে চায়, তাহলেও তার ভালো লাগবে না।

হয়তো সে সম্ভাবনা নেই বলেই সে এমন ভাবতে পারছে। একা বাস করতে-করতে তার মনের ভঙ্গিটাও কেমন বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন নির্ভরতা বোধ করছে সে। প্রতিদিনের বাজার খরচ, ডাইক্লিনিঙে জামা কাপড় পাঠানো, ঘরের প্রতিটি জিনিস গুছিয়ে রাখা—সব কিছুর মধ্যে স্বাবলম্বিতা। এমন কি নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরা, জানলার সামনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকা, কখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনতা দেখা, সব কিছু এমন নিয়ম মতো প্রবাহিত যে মনের উপর কোনো উৎপীড়ন থাকে না। বরং নির্মলা এলেই কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ওর জামাকাপড় ভ্যানিটি ব্যাগে একটা ভিন্নতর হাওয়া প্রবেশ করে। বেডিং নামিয়ে মেঝেয় শোয়া পর্যন্ত।

নিবারণ এসে জানাল: 'রান্না তৈরি।'

নিরঞ্জন গায়ের আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল।

নিরঞ্জন একদা দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। এক দুঃসহ নির্জন মুহূর্তে একটি গল্প রচনা করল। অপূর্ব বিষয়, তার দুঃসাহসিকতাকে প্রশ্রয় দেবার মতো সম্পাদকও পাওয়া গেল বাঙলা দেশে।

গল্পটি আসলে কিছু হয়েছে কিনা নিজেরই সন্দেহ ছিল। কারণ যাকে বলে কাহিনী তার কিছুই ছিল না। স্বগতচিন্তার আকারে জনৈক যুবকের সংলাপ না বলে প্রলাপও বলা যেতে পারে। ডবলডেকারের তলায় সে মারা গেল। পকেটে পুরনো ট্রামের টিকিট, খুচরো পয়সা, কয়েকটি পোস্টকার্ড এবং প্যাকেটে কতিপয় চারমিনার সিগারেট। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা ছিল দর্শনের ধোঁয়া মেশানো।

সম্পাদকের দপ্তরে জনৈক উৎসাহী পাঠক জানাল: 'বাঙলা সাহিত্য এতদিনে একজন কাফ্‌কাকে পেল।'

নিরঞ্জন কাফ্‌কার নাম শোনে নি। তার মনে হল উচ্চাঙ্গের রসিকতা। এবং একলা সময় কাটানোর পক্ষে রসিকতাটা এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যে নিরঞ্জন ওই জোড়ে আরও কয়েকটি গল্প লিখে ফেলল।

কী করে তার এই উদ্‌ভিন্ন প্রতিভার সৌরভ বায়ুস্তর ভেদ করে নির্মলার নাসারন্ধ্রে গিয়ে প্রবেশ করল।

নির্মলা লিখল: 'তোমার এই পতনে বাবা খুব দুঃখিত হয়েছেন।'

নিরঞ্জন লিখল: 'আর তুমি?'

নির্মলা লিখল: 'সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা বুঝি, বুঝি না এই ধরনের শস্তা নামের নেশা তোমাকে পেয়ে বসল কেন? লিখতে হয় সমাজের কল্যাণের কথা ভেবে লেখো! দায়িত্বহীন রচনা সামাজিক নৈতিকতার মান নামিয়ে দেয়। মেয়েরা মায়ের জাত, শক্তির অধিকারিণী। সমাজের চোখে তাদের নামিয়ে দিলে গোটা ব্যবস্থাই ধ্বসে পড়ে। মেয়েরা পুরুষের জীবনে শুধু প্রেরণা।'

নিরঞ্জন লিখল: 'সমাজ-সংস্কারে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি কারুকর্মী, তাকে দেখানোই আমার কাজ। শিল্প হচ্ছে দর্পণ, চলমান জীবন প্রবাহকে প্রতিবিম্বিত করাই তার কাজ। বাস্তব যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় সে অন্ধকারই দর্পণে প্রতিফলিত হবে, যদি আলো জাগে আলোও থাকবে। শাদা-কালো কোনো অংশই শিল্পের চোখে কম সত্য নয়।'

নির্মলা লিখল: 'বাস্তবকে প্রতিফলন করাই কী শিল্পের শেষ কাজ। অনুকরণ কী সাহিত্য? সাহিত্য কী ফোটোগ্রাফি?'

নিরঞ্জন লিখল: 'যা দেখব তাই লিখব। যা দেখিনি তা লিখব কী করে? আগে সাহিত্য বাস্তব হোক, সত্য হোক। অনাগত ভবিষ্যতের রোমান্স যে আঁকতে পারে আঁকুক। আমি জীবনকে নগ্ন করে দেখতে চাই।'

নির্মলা লিখল: 'শিল্পী ভবিষ্যত-দ্রষ্টা। সংস্কৃত অলংকারিকগণ তাই তাঁদের বলেছেন: 'কবিক্রতু'। রাম না হতেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল।'

নিরঞ্জন আর উত্তর করল না।

সে নির্বিবাদে আপিস আর বাড়িতে অবকাশ সময়ে কাফ্‌কা পড়তে শুরু করল।

পালিতমশায় চিঠি লিখলেন: 'এবার বিবাহ-বার্ষিকীতে তোমার আসা চাই। আমরা সেদিন এখানে ছুটি দিয়েছি। একটা বড় রকমের আনন্দের আয়োজন করা হয়েছে।'

চিঠি পেয়ে নিরঞ্জনের মেজাজ খারাপ হল। বিবাহ-বার্ষিকীর স্মৃতি তার মনের ভেতরে গাঁথা আছে। একসঙ্গে পান ভোজন আনন্দ গান। অনুষ্ঠানটাই বড় হয়ে ওঠে।

নিরঞ্জন বানিয়ে লিখে দিল: 'আপিসের জরুরি প্রয়োজনে আমাকে বেরুবাড়ি যেতে হচ্ছে। এবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হল না। আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

তারপর নির্দিষ্ট দিনে দুপুরে নবেন্দুর বাড়িতে গিয়ে হাজির।

সুষমা জিজ্ঞেস করল: 'কী ব্যাপার ঠাকুরপো? এই সময়ে?'

নিরঞ্জন গম্ভীর গলায় বললে, 'শানু কোথায়? আমরা দুজনে চিড়িয়াখানায় যাব।'

'হঠাৎ? এত উৎসাহ?'

'শাদা বাঘ এসেছে না? দেখা হয়নি।'

শানুকে ট্যাকে করে অনর্গল ওর সঙ্গে কথা বলে সে চিড়িয়াখানায় কাটাল। কাকু এটা কি—ওটা কি বলে শানু তাকে ব্যস্ত করে রাখল। গণ্ডারের শিং কোথায় গেল? ময়ুর শাদা কেন? রঙবেরঙের আফ্রিকান ম্যান্ড্রিল। পোলার বেয়ার। জলে একরাশ হাঁস। শাদা বাঘ। সাপের ঘরে শানু কিছুতেই গেল না। তারপর ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে একদফা আইসক্রিম। শানুর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখ লাল। পায়ের অনেক পরিশ্রম হয়েছে। তারপর দুজনে আবার ম্যাগ্নোলিয়া থেকে লাল তুলো খেল।

নিরঞ্জন কিছু দৃঢ়চরিত্রের লোক ছিল না। একটা কাজ করে ফেলে তার দুশ্চিন্তার জের তাকে বইতে হয়। আর, অদৃশ্য তরবারির মতো একটা সংকটকে সে সবসময় তার চোখের সামনে ঝুলতে ছাখে। নির্মলার তীক্ষ্ণ পত্রবাণ। কিংবা শ্বশুরমশায়ের গম্ভীর সুভাষিতবাণী। কে বলতে পারে ওরা কখন কোন সময়ে উপস্থিত হয়ে পড়ে। নিরঞ্জন আসলে ওদের অস্বীকার করতে পারে না। কারন তারজন্যে শক্তির প্রয়োজন।

কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর যখন কিছুই হল না নিরঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু এ-স্বস্তিটুকুও যেন তার অর্জন করা নয়, ওপক্ষের দান। নিরঞ্জন ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল।

এবং এক সময় মরিয়া হয়ে সে অনেককিছু নিষিদ্ধ জিনিস করে বসল। সিগারেট কিনে খেতে এবং বিলোতে শুরু করল। সিনেমা রেস্তোরায় কফি-হাউসে নিয়মমতো হাজিরা দিতে আরম্ভ করল। অবশ্য নির্মলা এলে সে সিগারেট নিয়ে বাড়িতে ঢুকত না। বাইরে খেলেও দোষ কাটাবার জন্যে

এলাচ-দেয়া বেনারসী পান মুখে দিয়ে বাড়িতে ঢুকত। সাহসের এই প্রদর্শনী এবং তাকে গোপন করবার চেষ্টা—নিরঞ্জনের মনের ভেতরে একটা উৎপীড়ন শুরু করল। আরো দশটা আধুনিক মানুষের মতো তারও একটা দ্বৈতজীবন গড়ে উঠল। এই যুগল-জীবনকে সামলাতে প্রাণান্তকর অবস্থা হল নিরঞ্জনের। তার একক নিঃসঙ্গ জীবনেও সে স্বাধীনতার অর্থ খুঁজে পেল না। বিবাহটা বাস্তব জীবনে যতই মিথ্যা হোক তার দায় তাকে বহন করতে হচ্ছে। আর, নিরঞ্জন বুঝতে পারে মানুষের জীবনধারণের অর্থই কিছু কিছু দায় বহন করা। হয়তো এই দায়গুলি অস্বীকার করা চলে, কিন্তু প্রাণধারণ মিথ্যা হয়।

নিরঞ্জন এইভাবে চিন্তাগুলিকে পরিচালনা করতে চায়, কিন্তু সান্ত্বনা পায় না। নিজের প্রতি তার নিজস্ব ধরণের শ্রদ্ধাবোধ আছে, তাকে সে নষ্ট করতে চায় না। সাহিত্যের সাম্প্রতিক বাস্তিক তাকে আরো নিষ্ক্রিয় অকর্মণ্য করে দেয়। নিষ্ঠুর বাস্তববোধকে শিল্পের পথে চালান করে দেবার প্রশ্রয় পায়।

৬

টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে নিরঞ্জন অবাক হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারছে না। আবার শব্দ করে পড়ল।

বাবা মৃত্যুশয্যায়। অবিলম্বে এস।—লীলা।

ঠিকানাটা আবার পড়ল নিরঞ্জন। লালবাগ। মুর্শিদাবাদ।

এতক্ষণ পর মনে হল নিরঞ্জনের লীলা নির্মলার ছোটোবোন। যার স্বামী জিয়াগঞ্জে কলেজের অধ্যাপক। বৃদ্ধ বয়েসে ওদের বাবা ছোটোমেয়ের কাছেই থাকতেন। কিন্তু, এখানকার ঠিকানা লীলা পেল কী করে। সম্ভবত নির্মলার সঙ্গে পত্রযোগ আছে।

এখন কী কর্তব্য, নিরঞ্জন ভাবল। তারপর নিবারণকে দিয়ে নির্মলার কাছে একটা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করে দিল।

এবং নিজেও রাত্রির ট্রেনে রওনা হয়ে গেল।

আগের দিন দুপুরেই বৃদ্ধ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভোরে যখন নিরঞ্জন ওদের ওখানে পৌছল সারা বাড়িতে ক্লান্ত শোকের ছায়া। সুশীতলবাবুর আন্তরিক অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হল নিরঞ্জন। লীলার ঘরোয়া স্বভাবকে ভালো লাগল।

লীলা বললে, 'মেজদির সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। দিদি আগের দিন ভূপাল থেকে এসেছেন।'

মৃদুলা হাত তুলে নমস্কার জানাল।

নিরঞ্জনও প্রতি-নমস্কার করল।

এই তিনবোনের মধ্যে চেহারায় স্বভাবে মৃদুলার ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হল। সমস্ত শরীরে কেমন এক জাতীয় ক্লান্ত সৌন্দর্য। বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধিরও একটা স্থিরদীপ্তি তাকে বেষ্টন করে রয়েছে

এই ধরনের দার্শনিকতায় নিরঞ্জন ঈষৎ লজ্জা পেল।

তিনটে দিন এই বাড়ির শান্ত আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিল নিরঞ্জন। পবিত্র ধূপের সৌরভের মতো শুভ্র বিশুদ্ধ শান্তিতে এই বাড়ি পরিব্যাপ্ত। স্মৃতির সৌরভ। বৃদ্ধ পিতার স্মৃতিকে যত্নে পাহারা দিচ্ছে ওরা। জীবনের শেষ দিনগুলি নির্জন মানুষের মতো কাটিয়ে বৃদ্ধ বিদায় নিলেন। নিরঞ্জনের মনে হল বহুকাল নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করবার পর এতদিনে সে আত্মীয় পরিবেশে এসে পড়েছে। যেন কতদিনের পরিচয়। দেখা হওয়া মাত্র সহস্র স্নেহের শেকড়ে তাকে আকর্ষণ করে বসল।

কলকাতায় ফিরতে দেরি হয়ে গেল। একসঙ্গে খাওয়া, গল্প করা। বিকেলে ভাগীরথীর তীরে ঘুরে বেড়ানো। কোনদিন চারজনই। লীলার সংসারে ব্যস্ততা থাকলে মৃদুলার সঙ্গে একা। বটগাছের তলায় পাশাপাশি বসে থাকা। নদীর বুকে সন্ধ্যার ম্লানিমা। ফেরী নৌকোর পারাপার। কথার চেয়ে চুপ করে বসে থাকাতেই ওরা আনন্দ পেত।

সেদিন ভাগীরথী পেরিয়ে পায়েহাঁটা পথে খোশবাগে সিরাজ-আলিবর্দির কবর দেখে ফিরল দুজনে।

নিরঞ্জন হঠাৎ বললে, 'মিরজাফরের পরিবারের সমাধির ঐশ্বর্যের কাছে কী-বিশ্রী অনাদৃত! আচ্ছা ওপারেই সব, নদীর এপারে, এমন নির্জন জায়গায় কেন এই কবরটা?'

মৃদুলা বললে, 'মনে হয় ভাগীরথী একদিন খোশবাগের কাছেই ছিল। পরে গতি বদল করে দূরে সরে গেছে। আমি প্রথমবার যখন এখানে এসেছিলাম হাজারদুয়ারী-ইমামবাড়া-কাটরা মসজিদ দেখে সিরাজের স্মৃতিকে খুঁজছিলাম। সুশীতলভাই আমার ভুল ভাঙিয়ে দিল। সিরাজী আমলের সমস্ত স্মৃতি নাকি ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।'

নিরঞ্জন বললে, 'আলিবর্দির আদরের নাতি সিরাজের সম্পর্কে আমাদের মনে একটা রোমান্টিক বেদনা আছে, তাই না?'

মৃদুলা হেসে বললে, 'আজকের ঐতিহাসিকরা কিন্তু সিরাজের অনেক দোষ খুঁজে পান—'

নিরঞ্জন বললে, 'হতে পারে। হয়তো সেটা বাস্তব বিচারের ব্যাপার। কিন্তু যে-সিরাজ সম্পর্কে আমাদের রোমান্টিক বেদনা জড়িয়ে রয়েছে সেটা আমাদের কল্পনা, আমরা নিজেরা বানিয়েছি।'

মৃদুলা মৃদু নিশ্বাস ফেলে বললে, 'বড়দি এলেন না!'

নিরঞ্জন বললে, 'বোধহয় টেলিগ্রাম পায়নি।'

'না নিরঞ্জনভাই, বড়দি পেলেও আসত না।'

'কেন?'

'বোধহয় বাবা গরিব ছিলেন বলে।' মৃদুলা আস্তে আস্তে বললে, 'বাবার আকর্ষণই এতদিন আমাদের পরস্পরকে মিলিয়ে রেখেছিল। বাবা নেই, এবার আমরা ভেসে যাব, হারিয়ে যাব।'

নিরঞ্জন বললে, 'এখন কী ভূপালে ফিরবে?'

'হ্যাঁ। বেশিদিন চাকরি থেকে বাইরে থাকার যো নেই। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের চাকরি তো।'

'চাকরি ভালো লাগে?'

'মন্দ কী। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা হয়। এত গরিব দেশের মানুষ। আর অশিক্ষিত। মনে হয় এদের অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে আমাদের একদিনও শান্তিতে থাকা উচিত নয়।'

'কিন্তু, নিঃসঙ্গতা? একা-একা—'

'জানো নিরঞ্জনভাই, প্রথম-প্রথম কষ্ট হত। তারপর একটা বয়েস আছে যখন একা থাকাই অভ্যেস হয়ে যায়।'

'কী এমন বয়েস' নিরঞ্জন হাসে।

'ত্রিশ পেরিয়েছি। ত্রিশের পর আর এদেশের মেয়েদের…'

'কিন্তু তোমার বড়দি? এই বয়েসেও বিয়ে করেছে—'

'কী জানি।' মৃদুলা নিশ্বাস ফেলল: 'হয়তো সম্ভব। তুমিই বলতে পারো কেমন কাটছে তোমাদের সংসার।'

'নিজের চোখে দেখে এলে পারো।'

'ও বাবা, দিদি সহ্য করবে না।'

'দিদিকে তুমি খুব ভয় করো।'

'করব না? দিদি যে।' মৃদুলা হাসল। 'আচ্ছা নিরঞ্জনভাই সত্যিই কী তুমি সুখী হয়েছ?'

নিরঞ্জন হাসল। 'কেন? অসুখটা কোথায় দেখলে?'

মৃদুলা লজ্জা পেয়ে বললে, 'না। অম্নি বলছি।'

'আচ্ছা মৃদুলা—'

'উঁ?'

'তোমার বিয়ের কোনোদিন চেষ্টা হয়নি?'

'হয়েছে। তখন পড়াশোনা করছিলাম। পড়াশোনা শেষ করে কিছুদিন রিসার্চ করলাম। তারপর এই চাকরি। মা নেই, বাবা অসুখে পড়লেন।'

নিরঞ্জন বললে, 'আমি একটা ভালো ছেলে দেখি তাহলে…'

মৃদুলা হাসল। 'সে-পেশাও আছে নাকি তোমার?'

'জানো না পুরুষমানুষের শিভ্যালরি। মিষ্টি মেয়েদের দেখলে…'

'এতই যদি যোগ্যতা নিজের বেলায় এমন হল কেন?'

'মানে?

'নিরঞ্জনভাই, আমি বড়দিকে চিনি। বড়দির বিয়ের সময় আসিনি। খবর পেয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম বড়দির বিয়ের কথা।'

'কী ভাবছিলে?'

'ভাবছিলাম না, অবাক হয়েছিলাম।' মৃদুলা একটু থেমে প্রসঙ্গ পাল্টাল: 'দিদির আমার ওপর খুব রাগ। কারণ সমস্ত রকম লড়ায়ে আমি বাবার পক্ষে ছিলাম। বড়দির পালিত-পিতার খবরদারি আমরা কেউ সহ্য করিনি। আমি একথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে বড়দি বাবার গরীবিয়ানাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। পালিতমশায়ের বিত্তই তাকে টেনেছিল…এসব কথা তোমাকে বলা আমার অন্যায় হচ্ছে।'

নিরঞ্জন বললে, 'না-বললেও অন্যায় অন্যায়ই থাকত মৃদুলা। যদি সেদিন আমার কথা এত মনে হয়েছিল কেন সাহস করে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সময় মতো সাহায্য করতে পারোনি।'

'আমি জানতাম না। জানতাম না আমার শক্তি কতখানি। কিংবা হয়তো ভেবেছিলাম তুমিও হয়তো দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে ভাগ্যবদল করতে

চেয়েছিলে। এখন তোমাকে কাছে পেয়ে মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে দেখা নাহলেই ভালো হত।'

এই কয়েকদিনে ওকে দেখে নিরঞ্জনের মনে হল ওর একটা গভীর আবেগ আছে, যা পদ্মার প্রবল ঘুর্ণির মতো আকর্ষণ করে। এবং সর্বদা গানের সুরের মতো গুন গুন করে চেতনায়। ওর ব্যবহারে উত্তাপ আছে, আলো আছে।

মৃদুলা আর-একদিন বললে, 'এটা কী হল? বড়দি রইল তার প্রতিষ্ঠান নিয়ে আর তুমি রইলে কলকাতায় তোমার কাজ নিয়ে। তবে বিয়ে করা কেন?'

নিরঞ্জন রসিকতা করে বললে, 'হয়তো তোমার বড়দির আইবুড়ো নাম ঘুচল।'

'না না ঠাট্টা নয় নিরঞ্জনভাই। দিদি হয়তো তোমাকে তাঁবেদার করে রাখবে ভেবেছিল। আমি খুশি হয়েছি যে তুমি তা হওনি। তাহলে মানুষ হিসেবে তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না।' একটু দম নিয়ে মৃদুলা বললে, 'আমি জীবনে বেশি সুখ পাইনি তবে এইটে বুঝি আমার সর্বস্ব দিয়ে যদি কাউকে সুখী করতে পারতাম তাহলে নিজেকে সার্থক মনে করতাম। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, আমার কাজের প্রয়োজনে নানান ধরনের মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিশতে হয়েছে। মেয়েরা যতই স্বাধীন হোক শিক্ষিত হোক আর বাইরেই ঘুরুক, শতকরা পঁচানব্বইটি মেয়ে ঘর চায় নিরাপত্তা চায় প্রেম চায়। সম্ভবত মেয়েদের প্রকৃতির গঠনই তাই।'

নিরঞ্জন বললে, 'নিয়মের ব্যতিক্রম একটা নিয়ম।'

মৃদুলা বললে, 'এটা তর্কের কথা নিরঞ্জনভাই। আমি জানি একলা থাকার কী অর্থ! যখন বয়েস বাড়ে, শরীরের উপযোগিতা কমে আসে, যখন শূন্যতা ঘিরে ধরে...'

নিরঞ্জন অন্ধকারে ওর মুখে যন্ত্রণার কিছু রেখা ফুটে উঠতে দেখল। ওর আঙুলগুলো বিক্ষুব্ধ হচ্ছে, গলার স্বর কাঁপছে।

'মৃদুল!'

মৃদুলা হাসল। 'দেখছ কি বিশ্রী বকুনিতে পেয়েছে। চলো ওঠা যাক।'

নিরঞ্জন বললে, 'একটু বসি। তোমার কথা তো শেষ করলে না।'

'না। এবার শেষ হয়েছে। চোখের সামনে দেখছি বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর চেহারা, রঙ পাল্টাচ্ছে। যত বয়েস হচ্ছে আমরা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছি। যদি

কারুর জন্যে বাঁচতে না শিখলাম তাহলে জীবনের অর্থ কী। ক্রমশ একটা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, বিচ্ছিন্নতার নির্জনতার। আমরা স্বেচ্ছানির্বাসনে বন্দী, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি, অথচ আমাদের সমগ্র হতে হবে, সম্পূর্ণ হতে হবে, কেউ আসুক আমাদের গ্রহণ করুক, কেউ আসুক যাকে দান করে ধন্য হই।'

এক-আকাশ অন্ধকারের নিচ দিয়ে ওরা হেঁটে চলেছে। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ দানবীয় বিস্ময় নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। নিরঞ্জন দেখল অন্ধকারকে চূর্ণ করে মৃদুলার মুখের ভারি ক্লান্ত প্রোফাইল, তার ঋজু শরীর ঈষৎ কুঁজো করে সে হাঁটছে। নিরঞ্জনের মনে হল অন্ধকার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আর, একটা শীতল নিঃশব্দতা যেন তাদের পায়ে অনুসরণ করে চলেছে।

বাড়িতে পা দিতেই লীলা বললে, 'এত রাত্রে বাইরে থাকতে হয়। সাপের ভয় নেই তোমাদের?'

'সাপ।' নিরঞ্জন বললে।

'হ্যাঁ মশায়। এখনকার সাপ মানুষের ভাষা বোঝে না।'

'বাবা, তুই যে ঠানদিদি হলি, ছোটো।' মৃদুলা হাসল।

পাশের ঘর থেকে সেতারের সুর। সুশীতল তারে কী একটা বিষণ্ণ সুর প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।

এখানে না-এলে নিরঞ্জন কোনদিন বুঝত না মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্বেরও একটা মূল্য আছে। এমন করে তারা তাকে বেষ্টন করে রাখবে, ধারণা করেনি। আরও দশজনের মতো তারও মতামত আছে, ভাবনা-চিন্তা আছে এবং সেগুলি সানন্দ স্বীকৃতি পাবে, বোঝেনি। জীবনের যে এমন সহজ রূপ আছে, কে জানত। এই পরিবারেরই মানুষ হয়ে নির্মলা কী করে আলাদা হতে পারল, এটা একটা বিস্ময়।

নিরঞ্জন নিশ্বাস ফেলল।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর জেগে উঠল নিরঞ্জন। তেষ্টা পেয়েছে। টেবিলে গ্লাসে জল রাখতে ভুলে গেছে লীলা। সমস্ত শরীর গ্রীষ্মে ছেয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা কেমন করছে, চোখ জ্বালা। নিরঞ্জন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। অন্ধকার সরে গিয়ে পাতলা নেটের মশারির মতো আকাশটা এখন কাঁপছে। কোথা থেকে একটা সুর ভেসে আসছে। জলের শব্দ। নিরঞ্জন নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনল। কখন সে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। পায়ের তলায় ঘাস, আকাশটা

গম্বুজের মতো, গাছ, গাছের পাতা তামাটে হয়ে খসে খসে পড়ছে। জলের শব্দ আজানের মতো স্পষ্ট হয়ে-হয়ে দিগন্তকে ব্যাপ্ত করল।

৭

নির্মলা এক ভোরে স্যুটকেস নিয়ে হাজির হল। মনে হল এখানে অনেকদিন কাটাবার আয়োজন করে এসেছে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

নিরঞ্জনের কোনো কৌতূহল ছিল না। সে-ই বললে, 'একটা জরুরি কাজের জন্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে হবে।'

নিরঞ্জনের হাতে সিগারেট ছিল। সে দেখল কী দেখল না। নির্মলা স্নান করল, খেলো, বেরিয়ে গেল এক সময়ে হাতে ফাইল নিয়ে।

নিরঞ্জনের কর্মসূচীর কোনো ব্যতিক্রম হল না। সেও যথাসময়ে আপিসে বেরিয়ে পড়ল। এবং যথারীতি অন্যদিনের মতো বাড়িতে না ফিরে নবেন্দুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত করে ফিরল।

নির্মলা অনেকক্ষণ এসেছে। টেবিল ল্যাম্পের সামনে ঝুঁকে পড়ে ওকে পাঠমগ্ন দেখা গেল। নিরঞ্জন জামাকাপড় ছাড়ল। তারপর চলে এল বাইরের ঘরে। একটা গল্প কয়েকদিন থেকে মনের ভেতর কলরব তুলেছে। সেই গল্পটাই লিখবে বলে সে কাগজ নিয়ে বসল। লিখতে বসে লেখা হল না। মনের ভেতরটা কেমন এলোমেলো লাগছে। নিরঞ্জনের মনে হল ফিরে এসে লীলাকে চিঠি দেয়া হয়নি। সে-চিঠিটা এখনই লিখে ফেলা দরকার। তারপর আরো মনে হল দুএকদিন ধরে সে কিসের একটা প্রতীক্ষা করছে। মানুষ যে কখনো কোনো কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করে, এ বোধ তার আগে এমনভাবে অনুভূত হয়নি। ক্লান্ত এবং সুন্দর একটি প্রতীক্ষা। নিরঞ্জন খুশি হল এই ভেবে যে কারুর জন্যে তার চিন্তা আছে। সে কাউকে চিন্তার আকাশে টেনে আনতে পারে। এই যে কারুর জন্যে ভাববার এই অধিকার, তার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এর আগে সে এমন করে ভাবেনি, না নিজের জন্যেও নয়। এ যেন তার নিজস্ব গোপন সঞ্চিত সম্পদ—যাকে সে পাহারা দেবে, সেবা-শুশ্রূষায়-প্রীতিতে লালন করবে। মাঝে মাঝে যখন খোলা আকাশের তলায় পায়চারী করে তখন মনে হয় এই আকাশের তলায় আরো একজন আছে, যে বিনিদ্র রাত্রিতে হয়তো তাকেই স্মরণ করছে।

নির্মলার অখণ্ড অস্তিত্ব তার চেতনাকে আর ভারি করে রাখতে পারে না। নির্মলা আছে এই চেতনাই ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। যেন নির্মলা রাত্রির ট্রেনে একই কমপার্টমেণ্টের যাত্রী মাত্র। এমন কি ওর নিজের বাবার মৃত্যুর কথাও ওর সঙ্গে আলোচনা করেনি। তার টেলিগ্রাম পেয়েছিল কিনা, পেয়ে এল না কেন--এই জাতীয় একটা জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কখনো সেটা ওঠেনি। তবে এটা বুঝেছে নিরঞ্জন, তার লালবাগে যাওয়াটা সে জানে। হয়তো আরো জানে লীলা বা মৃদুলার সঙ্গে তার নতুন পরিচয়ের কথা। নির্মলার এই উদাসীনতা সাংসারিক শান্তি রক্ষার পক্ষে ভালোই হয়েছে। কারণ কথা উঠলে কথা বাড়ত। আর, নিরঞ্জনের মনে অনেক বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে; সেটা সে উদ্গীরণ না-করে পারত না।

সন্ধ্যেবেলা আপিস থেকে ফিরে টেবিলের ওপর তার প্রতীক্ষিত নীল খামটি দেখতে পেল নিরঞ্জন। অকারণে বুকের ভেতরটা ঈষৎ কেঁপে উঠল। জামা কাপড় ছেড়ে সে খামটা তুলে নিল। এবং অকস্মাৎ তার মুখে যেন রক্ত জমা হল।

'নিবারণ!'

চিৎকারে ছুটে এল নিবারণ।

'এ-চিঠি ছিঁড়েছে কে?'

'আমি তো জানিনে দাদাবাবু।'

ঘরের ভেতর থেকে নির্মলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'কেন মিছিমিছি ওকে ধমকাচ্ছ? মৃদুলার হাতের লেখা দেখে আমিই ওটা ছিঁড়েছি।'

'তুমি, তুমি ছিঁড়েছ চিঠি!'

'হ্যাঁ। কী হয়েছে? মৃদুলা আমারই বোন।'

'কিন্তু চিঠিটা আমার। আমাকেই সে লিখেছে।'

'হয়তো চিঠি খোলা আমার অন্যায় হয়েছে। আমি কিছু ভেবে করিনি।'

নিরঞ্জন বললে, 'আমি এসব পছন্দ করিনে। তোমার শিক্ষাদীক্ষা ও রুচির পরে আমার একটা বিশ্বাস ছিল।'

নির্মলা নাক উঁচু করে বললে, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এক সঙ্গে বাস করতে হলে কোনটা অধিকার কোনটা অনধিকার তার একটা নীতি থাকা দরকার। চুরি করে আমার চিঠি পড়া কোনো মতেই শিষ্টাচারের দিক থেকে তোমার কাছে আশা করিনে।'

নির্মলা বললে, 'রুচির কথাই যদি তোলো আমার বোনের সঙ্গে তোমার এই পত্রালাপ নিশ্চয়ই আমি সমর্থন করিনে।'

নিরঞ্জন বললে, 'মানে? কার সঙ্গে পত্রালাপ করব সেটা কী তোমার অনুমতি নিয়ে?'

'অন্তত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা—'

'স্বামী-স্ত্রী!'

'হ্যাঁ। তোমার সম্মানবোধের সঙ্গে আমার সম্মান জড়িয়ে আছে।'

'ও।' নিরঞ্জন বাঁকা হাসল। 'তবে যে বলেছিলে কিছু না-ভেবেই চিঠি খুলেছিলে? আসলে তুমি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছ।'

'আমি এত কথা ভাবিনি, ভাবতে চাইও নি। সামান্য একটা চিঠি নিয়ে তুমি যেমন বাড়াবাড়ি করছ—' নির্মলা একটু থেমে শেষ করল: 'বেশ। আমি নাহয় মেজকে বারণ করে দেবো সে যেন কখনো আর তোমাকে চিঠি না দেয়।'

'তোমার বারণ সে শুনবে?'

'শুনতে হবে। দিদি যখন।'

'আর আমি, আমাকে কী করে বারণ করবে?'

'তুমি নিজেই যখন বুঝতে পারবে তোমার আরো অনেক কাজ আছে, অনেক দায়িত্ব, শস্তা ডাইভারশন তোমার জন্যে নয়। একজন বুদ্ধিমান রুচিমান পুরুষ আলাপের সুযোগে কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ খুঁজবে এর মতো বাজে ব্যাপার আর কিছুই হতে পারেনা।'

নিরঞ্জন রাগতে পারত কিন্তু পারল না। তার মনে হল ইতিমধ্যেই বিষয়টা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে। আরো এগোতে হলে কোনো আড়াল থাকবে না। এবং নিরঞ্জন কিছুতেই তার নির্জন একটা অনুভূতিকে এইভাবে উন্মুক্ত করতে দেবেনা। সে ফিরে এল বাইরের ঘরে। আলো জ্বাললো না, অনেকক্ষণ বসে রইল অন্ধকারের নিভৃতে। রাস্তার ওপর থেকে চেরাইয়ের কলের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ ভেসে আসছে, ক্লান্ত ভেঙে পড়া শ্বাপদের গোঙানির মতো। সমস্ত জীবনটা অতীত-বর্তমানকে পিঠে করে জলচর কোনো প্রাণীর মতো ভেসে উঠল। ব্যবহারে-ব্যবহারে জীর্ণ দাগধরা মসীমাখা পুরাতন জীবনটা। নিরঞ্জন অকস্মাৎ ভয় পেল, একটা নিরবয়ব

আতংক জড়িয়ে ধরল ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আশ্রয় চাই, তার আবেগ, তার দুঃখ-শোক, ক্লান্তি, মৃত্যুর মতো রিক্ততা আচ্ছন্ন করল তাকে।

কতক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃসাড় পড়ে রইল, খেয়াল নেই। নিবারণ ঘরের আলো জ্বালাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'দাদাবাবু—'

'নিবারণ, তোর মা আছে?'

'দাদাবাবু—'

নিরঞ্জন হাসল। 'না, কিছু নয়। কিছু বলবি?'

'খাবার দেবো?'

'বউদিদি খেয়েছেন?'

'পরে খাবেন বললেন।'

'আচ্ছা তুই খাবার দে। যাচ্ছি।'

রাত্রি ঘন হয়ে নেমেছে। বাইরে পাতলা জ্যোৎস্না। হালকা মেঘগুলি ভেসে চলেছে। বাইরের শব্দসাড়া এখনো মুছে যায়নি। এই রাস্তায় রাত্রির কতকগুলি পরিচিত শব্দ আছে। কোথা থেকে হাস্‌নাহানার গন্ধ ভেসে আসছে। রাত্রির পৃথিবী শব্দ-গন্ধে অন্তঃসত্ত্বা। নিরঞ্জনের মনে হল সেও এই নিসর্গসত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। বোধহীন ইন্দ্রিয়াতীত তরঙ্গে প্রবাহিত। নিরঞ্জন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করল: মানুষ অনেক কিছু হতে পারে, আকাশ-পাহাড-সমুদ্র।

নিরঞ্জন লিখল মৃদুলাকে। রাত্রির স্নিগ্ধতায় সৌরভে কোমল মোমের মতো মৃদু উত্তাপে দীপ্র তার হৃদয়লোক। তার মনে হল সে একটি ব্যক্তি নয়, একটি উত্তাপ, আবেগ, বস্তুগত জীবনের শেকড় ভেদ করে শাখায়-পল্লবে উৎকীর্ণ মুকুলের মতো। এবং মৃদুলাও এখন তার চোখে কোনো পার্থিব আকাংক্ষা নয়। শব্দ-গন্ধ-রঙ-উত্তাপ-স্পন্দন এবং—

নবেন্দু বললে, 'তোমাকে এমন বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন?'

রাতজাগা শুকনো চোখমুখ নিরঞ্জন উদাস হাসল।

'তোমার কী কোনো অসুখ করেছে? নিরঞ্জন, তোমার শরীরের ওপর যত্ন নাও।'

নিরঞ্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'আচ্ছা নবেন্দু মৃত্যুর পরে কী কিছু থাকে?'

নবেন্দু চমকে উঠল। 'ভাই জীবনে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছি, মৃত্যুর চিন্তা করার সময় নেই।'

'তবু তুমি মরবে। কারণ মৃত্যুই একমাত্র সত্য। যার নির্দিষ্ট চরিত্র আছে।' নিরঞ্জন এলোমেলো বকে চলল : 'তোমার কী মনে হয় না এই ইচ্ছা আবেগ তৃষ্ণা সব কিছু বেঁচে থাকে। শরীর শুধু সীমা, অনন্তকে একটা গণ্ডীতে বেঁধে-রাখা। এই ইচ্ছা আবেগ ছিল ওই আকাশে পাহাড়ে উদ্ভিদে, তখনো শরীরের সীমা তাকে বেঁধে ফেলেনি। এবং যেদিন আমরা থাকব না সেদিনও থাকবে—'

'নিরঞ্জন, তোমার কী হয়েছে ?'

'আমি ভয়ানক ক্লান্ত, এই জীবনটা...'

নবেন্দু বিস্মিত।

'আমি এ জীবনকে বুঝতে পারিনে নবেন্দু। আই ক্যাননট আণ্ডারস্টাণ্ড। কেন আমি বাঁচব। হোয়াট ইজ লাইফ ফর।'

'নিরঞ্জন, হতাশ হয়ো না। হয়তো এই যুগ আমাদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে, হয়তো একেক সময় সহ্যের অতীত হয়, তবু...একটা জটিল যুগে বাস করে প্রাণপণে আমরা টিকে থাকবার প্রচণ্ড লড়াই করে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী সুষমা আমার মেয়ে শানু ওদের জন্যে, ওদের কথা ভেবে...'

'কিন্তু আমি, আমি কাদের জন্যে বাঁচব, এই ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে কি বিশ্বাস নিয়ে আমি আঁকড়ে ধরব ?' নিরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগল। ওকে উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাল।

'তোমার বন্ধুটি কখন চলে গেলেন ?' সুষমা চা নিয়ে এসে অবাক।

নবেন্দু বললে, 'সত্যি ও ভাবিয়ে তুলল।'

'ওঁর ভাবনা ওঁকেই ভাবতে দাও। এরকম নরম মন নিয়ে সংসারে বাস করা যায় না।'

'তুমি ওর ওপর অবিচার করছ।'

'আমার এতো সময় নেই। এখুনি গিয়ে মাছ চাপাতে হবে। পুরুষ মানুষ পুরুষমানুষের মতো না হলে কোনো মেয়েই সহ্য করবে না। আর ওর স্ত্রীকেও বলিহারি যাই। কেমন মেয়েমানুষ বাবা বুঝিনে। একটু স্নেহ ভালোবাসার জন্যে মানুষটা ছটফট করছে আর তিনি সমাজসেবা করছেন।'

'সুষমা—'

'মেয়েমানুষ পুরুষের চোখ দেখে বুঝতে পারে। বড়লোকের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।' সুষমা ত্বরিতপায়ে অন্তর্হিত হল।

নবেন্দু নিরঞ্জনের জন্যে না ভেবে পারে না। ওর জীবনধারণের ভঙ্গি হয়তো দশজনের মতো নয়। ওকে কখনো স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। তবু ও বাঁচতে চায় সেটা মিথ্যা নয়।

বাড়িতে পা দিয়েই পালিত মশায়কে দেখবে নিরঞ্জন ভাবেনি। চেয়ারে উঁচু হয়ে বসে তিনি নির্মলার সঙ্গে গল্প করছিলেন। পায়ের কেড্‌স জুতোটা আর খোলবার দরকার বোধ করেন নি। বোধহয় দুদিন আগে চুল কেটেছেন, ছোটো চুলগুলো আরো কর্কশ দেখাচ্ছে।

'এই যে তোমার কথাই হচ্ছিল—' আশুতোষ বললেন, 'নির্মলামা বলছিল তোমার নাকি শরীর ভালো যাচ্ছে না।'

নিরঞ্জন নত হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

'আরে হয়েছে হয়েছে। তা শরীরের দোষ কী। কী সুখে তোমরা শহরে বাস করো। এখানকার হাওয়া পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। গো ব্যাক টু ভিলেজ, বুঝলে বাবা? আপিসে খাটনি কী খুব বেশি?'

নিরঞ্জন শুকনো হাসল।

'সাংবাদিকতা অত্যন্ত সাধু পেশা। সাধারণ মানুষ আজকাল সংবাদপত্র পড়ে। তা এক কাজ করো না বিদেশ থেকে জার্নালিজম পড়ে এস। নির্মলামারও সেই মত। না-না, টাকার কথা ভেবে কী হবে? তুমি যাবতীয় ব্যবস্থা করো না, টাকা না হয় আমিই দেবো।'

নিরঞ্জন বললে, 'এখনো ভাবিনি।'

আশুতোষ বললে, 'ভাবো ভাবো বুঝলে? আমি না হয় ওপরতলায় বলে ক'য়ে…'

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করল: 'আপনার শরীর ভালো আছে তো?'

'শালগ্রামের শোয়াবসা, বুঝলে না বাবা?' আশুতোষ হাসলেন: 'এই বাড়িটা বেশ ভালোই পেয়েছ। দক্ষিণ খোলা। কত ভাড়া? আশী? কলকাতার বাড়িঅলারা একেকজন জমিদার। নাও, জামা কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করো। সারাদিনের ধকল তো কম নয়।'

নিরঞ্জন ভেতরের ঘরে চলে গেল। ওঘর থেকে ওদের পরামর্শ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ পালিত মশায়কে দেখে অবাক হয়েছিল নিরঞ্জন। তারপর

তার শরীর খারাপের বার্তা নির্মলার মারফত তাকে শুনতে হবে, বুঝতে পারেনি। তার শরীর খারাপ হয়েছে, সে নিজেই তা জানে না। এই কথা বলে কী নির্মলা তাদের দাম্পত্যজীবনের একটা ঘরোয়া আদল পালিতমশায়কে বোঝাতে চাইল। যেন সত্যিই নির্মলা তার স্বামীর জন্যে কত ভাবিত। এবং তারপর বিদেশে যাবার প্রস্তাব। এটাও নিশ্চয়ই নির্মলার সুপারিশ। হঠাৎ তার কেরিয়ারের জন্যে নির্মলার এমন আগ্রহ! নিরঞ্জন হাসল। ওরা পিতাপুত্রী কী তাকে দাবার চাল ভেবেছে। মেরুদণ্ডহীন একটা নির্বোধ। নাকি তাকে এদেশ থেকে সরিয়ে দেবার মতলব। মৃদুলার কাছ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে।

নিরঞ্জন হাই তুলল। ক্লান্তি, ক্লান্তি।

নির্মলা কী পালিত মশায়কে তার সম্পর্কে আরও কিছু বলেছে। নিরঞ্জনের মনে হল এমন কতকগুলি সাংসারিক বিষয় আছে যা পছন্দ না-করলেও স্বীকার করতে হয়। এবং সেইখানেই নির্মলা জিতে যাচ্ছে। এর নাম সামাজিকতা, ইচ্ছে করলেও একে সহজে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, নির্মলা কেন করছে এসব? কী লাভ। সে জানে এগুলি মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা। তবে কী সে আশা করেছে নিরঞ্জন এই মিথ্যা আচরণকেই সত্য বলে মেনে নেবে! আরো দশটা ত্রিকালজ্ঞ সাংসারিক জীবের মতো। নাকি এটা তার একজাতীয় পীড়ন।

নিবারণ খাবার নিয়ে এল।

নিবারণ তার দিকে অমন করে তাকায় কেন। নিবারণ কী বুঝতে পারে তার মনিবের অবস্থাটা। ওর বিজ্ঞতাকে সহ্য করতে পারে না নিরঞ্জন। নিরঞ্জন জল খেল।

'আমি একটু বেরোচ্ছি বুঝলি? তোরা খাওয়াদাওয়া করে নিস। বুড়ো-বাবুর যেন কোনো অসুবিধে না হয়—'

নিরঞ্জন নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু আগে এক পশলা বর্ষণ হয়ে গেছে। রাস্তা ভিজে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

এস্‌প্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল নিরঞ্জন। রাত্রির চৌরঙ্গি। শিল্‌কের মতো জনতার স্রোত পিছলে যাচ্ছে। রঙ-করা মুখ, বানানো হাসি। নিওনের আলোয় সবকিছু রূপসী।

'সাহাব—'

নিরঞ্জন চমকে উঠল।

মুখে বসন্তের দাগ। অপরিষ্কার দাড়ি গোঁফ। কালো কৃশ চেহারা।

'সাহেব। ফাস্‌কেলাস চীজ্‌। বিলকুল...'

'কোথায়?'

'আইয়ে সাহাব। পছন্দ্‌ করে নিন। ওই যে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে—'

নিরঞ্জন কয়েক পা এগিয়ে গেল। এনামেল-করা মুখ। ঘোর লাল রঙের পেটিকোটে শস্তা নাইলনের শাড়ি। শক্ত পুরুষালী শরীর।

'সাহাব—গুড লাকের জন্যে দুটো টাকা দিন—'

'আজ নয়। অন্য একদিন।'

'ঠিক হ্যায়। গুড লাকের জন্যে টাকা ছাড়ুন।'

'না।'

'ইয়ে ক্যা সাহাব?' লোকটা অনেকক্ষণ পিছু পিছু এসে নিরাশ হয়ে গালি দিল ওকে।

নিরঞ্জন রেস্তোরাঁয় ঢুকে কফি খেল।

অনেক রাত্রে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ঢুকল।

নিবারণ দরজা খুলে দিল।

'আমি রাত্রে কিছু খাব না।'

ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছেড়ে পাতলুন পরল নিরঞ্জন।

রোজকার মতো বাড়তি বিছানা বার করতে গিয়ে দেখল বিছানা নেই।

মুখ ফিরিয়ে নির্মলা বললে, 'তোমার বিছানা বাবাকে দেয়া হয়েছে।'

নিরঞ্জন কিছু বলল না।

নির্মলা বললে, 'তক্তপোশেই শুয়ে পড়ো। একটা রাত্তির তো।'

'আর তুমি?'

'দেখি কী করা যায়।'

নিরঞ্জন বিছানায় শুয়ে দেখল নির্মলা টেবিল ল্যাম্পের নিচে বই পড়ছে। নিরঞ্জন উশখুশ করল। ঘুম আসছে। একটা আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন ভাব।

'আলোতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?' নির্মলা জানতে চাইল।

নিরঞ্জন উত্তর করল না।

'কী ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?'

নিরঞ্জন পাশ ফিরল। ক্লান্তি ক্লান্তি। ঘুম ঘুম চেতনার পর বাত্তির আলোকে উদ্‌ভাসিত নির্মলার আধখানা মুখ ভাসছে। তার মেটে চোখ, মোটা ভ্রূদেশ, এবং পুরু ঠোঁট। ঠোঁটটা এখান থেকে দৃঢ় ও বংকিম দেখাচ্ছে। ওর কপালে, মুখে, গ্রীবায় ঘাম। ঘাম, না ক্রিম মেখেছে। প্রতিমার মতো চকচকে দেখাচ্ছে।

নির্মলা আলো নেবার পর অথবা আগেই নিরঞ্জন কখন ঘুমিয়ে পড়ল খেয়াল নেই।

৮

তরল রাত্রি অন্ধকারে গলে গলে পড়েছে। ঘরের ভেতরে দুঃসহ গ্রীষ্ম। ঘাম। সর্বাংগে ঘামের বুদ্‌বুদ। নিরঞ্জন ঘুমের ঘোরেই ছটফট করছিল। রাত্রে এম্নিতেই তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। আজ হঠাৎ মধ্যরাত্রে মস্তিষ্ক গরম হয়ে সে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা বোধ করল। নিশিপাওয়ার মতো গোঙালো, বিড়বিড় করল। তারপর সে বিচিত্রতর স্বপ্ন দেখতে লাগল। লোনা সমুদ্র। একটা বৃহৎ তিমি মাছের উদর। আশ্চর্য শীতল, যেন দীঘির ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। শীতল আর আঠালো। বিশাল বাহুদ্বয়ে সে তিমিমাছের শরীরটা জাপটে ধরেছে। তার প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে আর সারা গায়ে ঘামের প্রবাহ, সে গলছে আপাদমস্তক। তিমিমাছটা তার শত্রু, তার নিয়তি, আর নিয়ত তার সঙ্গে সংগ্রামের দ্যোতনা জাগিয়ে রাখতে হচ্ছে। তারপর তার চোখের সামনে অন্ধকারটা উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়ল। এরপর স্বপ্নটা আরো অদ্ভুত আকৃতিতে দুলে উঠল। সে দেখল একটা নৌকো উলটে পড়েছে, তার বিশাল খোল, আর সেই গভীর গর্তে সে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার, জমাট, পুরু, নখ দিয়ে সে অন্ধকারকে ছিঁড়তে লাগল, তার সমস্ত শরীর ওই নৌকোর তলায় হারিয়ে গেল। এবং হারিয়ে যাবার আগে চিৎকার করতে গিয়ে নিরঞ্জন দেখল তার স্বর বেরুচ্ছে না, সে একটা বোবা জন্তুতে পরিণত হয়েছে, সে হাঁপাচ্ছে, কপাটের মতো বক্ষদেশ ফুলে ফুলে উঠছে, চোখ জ্বলছে, দেহের সমস্ত রোমকূপ। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। নিরঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেল। সে কিছু বুঝতে চাইছে। বোঝবার আগেই সে দেখল মস্ত

একটা ভার অন্ধকারে তার বুকের ওপর এঁটে বসেছে। নিরঞ্জন দেখল তার নিয়তি, তার মৃত্যুকে, দেখল হয় মরতে হবে না হয় মারতে। মৃত্যুর আগে তার সারা দেহ নৃত্য করে উঠল, সে টলছে, কাঁপছে পৃথিবী, তারপর নির্দিষ্ট একটি আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে সে তলিয়ে গেল।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই নিরঞ্জন ধূসর বিবর্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। সে অদ্ভুত স্বপ্নগুলো ব্যাখ্যা করতে চাইল।

ওধারে বাথরুম থেকে ধারাস্নানের সঙ্গে নির্মলার গানের কলি ভেসে আসছে।

নিরঞ্জন তস্করের মতো ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সারা দিন কেমন জ্বর জ্বর অনুভূতিতে কাটল নিরঞ্জনের। আপিসে কাজ করতে-করতে বারবার তার মন উদাস হচ্ছিল এবং ভোঁতা একটা যন্ত্রণা তাকে থেঁতলে দিচ্ছিল। রাত্রির বিশ্রী স্বপ্নটা তাকে প্রেতের মতো তাড়া করছে। স্বপ্ন কী সত্যি হয়। ভোরবেলায় ধারাস্নানের সঙ্গে নির্মলার গানের কলি। নিরঞ্জন কোনদিন ওর গান শোনেনি। ওর তানপুরা দেখেছে, তবলা। নির্মলা কেমন গান গায়! রাত্রির সেই উৎকট স্বপ্নের সঙ্গে ওর ভোরবেলার আজানের কী কোনো সম্পর্ক আছে। হঠাৎ-ই তার চোখের পরদায় চৌরঙ্গির সেই দেহোপজীবিনী মেয়েটার এনামেল-করা মুখ রঙিন পেটিকোট-উদ্ভাসিত নাইলন শাড়ি ভেসে উঠল। গুডলাক। রাত্রির স্বপ্ন, এনামেল-করা মুখ এবং গুড্‌লাক সমস্ত স্মৃতিগুলো একযোগে নিরঞ্জনের গলার ভেতরে একটা বিবমিষার ভাব আনল। ট্রামে চলতে কখনো মাংসের দোকানে চোখ পড়লে তার এম্নি একটা গা ঘিনঘিন-করা ভাব আসে। টাঙানো নগ্নমাংস চিত-করা পা ছড়ানো অশ্লীল একটা দৃশ্য। নরক নরক—চিৎকারটা বোবা আর্তিতে দম বন্ধ হয়ে মরল।

তাড়াতাড়ি আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ল নিরঞ্জন।

তারপর বাড়ি। নির্মলা এখনো ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ফেরেনি। নিরঞ্জন সুটকেস গুছিয়ে নিল। নিবারণকে বললে একটা ট্যাকসি ডাকতে। নিবারণ ট্যাকসি নিয়ে এল। মানিব্যাগ খুলে দশটাকার পাঁচটা নোট ওকে দিল।

'বউদিদিকে বলিস আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'কবে ফিরবেন?'

'হপ্তাখানেক পরে। বলবি: আপিসের কাজে—'

ট্যাকসিতে উঠে হাঁকল: 'হাওড়া স্টেশন।'

২

'আরে! তুমি!' মৃদুলার চোখে সকালের আকাশটা যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

নিরঞ্জন বললে, 'আসতে না বললেও জোর করে এসেছি। যে জোর করে আসতে জানে তাকে ফেরানো যায় না।'

'বাইরে দাঁড়িয়েই পাদ্রীর মতো ভাষণ দিতে শুরু করলে যে। ভেতরে এস।'

'না। আগে বলো তুমি খুশি হয়েছ কিনা?'

'বোকা! মেয়েরা খুশি হওয়ার কথা কখনো বলে না।'

নিরঞ্জন ভেতরে পা দিল।

ছোট্ট একতলা বাড়ি। পরিচ্ছন্ন। এবং শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরে প্রকৃতির কোলে। জানলার বাইরে উঁচু নিচু পাহাড়ী ভূমি। আকাশটা আশ্চর্য সুনীল।

'তারপর বলো কী করে এলে?' মৃদুলার চোখে আলো আমন্দের।

'কেন ট্রেনে উঠে টিকিট কেটে। গাড়ি ঠিক এখানে পৌঁছে দিল।'

'সত্যি আমি ভাবতে পারছিনে—' মৃদুলা ফিসফিস গলায় বললে: 'জানো কাল রাত্রে ঘুম আসছিল না, ভারি বিচ্ছিরি লাগছিল। আর ভাবছিলাম যদি তুমি আসতে।'

'আমাকে খুশি করবার জন্যে বলছ না তো?'

'না মশায়। অত সহজে মেয়েরা হারে না।' মৃদুলা চোখ নাচাল: 'আগে চান করবে না চা খাবে?'

'চা চাই। দেখো না আমি কত চাইতে পারি। এই কদিনে তোমাকে ফতুর করে দেবো।'

'দেখা যাক। তার আগেই না ক্লান্ত হয়ে যাও।'

নিরঞ্জন চা খেয়ে সিগারেট ধরাল।

'এই একা বাড়িতে কী করে থাকো?'

'কেন? নেপালী চাকরটা আছে।'

'তোমার ভয় করে না?'

'কাকে ? কেন ?'

'নিজেকে।'

'তাহলে একদিনও বাঁচতে পারতাম না নিরঞ্জনভাই। বলো, তোমার কলকাতার খবর। বড়দি কেমন আছে ?'

'ভালো, খুব ভালো।'

'বড়দির কাছ থেকে পালালে কী করে ? নিশ্চয় দিদিকে জানিয়ে আসোনি ?'

'না। অত সাহস হল না। উনি আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা রাখতে চান না।'

'বড়দি কী কলকাতায় স্থায়ী হল ?'

'আপাতত তাই দেখছি।'

'আচ্ছা, বড়দির কী হয়েছে বলো তো ? কোনোদিন চিঠি লেখে না, হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি লিখে বসল—'

নিরঞ্জন বললে, 'কী লিখেছে ?'

'সে মাথামুণ্ডু কিছুই মানে হয় না। সমাজজীবনে মেয়েদের ভূমিকা, পুরুষের জীবনে মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধধর্মী আলোচনা বিশেষ। আমি তো ভেবেই মরি। তাহলে কিছু হয়নি দিদির ?'

'আর-কিছু লেখেনি ?'

'হ্যাঁ ; আরও আছে। যেমন স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক। হিন্দুমতে বিবাহ একটা ধর্ম, চুক্তি নয়। এবং এই পবিত্র বন্ধন জন্মজন্মান্তর ধরে। বুঝলে নিরঞ্জনভাই, তোমার আর মুক্তি নেই।'

নিরঞ্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমাকে পরিহাস করছ মনে হচ্ছে ?'

'পরিহাস কেন করব ?'

'তবে আমার বন্ধনটাকে সত্য করে তুলে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাও ?'

মৃদুলা গম্ভীর হতে পারল না।

নিরঞ্জন বললে, 'জন্মজন্মান্তরের বন্ধনের কথা ভেবে আমার ইহকালকে নষ্ট করতে চাইনে। অন্তত সে ভুল আর আমি করব না।'

'কিন্তু নতুন করে কিছু করতে গেলে সেটাও যে ভুল হবে না কে বললে ?'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারো। কিন্তু আমি আর ভয় পাব না, কিছুতেই না।'

'তবু তুমি ভয় পাও নিরঞ্জনভাই।'

নিরঞ্জন চুপ করে রইল।

'দুর্বল মানুষ পৃথিবীতে বার বার মরে। তাদের ইচ্ছাগুলো কোনোদিন জোর করতে পারে না।'

'তবু বাঁচতে হয় মৃদুলা, যেমন করে আমি বাঁচছি।'

মৃদুলা ওর হাত ধরল। 'ওঠো স্নান করে নাও। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। তুমি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করবে, আর আমি চট করে একবার আপিস থেকে ঘুরে আসব। দেখো ক'দিনে কেমন তোমাকে মোটা করে তুলি।'

নিরঞ্জন হাসল। 'কেন আমি কী বলির জন্ত?'

বিকেল থাকতেই মৃদুলা হুড়মুড় করে এসে পড়ল।

'ঘুম হয়েছে তো?'

নিরঞ্জন চুপ করে রইল।

'কী মুখভার কেন? এই তো আমি তোমার কাছে, অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।'

নিরঞ্জন ওকে কাছে টানতে চাইল।

'এই এই দুষ্টু, কী হচ্ছে, আমার গার্জিয়ান নেপালী কিন্তু ছুটে আসবে—'

'আসুক।'

'আহা, ও তোমার আবেগের মুদ্রাগুলো বুঝবে না।'

মৃদুলা দূরে সরে গেল। 'সারা শরীরে গন্ধ। কেবল সিগারেট খাচ্ছ। খবরদার আমার কাছে আসবে না।'

নিরঞ্জন হাসল শুধু।

'চলো বেড়াতে যাবে পাহাড়ের ধারে? সুন্দর একটা জলাশয় আছে?'

'আজ ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।'

'কেবল কুঁড়েমি-করা, তাই না?'

পাহাড়ের গায়ে সূর্য অস্ত গেল।

ভেতরের বারান্দায় মোড়ায় বসে ওরা গল্প করছিল।

মৃদুলা বললে, 'সত্যি। বিশ্বাস করিনি কোনোদিন তোমাকে আমার কাছে এমন করে পাব। একটা দিন পেয়েই আমার আকাঙ্ক্ষাকে তুমি বাড়িয়ে দিচ্ছ।'

নিরঞ্জন বললে, 'আকাঙ্ক্ষা কার বেশি, যে অতদূর থেকে ছুটে এল, না তোমার?'

মৃদুলা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, 'আমি মেয়ে না! রাজকন্যারা স্বপ্ন দেখেনি সাতসমুদ্দুর তেরোনদী পেরিয়ে তাদের রাজপুত্রেরা ছুটে আসবে—সত্যি নিরঞ্জন, তুমি আমার লোভকে বাড়িয়ে দিচ্ছ। তোমাকে কাছে না পেলে বুঝতাম না আমি ভেতরে-ভেতরে কত দুর্বল হয়ে পড়েছি। একটু আগে কী মনে হচ্ছিল জানো?'

'কী?'

'মনে হচ্ছিল যখন এসেছ আমাকে ক্লান্ত করে চলে যেওনা।'

'মৃদুলা—'

'কেন? জানি মাঝখানে দাঁড়িয়ে দিদি। কিন্তু তবু তো ভুলতে পারিনে তুমি ওর কাছে কিছু পাওনি, কিছু না—। যদি সাধ্য থাকত তোমাকে ছিনিয়ে নিতাম, আমার সর্বস্ব দিয়েও তোমাকে সুখী করতে চাইতাম।'

'মৃদুলা, আমি আর পারছিনে। আমাকে কোথাও আশ্রয় পেতে হবে।'

'আমি সম্রাজ্ঞী নই, ঐশ্বর্য আমার কম, আমার যা আছে তাই দিয়ে তোমাকে আশ্রয় দেবো। আমাকে রিক্ত করে নিয়ে যাও, আমাকে গ্রহণ করো, আমি আর কোনো বাধা দেবো না।'

'লোকে তোমার নিন্দে করবে। বলবে দিদির সংসারে…'

'কিন্তু আমি তো জানি তুমি আমার নিন্দে করবে না। তুমি জানবে আমি তোমার কাছে সহজ হতে চেয়েছি, সত্য হতে চেয়েছি। তোমাকে কখনো ঠকাইনি।'

নিরঞ্জন চুপ করে রইল।

মৃদুলা বললে, 'দিদির ওপর আমার কোনো অভিমান নেই, হিংসেও নয়, দিদি যা পারেনি আমি পারতে চেয়েছি। দিদি যদি আমাকে সহ্য করতে পারে তাহলে আমি এখনো তোমার জীবনে অংশ নিতে দ্বিধা করব না।'

'তুমি আমাকে কেন ভালোবাসতে গেলে মৃদুলা?'

'কী জানি হয়তো কষ্ট পাব বলে। কিংবা হয়তো ভবিষ্যতের কোনো রঙিন স্বপ্নের আশা রাখিনে বলে। আমি তরুণী নই, আমার বয়েস হয়েছে, আমাকে একটা কিছু পেতে হবে, যা বাস্তব এবং নিকটের। আমি সংসার চাই, স্বামী চাই, মা হতে চাই—'

সন্ধ্যার অন্ধকারে সামনের পাহাড় লেপেপুঁছে গেছে। সহস্র নক্ষত্র-জোনা প্রকাণ্ড আকাশটা আকাঙ্ক্ষার মতো অতন্দ্র। একঝাঁক হাঁস গান গাইতে গাইতে আকাশ পরিক্রমা করে গেল। গানটা প্রতিবিম্ব হয়ে অনেকক্ষণ লেগে রইল দিগন্তে, চেতনায়। দূর থেকে মন্দিরের বিষণ্ণ ঘণ্টার আওয়াজ হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসছে। নিরঞ্জন তার চেতনায় এই সমস্ত শব্দগুলিকে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে শুনল। আর, গভীর এক সুখের বেদনা তাকে মৌন করে রাখল। নিরঞ্জন তার আত্মাকে স্পর্শ করতে পারল। এবং কী আশ্চর্য সে যেন দীর্ঘ ঘুমের থেকে হঠাৎ উঠে চোখ মেলে অনেক স্মৃতির সৌরভ দুহাত ভরে ঘ্রাণ নিল। অনেক অনেক কালের স্মৃতি—খণ্ড ভগ্ন, একেকটি সোনার টুকরো হয়ে তার সামনে ধরা দিল। তার শৈশব-কৈশোর মায়ের মূর্তির মতো সরল শান্ত এবং অকৃত্রিম হয়ে তাকে মগ্ন, নিশ্চিন্ত করে রাখল। মা একটা আবেগ, একটা সুখ। সে দ্বিতীয়বার নিজেকে মাতৃহারা মনে করল। এবং সুখী হল। মা তার সংজ্ঞায় আরক্ত আকাশ হয়ে গেছে, উত্তাপ-স্পন্দন-সুরভি। মৃদুলা মৃদুলা…অনাস্বাদ সুখের আকণ্ঠ পিপাসায় স্থির হয়ে রইল নিরঞ্জন।

রাত্রির আকাশে চাঁদ উঠেছে।

অজস্র জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী।

মৃদুলা বললে, 'এখনো আমরা দুজনেই মনে মনে তৈরি হতে পারিনি। অপেক্ষা করতে হবে।'

১০

নির্মলা ঘরে ঢুকে ভ্যানিটি ব্যাগের স্ট্র্যাপটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নিরঞ্জনকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। বললে, 'কখন এলে।'

নিরঞ্জন আয়নায় দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকর্ম করছিল। বললে, 'ঘণ্টাখানেক আগে।'

'মৃদুলা কেমন আছে?'

নিরঞ্জনের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। নিশ্বাস চেপে বললে, 'ভালো।'

নির্মলা ততক্ষণে ছড়িয়ে বসেছে তক্তপোশের ওপর। আয়নায় আধখানা মুখ। নিরঞ্জন উলটো ক্ষুর চালাতে লাগল।

'নিবারণকে বলে গিয়েছিলে আপিসের কাজে যাচ্ছ?'

নিরঞ্জন উত্তর করল না।

'তোমার হাতে এত সময় বুঝতে পারিনি।'

নিরঞ্জন তবু উত্তর করল না।

নির্মলা শরীরের ঊর্ধাংশকে শয্যায় কাত করল। 'কী করতে চাও তোমরা?'

'মানে?' নিরঞ্জন চুপ করে থাকা সঙ্গত বোধ করল না।

'না। জিজ্ঞেস করছি। সব কাজের তো একটা উদ্দেশ্য আছে ··

'ও।' নিরঞ্জন গোঁফচর্চায় মন দিল।

'তুমি কী ভেবেছ মৃদুলা তোমাকে···'

নিরঞ্জন শব্দ করে ক্ষুর টেবিলের ওপর রাখল।

'ত্মাখো আমাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে—'

'আমি তোমার স্ত্রী, ইচ্ছে করলেই তুমি—'

'দুর্ভাগ্য যে তোমাকে প্রায়ই মনে করে দিতে হয়।'

'হ্যাঁ। ভুলে গেলে মনে করে দিতে হবে বইকি?'

নিরঞ্জন বললে, 'চিৎকার করলেই মিথ্যেটা সত্যি হয়ে উঠবে মনে করো? দশজনের মুখ চেয়ে—'

নির্মলা কঠিন হয়ে বললে, 'দশজনের বিশ্বাসটা কী উপেক্ষা করবার?'

নিরঞ্জন বললে, 'আমি এই মুহূর্তে এই ধরনের আলাপের জন্য প্রস্তুত নই।'

'তাই বুঝি?'

নিরঞ্জন বললে, 'আমার কোনো রকম নাটক করবার ইচ্ছে নেই। শুধু মনে রেখো একজন মানুষ কখন যে আর-একজন মানুষের কাছে মৃত হয়ে পড়ে, যে ইচ্ছে করলেই সম্পর্ককে জীবন্ত করা যায় না।'

নির্মলা একটু থেমে ভেবে বললে, 'তার মানে আমি তোমার কাছে মৃত—'

নিরঞ্জন বললে, 'হ্যাঁ তাই। তোমার সম্পর্কে আমার সমস্ত বোধগুলো মরে গেছে।'

'দীর্ঘ পাঁচ বছর পর এই মরা বোধের ওপর তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে। নাকি তুমিও মরে গিয়েছিলে! এতদিন মৃতের সঙ্গে ঘর করলে কেউ বেঁচে থাকে না।'

নিরঞ্জন শুকনো হাসল।

নির্মলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'হাসিটা কোনো উত্তর নয়।'

'তুমি কী বলতে চাও ?'

নির্মলা বললে, 'সুখ জিনিসটা মানুষের বানানো। সংসারে কোনো মানুষই সুখী নয়, দুঃখের চেহারাটাও সকলের কাছে এক রকম নয়। অনেক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আমার জানা আছে, দেখেছি, অনেকেই সুখী নয়। তার জন্যে পারিবারিক বন্ধন ভেঙেছে এমন নজির বেশি নেই।'

নিরঞ্জন চুপ করে রইল।

নির্মলা বললে, 'হয়তো একথা ঠিক আমি তোমার মনোমতো হতে পারিনি। তার কারণ তুমি আসবার আগেই আমার জীবনের ছাঁচ গড়া হয়ে গেছে। কিন্তু তবু একজন মানুষ আর একজনকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, মানুষ হিসেবেই সেই প্রাপ্যটা কিছু তুচ্ছ করার নয়। আমার আদর্শে বিশ্বাস করবার জন্যে আমি তোমাকে জোর করিনি, কারণ স্ত্রীর দাবির চেয়ে মানুষের দাবিই আমি বড় করে ভেবেছিলাম। আমি তো তোমাকে ভুল বুঝিনি। স্বামী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবেই তোমার ভিন্নপথকে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম। আমার স্থূল অস্তিত্ব নিয়ে আমি তোমার পথে বাধা রচনা করিনি। তাই এখন আমার কাছ থেকে তোমার মুক্তির স্বপ্নটাও মিথ্যা, মনগড়া—'

নিরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কী রাগ করলে নাকি ?' নির্মলা এল পায়ে পায়ে।

নিরঞ্জন তবু কথা বলল না।

নির্মলা আবার বললে, 'কিন্তু তুমি কী মনে করো মৃদুলা তোমাকে সুখী করতে পারবে ? সুখী হতে-চাওয়ার চেষ্টাটাই সুখী হওয়ার পথে অন্তরায়। আমি যে কারণে তোমাকে সুখী করতে পারিনি মৃদুলাও হয়তো অন্য-কারনে তোমাকে সুখী করতে পারবে না। এই ভাবেই মানুষকে যদি পাত্রপরিবর্তন করতে হয় তাহলে কোনোদিনই তার শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। শোনো রাগ করো না। আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো।'

নিরঞ্জন এক মুহূর্ত কেমন হয়ে গেল। তার মনে হল দেরি হয়ে গেছে। নিশ্বাস ফেলে তোয়ালে কাঁধে বাথরুমের দিকে ধাবিত হল। জলের কলে মুখ দিল, চোখে জলের ঝাপটা দিল। কয়েকবার মুখে জল নিয়ে বিস্বাদ ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল। কতক্ষণ কলের নিচে করতল প্রসারিত করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আঙুলের ফাঁকে জল গড়িয়ে পড়ছে। মৃদুলার মুখ

ভাববার চেষ্টা করল। একটা উদ্‌বিগ্ন অন্যমনস্কতা তার মনকে চিরে দিতে লাগল। একটা কিছু করতে হবে, একটা কিছু, মনে মনে উচ্চারণ করল নিরঞ্জন।

আপিসে কাজের চাপেও তার মনকে জোড়া লাগাতে পারল না নিরঞ্জন। একেক সময় নিজেকে ফতুর এবং নির্বোধ লাগছে। চোখের সামনে শাদা দেয়াল, বিবর্ণ, ধূসর। অনেক পথ হেঁটে দম ফুরিয়ে গেলে যেমন লাগে, তেমনি একটা শূন্যবোধ তাকে ঘিরে ধরল। নিরঞ্জনের মনে হল তার জীবনটা খাপছাড়া, কোথাও মিল নেই। এবং সে সম্পূর্ণ একা। নির্মলা নেই, মৃদুলা নেই, কেউ নেই। বস্তুত সে ওদের মধ্যে নিজেরই ছায়া দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু ছায়াটা তার নিজেরই। সে নিজের দর্পণকে বড় করে দেখেছিল। এগুলি তারই সৃষ্টি! তাই এখন সে ওদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে।

নিরঞ্জন উচ্চারণ করল: ভা-লো-বা-সা। কিন্তু জোর পেল না। ভালোবাসার অন্ধ অনুভব তাকে রেশমের আচ্ছাদনের মধ্যে বদ্ধ করে রেখেছে। নিজেরই কুসুমকারাগারে সে বন্দী। এই ভালোবাসা তার আত্মপ্রেম, সে নিজেকেই ভালোবাসে। ভালোবাসায় সে কোনোদিন আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র হতে পারবে না, কারণ সে হিসেবের কড়িতে বাঁধা। তার সমস্ত জীবন-কামনা বাঁধা-বরাদ্দের সীমায় আটকে গেছে।

নিরঞ্জন অন্যদিনের থেকে আজ আগেই বাড়ি ফিরল। কেমন জ্বরজ্বর লাগছে। তার কী অসুখ করেছে! দেহজোড়া ক্লান্তি, অবসাদ। ঘুম পাচ্ছে।

নিবারণ বললে, 'চা করে দেবো?'

'দে।' নিরঞ্জন জামা জুতো না খুলেই বিছানার ওপর ভেঙে পড়ল।

'নিবারণ—'

'কিছু বলবেন?'

'তোর বউদিদি ফেরেনি এখনো?'

'উনি তো দুপুরে চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন!'

'বুড়োবাবুর কাছে। দুপুরে কোথা থেকে ফিরে এলেন। নাওয়া নেই খাওয়া নেই। দেখে মনে হল অসুখ করেছে। আমাকে বললেন ট্যাকসি ডেকে দিতে।'

নিরঞ্জন ধমক দিল : 'বেশি কথা বলিস তুই। যা চা নিয়ে আয়।'

নিরঞ্জন জামা ছাড়ল। কারণ আর ক্লান্তি দেখানোর মানে নেই। আয়নায় দাঁড়িয়ে সে একমিনিট কী ভাবল। তারপর চিরুনিতে চুল আঁচড়াতে গিয়ে হঠাৎ নির্মলার লেখা কাগজটা চোখে পড়ল। নির্মলা তাড়াহুড়ো করে কয়েক ছত্র লিখে গেছে। নির্মলার হাতের লেখা এমন কুৎসিত আর কোনোদিন দেখেনি। বিশ্রী আর নোংরা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল নিরঞ্জন। এর অর্থ কী, কী বলতে চায় সে। নির্মলা ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল! এই দীর্ঘ বছরে কোনো অলৌকিক কিছু ঘটেনি। বিচারক স্বাভাবিক রায় দিয়ে গেছে। 'আমি জানতাম কোনোদিন মা হতে পারব না, জানতাম না সে-জানাটা কত নির্মম।'

নিরঞ্জন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল চিঠির দিকে। এই মুহূর্তে বাড়িটা একটা নৌকো হয়ে গেছে, আর নৌকোটা ভয়ংকরভাবে দুলছে। নিরঞ্জনের মাথা দুলতে লাগল, চোখের সামনে অন্ধকার ঘষা কাচের মতো, আর সে যেন পূর্ণ বধির হয়ে গেছে।

নির্মলা এ কী করল। তার সমস্ত আদর্শবাদিতা নিয়ে সে মাতৃত্বের বন্ধ দ্বারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ল কেন। সে কী তাকে জানাতে চেয়েছিল সেও আরও দশজনের মতো সুস্থ স্বাভাবিক নারী হতে চেয়েছিল!

নিরঞ্জন আবার চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরল।

নির্মলা লিখেছে : 'বাবার কাছে যাচ্ছি। কারণ আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। আমার জীবনের অর্জিত সমস্ত ধ্যানধারণার জন্যে বাবা দায়ি। হয়তো সেখানেই আমাকে শেষ সান্ত্বনা খুঁজতে হবে।

'দাদাবাবু—চা—'

নিরঞ্জনের মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন মস্তিষ্ক এখুনি বিদীর্ণ হয়ে পড়বে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ।

'কে?'

'আমি নবেন্দু—'

'এস। চা খাবে?'

নবেন্দু বললে, 'সুষমা আমাকে পাঠিয়ে দিল। কাল দুপুরে আমার ওখানে যাবে। শানুর জন্মদিন।'

নিরঞ্জন ওর কথা শুনছিল না। ওর চোখদুটো বিস্ফারিত, ওকে ভয়ার্ত প্রাণীর মতো দেখাচ্ছিল।

'কী হয়েছে নিরঞ্জন ?

'না কিছু নয়। কখন বললে ? কাল ? যাব নিশ্চয়ই যাব।'

'নিরঞ্জন তোমার কী কিছু হয়েছে ?'

'প্লিজ নবেন্দু, প্লিজ, লিভ্ মি এলোন—'

নবেন্দু বোকার মতো পলায়ন করল।

নিরঞ্জন এতক্ষণ পর প্রাণ খুলে হাসল। হাসতে হাসতে তার কাশি পেল, চোখে জল এল।

১১

টেলিগ্রামের সামনে স্থির হয়ে বসে রইল নিরঞ্জন।

'বম্বে মেলে পৌঁছচ্ছি। স্টেশনে এস।'

পায়ের কাছে সকালের এক টুকরো রোদ পোষা খরগোসের মতো শুয়ে আছে। টাইম টেবিলে বম্বে মেলের পৌঁছনোর সময় দেখল নিরঞ্জন। এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি! সময় যেন অনন্ত, রয়েবসে খরচ করা চলে। জামা কাপড় ছাড়তে বেশি সময় নেবে না! এবং এই সকালে ট্যাকসি পেতেও অসুবিধে হবে না। মনের ভেতরে অদ্ভুত এক শান্তি বোধ করছে নিরঞ্জন। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল।

নিরঞ্জন খবরের কাগজে চোখ রাখল। এই যে এই খবরটি সে কাল অনুবাদ করে দিয়েছে। ট্যাকসিচালকের বদান্যতা। ব্যাগভরতি পাঁচহাজার কারেন্সি নোট সে থানায় জমা দিয়েছে। এখনো সমাজের নৈতিকতা টিকে রয়েছে। কারণ নিচেরতলার মানুষের মধ্যে আজও ন্যায়নীতি বেঁচে আছে।

নিরঞ্জন হাই তুলল।

সিঁড়িতে পদশব্দ।

এই সকালে উশকোখুশকো গণেশকে দেখে অবাক আর আতংকিত হল নিরঞ্জন।

'তুমি!'

'আপনাকে এখুনি রওনা হতে হবে। আমি শেষ রাত্রির ট্রেনে ছুটে আসছি। হঠাৎ আগুন লেগে দিদিমনি ভীষণ পুড়ে গেছেন।'

নিরঞ্জন চমকে উঠল। তার মনে হল সে যেন একমুখ আগুনের ভেতর প্রবেশ করেছে। নিরঞ্জন চিৎকার করতে গেল, গলায় কোনো স্বর বেরুল না। তারপর কোনো রকমে সে যেন সাহস সংগ্রহ করল: 'আমি, আমি এসবের কী জানি? আমি কী করতে পারি?'

গণেশ বললে, 'মনে হয় আপনার যাওয়া দরকার।'

নিরঞ্জন চিৎকার করে উঠল: 'না। আমি যেতে পারিনে।'

গণেশ হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, 'আপনাকে খবর না দিলে আমার অপরাধ হত। তাই এসেছি। আমার আর সময় নেই। ঘণ্টাখানেক বাদে ট্রেন আছে। তাহলে আসি।'

গণেশ বেরিয়ে গেল।

নিরঞ্জন আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। অনেকগুলি সিগারেট ধ্বংস করল। তারপর উঠে দাঁড়াল। স্টেশনে যেতে হয়। বম্বে মেল। মৃদুলা আসছে।

নিরঞ্জন জামা কাপড় বদলাল। তারপর রাস্তায় নেমে এল।

'হাওড়া স্টেশন—'

ট্যাকসি ছুটল।

গাড়ির গতিবেগে নিরঞ্জনের সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি খাচ্ছে। মাথার মধ্যে কলরব: আমি আসছি—আমি আসছি—

টিকিট সংগ্রহ করে নিরঞ্জন ছুটল। কোন্ প্ল্যাটফরম। পাঁচ নম্বর, না সাত নম্বর। ভিড়ের মধ্যে জনতা হয়ে গেল নিরঞ্জন। ট্রেন কী এসে পড়েছে। নাকি এখুনি ছেড়ে যাবে। তার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠছে। চোখের সামনে ধাবমান জনতা একটা পিণ্ড হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার লাগছে। কোন্ ট্রেনের হুইশল দিল? 'আমি আসছি—আমি আসছি—' নিরঞ্জন চিৎকার করে উঠল। তার পা টলছে, কাঁধে মস্ত ভার নিয়ে সে যেন সতীকাঁধে শিবের মতো টলতে টলতে আকাশ-মর্ত পরিক্রমা করে চলেছে। পায়ের তলে মাটি কাঁপছে, আকাশ কাঁপছে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা...

ট্রেন গতি পেয়েছে। পিছনে প্ল্যাটফরম সরে সরে যাচ্ছে। নিরঞ্জন হাতল ধরে ঝুলে পড়ল। এখন তার সারা শরীরে ঘাম, ঘামের গঙ্গা, সে গলছে। গলার ভেতরটা শুকনো কাগজের মতো, বুকের ভেতরে কী-একটা ঠেলে ঠেলে উঠছে।

আঃ, শরীরটাকে দরজার ভেতর গলিয়ে দিতে পেরেছে। নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত হল। এখন তার আর ভিন্ন গতি নেই। ট্রেনের গতিই তার গতি। সে এখন নির্ভার এবং বোধহীন।

নিরঞ্জন পাশাপাশি বম্বে মেলকে স্টেশনের প্ল্যাটফরমের দিকে গড়িয়ে যেতে দেখল। মেল এখুনি থামবে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমে। মৃদুলা দরজা ধরে ইতস্তত দৃষ্টি ছুঁড়বে। ওর ক্লান্ত রাতজাগা চোখের তারা। তারপর সে নেমে আসবে প্ল্যাটফরমে। তার আশেপাশের যাত্রীর ভিড় কমবে। পরিচিত সম্ভাষণ, চিৎকার, কুলির ব্যস্ততা। মৃদুলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর এক সময় নিজের হাতে সুটকেস তুলে নেবে, পায়ে পায়ে এগোবে গেটের দিকে। টিকিট কালেকটারের হাতে টিকিট গুঁজে দেবে। এবং তারও পর সে অপেক্ষা করবে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াবে, ভাববে, একসময় ট্যাকসিস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবে॥

৪

অপরাহ্ণ

হঠাৎ বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল পত্রলেখার। ফাল্গুনের এই ভোরে যেন শীতের পুরোনো আবেশ। কেমন নীল হয়ে এল ওর হিমাক্ত অধর। কাঁধের দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে পিঙ্গলাভ চুলের অরণ্য, চোখের লালচে আভায় হঠাৎ দ্যুতি লেগে কেমন প্রদীপ্ত দেখাচ্ছে, ঢিলে সেমিজের আবরণে ঊর্ধ্বাংগ সমুদ্রের ব্রেকারের মতো আছাড়ি-পাছাড়ি খাবার ছন্দে ঘন ঘন নিশ্বাস সঙ্গত জানাচ্ছে।

ভোর হতে শানাইয়ের সুর বাজছে এ বাড়ির সিংদরজায়। কেঁপে কেঁপে তরঙ্গিত শব্দমালা যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে দিক্ হতে দিগন্তে।

আজ গোধূলিলগ্নে বিয়ে পত্রলেখার।

একমাস ধরে রক্তে রক্তে রোমাঞ্চ। কত স্বজন এসেছে, কলেজের বন্ধুবান্ধবরা কতবার হালকা পরিহাস করে গেছে। চব্বিশ বছরের জীবনটা একেবারে অনভিজ্ঞ নয়,—রোদে জলে আপনিতেই মনে রঙ ধরেছে। তবু ওদের কথাগুলো, পরামর্শগুলো অনেক গোপন-চরিতার্থতার বাণী বহন করে এনেছে বইকি। হেসেছে মুখটিপে চটুল চাহনিতে, কখনো সরবে—কখনো নিঃশব্দে। হাজার-বার মা ডেকেছে গয়না পছন্দ করতে, শাড়ি পছন্দ করতে। লজ্জার মাথা খেয়ে মতামত দিতে হয়েছে পত্রলেখাকে।

মা বাবার সব ব্যাপারেই যেমন, বিয়ের ব্যাপারেও চূড়ান্ত তৎপরতা। লক্ষ কথা নয়, এক কথায় বিয়ে স্থির। তারপর একমাসের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন।

পত্রলেখা ভাবতে সময় পায়নি বেশি দিন। অথচ এ ভাবনা মাসের পর মাস ধরে সব মেয়েরই রোমন্থন করতে ভালো লাগে। বিয়ের আগে থেকেই চলে মাসাধিক ধরে আবহ সংগীত, শেষ হয় ফুলশয্যার সোচ্চার দ্বৈতগীতির মধ্যে। কিন্তু, সে সময় পায়নি পত্রলেখা। ফোর্থ-ইয়ারে কলেজ থেকে হঠাৎ ছাড়িয়ে আনলেন বাবা, জানালেন তার বিয়ে। বই ফেলে বিয়ের মালা নিয়ে দিন কাটলো ওর।

কি নাম ছেলেটির? প্রভাতঅরুণ! কি বিরাট নাম। তবু নামের বিশেষত্ব আছে। হয়তো মানুষটারও। হালের সাবডেপুটি। পোসটিং হয়নি

এখনো। বাপমার এক সন্তান। কৃতবিদ্য। একটি বারও পত্রলেখাকে দেখবার আগ্রহ জানায়নি। দেখলে আর কতটুকু চেনা যায়। মা বাবার মতেই মত। এমন ছেলে এযুগে দুর্লভ।

নিরীহ-নিরীহ ভীরু স্বভাবের হয়তো।

কিন্তু…কী একটা ভেবে হেসে উঠল পত্রলেখা। ভীরু লোকদের প্রতি সাধারণ মানুষের একটা করুণা আছে। ভাবতেই পারে না শীতকালের নির্জীব রোদের মতো নিশ্চুপে পায়ের কাছে পড়ে-থাকা কোনো পুরুষমানুষের কথা। নিরীহ মানুষেরা চোখের সামনে ঝড় দেখলে কি করে? কী করবে প্রভাতঅরুণ পত্রলেখাকে নির্জন ফুলশয্যার রাত্রে হাতের নাগালে পেয়ে? নখ দিয়ে মাটি খুঁড়বে? আনত চোখে খাটের বেডশিট টানটান করবে? তাকে ছোঁবে কি? না ভীরু হাত কেঁপেই যাবে? কি প্রশ্ন করবে? না প্রশ্নাতীত ধ্যানী উপস্থিতি দুর্লভ রাত্রির স্রোতকে কুঁরে কুঁরে খাবে?

এ লোক আবার বিচার করবে। রায় দেবে। ভাবতেও মজা লাগে পত্রলেখার। একবার লুকিয়ে যেতে হবে ওর এজলাসে, দেখতে হবে উকিল মোক্তারের সওয়াল কেমন স্থিরধৈর্যে শোনে সে।

কলেজের মুখচোরা ইংরেজির অধ্যাপক দেবনাথকে মনে পড়ে। মেয়েদের দিকে চোখ পড়লেই মুখ লাল হয়ে যায়, তোতলাতে থাকেন। চোখ নিচু করে পড়ান। আর মেয়েরা মুখ টিপে টিপে হাসে।

সুশীলা দুষ্টুমি করে বলাবলি করত 'ভারি লাজুক মানুষ। পেটিকোটের ওপরে ওঁর দৃষ্টি যায় না'।

ছি ছি! কান রাঙিয়ে উঠত পত্রলেখাদের। কী অসভ্য সুশীলাটা।

সেই লাজুক দেবনাথবাবুই কাণ্ড করলেন। টিউটোরিয়াল ক্লাশে শুদ্ধকরা খাতার ভাঁজে বিনতার হাতে প্রেমপত্র তুলে দিলেন। বিনতাও কম ফ্লার্ট নয়। কলেজের পরীক্ষায় ইংরেজিতে বেশি বেশি নম্বর পেতে লাগল, ফাইনালে বিনিপয়সায় দেবনাথের কোচিং পেল, তারপর পাশ করে কলেজেরই একটি সিনিয়ার ছাত্রের হাত ধরে বরানগরে সংসার করতে গেল।

প্রভাতঅরুণ হয়তো তেমন নয়। হলেও ক্ষতি কী। দেবনাথবাবুর করুণ কাহিনী বলা যাবে তাকে।

কলেজের কথা মনে হতে চিরঞ্জীবের কথা মনে পড়ল পত্রলেখার।

লম্বা ছিপছিপে ফর্সা পোশাকে-আশাকে সাহেব। মুখে খৈ ফুটছে যেন। কলেজটা ছিল ওর জমিদারি। ওর খবরদারির জ্বালায় মেয়েরা পর্যন্ত তটস্থ। আর মেয়েরা যেন ওর পায়ে মাথা খুঁড়তেই জন্মেছে। ভাবখানা: 'আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম'-এর মতো। মেয়েরাও যেন ওকে দেখলে ভিজে যায়। কাদার মতো নেতিয়ে পড়ে। কলেজে আসতো জীপ নিয়ে—পৈতৃক সম্পত্তি। আজ একে কাল ওকে লিফট দিচ্ছে। স্টিয়ারিং হাতে পবনবেগে গাড়ি চালাত চিরঞ্জীব। বলত, 'স্পীড; এযুগের ধর্মই হচ্ছে স্পীড।' ভয়ে আতংকে নীল হয়ে উঠেও মেয়েরা রোমাঞ্চে চিৎকার করত।

সেই চিরঞ্জীব! কম জ্বালাতন করেছে পত্রলেখাকে।

কলেজ ছুটির পর একলা বাড়ি ফিরছিল।

চিরঞ্জীব দ্রুত হেঁটে এসে ধরল তাকে। 'আচ্ছা কাব্যে উপেক্ষিতার মতো এমন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ান কেন বলুন তো?'

রাগ হয়েছিল পত্রলেখার। ব্যংগ করে বলেছিল: 'আপনি কি চন্দ্রাপীড়ের ভূত হয়ে এবার পুরোনো অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবেন?'

'বাঃ আপনার কথায় তো বেশ ধার আছে, শরীরটা ইস্পাতে তৈরি বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনি লক্ষ্য ভুল করেছেন চিরঞ্জীববাবু—'গম্ভীর গলায় ঘোষণা করেছিল পত্রলেখা: 'উনবিংশ-শতকের এইধরনের স্তবগানে আমার কাছে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না।'

পা বাড়িয়েছিল তারপর। চিরঞ্জীবই এগিয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল: 'দাঁড়ান যাবেন না।' তারপর হেসে বলেছিল: 'আপনার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে এসেছি বলেই যে প্রেম করতে এসেছি এ ধারণা হল কি করে পত্রলেখা?'

'দেখুন চিরঞ্জীববাবু, রাস্তার মধ্যে এ ধরনের এক্সিবিশন আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আর ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আলাপ করবারও সুযোগ খুঁজবেন না।'

'ভবিষ্যতের কারবারে আমি অত বিশ্বাসী নই। ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে কথা বলা চলবে কিনা সেটা ভেবে দেখব অবশ্য। তাই বলে বর্তমানকে বাজে খরচ করি কেন বলুন?' তারপর একটু থামে:-'আচ্ছা

বলুন তো আমার ওপর এমন রাগ কেন? নিঃসম্বন্ধ লোকের উপরে শুধু শুধু কেউ রাগ করতে পারে। আপনি চান বা না চান একটা সম্বন্ধ আছেই আমাদের। অন্তত ক্লাশমেট তো বটেই।'

'আপনি কি বলতে চান? প্রয়োজন আছে কোনো?'

'প্রয়োজন! ওটা বানানো হতে পারে পত্রলেখা। আর পৃথিবীতে সব কিছুই তো বানানো। এই চাঁদ-তারা, মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ......আসল সমস্যা কি জানেন? এইটেই আমরা স্বীকার করতে চাইনে, ভয় পাই। কে বলতে পারে, আজকের আপনার সব প্রতিবাদ কালকেই প্রীতিবাদ হতে পারে!'

'আপনি দেখছি চূড়ান্ত আশাবাদী। আপনার বাবার টাকা আছে জীপ-গাড়ি আছে, সে খবর আমার জানা। আপনার জীপে যেসব মেয়েরা হাওয়া খেয়ে বেড়ায়—সেই মঞ্জুলিকা তনিমার দলে আমি নই।'

'ইউ আর জেলাস! বেশ তো আপনাকেও না হয় জীপে করে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব। আমার জীপের গতিবেগে এযুগের গতিকে আপনি স্পর্শ করতে পারবেন। স্পীড, বুঝলেন পত্রলেখা, স্পীডই এযুগের ধর্ম......।'

'ধন্যবাদ।' পত্রলেখা আবার পা বাড়াল।

'বিশ্বাস হচ্ছে না। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখুন। শিল্পে-বাণিজ্যে ওরা এযুগের মর্মমূলকে চিনতে পেরেছে। আর আমরা! ভেবে দেখুন সেই গোরুরগাড়ির চাকায় ঘুরপাক খাচ্ছি। ভাবতে পারেন যেখানে কলকাতার রাস্তায় সেকেণ্ডে মোটরকারের চাকা উধাও হচ্ছে সেখানে বলদেটানা গো-শকট টিকির টিকির করে চলেছে। এমন অশ্লীল কাণ্ড, ন্যুইসেন্স ব্যাপার ভাবতে পারেন? মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কলকাতা থেকে আপনি লণ্ডনে ঘুরে আসতে পারেন, আর চেয়ে দেখুন আমাদের নাটকে নভেলে 'আমি ভালোবাসি' এই ছোট্ট কথাটা বলতে লেখকেরা পাতার পর পাতা ইনিয়ে-বিনিয়ে চলেছেন। বুঝলেন পত্রলেখা, জীবনের পাঠশালা থেকে একটি শিক্ষাই আমি গ্রহণ করেছি, স্পীড মোর স্পীড।'

পত্রলেখাকে আর বাধা দিল না চিরঞ্জীব। পেছন থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিল: 'তাহলে কথা রইল আমার জীপে একদিন হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব—'

তারপর থেকে চিরঞ্জীব একটি আতংক। সব সময় সশস্ত্র থাকতে হয়

কখন মূর্তিমান বিপদ উদয় হবে। কিন্তু, সব সময় কি সশস্ত্র থাকতে পেরেছে, ঝটিকার মতো বিপর্যস্ত করে দিয়েছে চিরঞ্জীব। ওর যদি হৃদয় থাকত তাহলে কোনো সময় হয়তো তার তনুমন সমর্পণ করে বসত পত্রলেখা। চিরঞ্জীবের স্বভাবই তাকে রক্ষা করেছে। মেয়েদের দুপাশে রেখে গতিবেগে ছুটে যেতেই আনন্দ ওর। এ এক দুরন্ত খেপামি। আর ওর চিত্তগুণে সিরিয়াস কথাগুলো পর্যন্ত হালকা ফেনিল হয়ে ওঠে। ও যখন ভালোবাসার কথা বলে তখন মনে হয় আমেরিকান সৈন্যদের মতো চ্যুয়িংগাম চিবোচ্ছে। আর ওর, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় যখন মঞ্জুলিকা কি মালিনী চোখে রুমাল চেপে ফুঁপিয়ে উঠেছে তখন এগিয়ে গিয়েছে সে এনাসিনের ট্যাবলেট নিয়ে, উপদেশ দিয়েছে: 'এটা খেয়ে নাও দাঁত ব্যথা সেরে যাবে।'

একটি মানুষের চরিত্রের সীমানা ধরে ফেলতে পারলে আর তার সম্পর্কে মেয়েদের কোনো ভীতি থাকে না। পত্রলেখা সুস্থির হয়েছিল। কিন্তু, কে জানত তাকে সুস্থির করবার জন্যেই চিরঞ্জীবের এই সজ্ঞান প্রয়াস।

অন্য মেয়েদের বাড়ির দরজায় লিফ্‌ট দিয়ে পত্রলেখাকে পাশে বসিয়ে ছুটেছিল চিরঞ্জীব।

পাতলা সিল্কের মতো নরম সন্ধ্যা। আসন্ন শীতের জুড়োনো হাওয়া। ঘুম পায়। চিরঞ্জীব আজ অন্যদিনের চেয়ে শান্ত, নিশ্চুপ। স্টিয়ারিঙে হাত-রাখা ওর লম্বা দেহটাকে পাথরের স্ট্যাচুর মতো দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে দিল চিরঞ্জীব।

লেকের পেছন দিয়ে ছুটল গাড়িটা।

'চলো আমার ডেরাটা তোমাকে দেখিয়ে আনি।'

আপত্তি করবার আগেই গাড়ি থেমেছে এস. আর. দাস রোডে। একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ির সামনে। দরজা খুলে আহ্বান জানাল চিরঞ্জীব, 'ভয় নেই সময় মতো পৌঁছে দেবো।'

পত্রলেখা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামল গাড়ি থেকে।

পুরোনো ভৃত্য লক্ষ্মণকে নিয়ে নির্বান্ধব সংসার চিরঞ্জীবের। একতলার ফ্ল্যাট। স্বয়ং সম্পূর্ণ। দুখানা ঘর। একটা চিরঞ্জীবের শয়নরুম-কাম-ড্রইংরুম। অন্যটায় চাকর থাকে। বারান্দা ঢেকে রান্নাঘর।

চিরঞ্জীবের ঘরে এসে বসল পত্রলেখা।

বোধহয় চাকরকে খাবারের ফরমাস করতে সে বেরিয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্তও গেল গড়িয়ে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছিল পত্রলেখা। ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল, টয়লেট। দক্ষিণের জানলা ঘেঁষে সিঙ্গল খাট। জানলায় নীল পর্দা। দুধশাদা ফিলিপস্-এর আলোয় ঘরটা শুভ্র স্নিগ্ধ। কোচে পা ছড়িয়ে বসল পত্রলেখা। আয়নায় তার প্রতিবিম্ব। খয়েরিরঙের টিপটা জ্বল জ্বল করছে। ঘনকাজল চোখের দৃষ্টি গভীর দেখাচ্ছে। বিস্রস্ত চুলগুলো ঠিক করে নিল, পায়ের কাছে শাড়ির প্রান্তটা ছড়িয়ে বসল চুপ করে।

'কেমন লাগছে?' বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে এসেছে চিরঞ্জীব।

'ভালো। আমায় কিন্তু এখুনি ফিরতে হবে চিরঞ্জীববাবু—'

'এসেছো যখন একটু থাকলেই বা। বাড়ির পরিবেশ দেখলে একটি গোটা মানুষকে চিনতে পারবে। মানে আমাকে চিনতে পারবে।'

'বারে! আপনাকে চিনতে কি বাকি আছে!'

'সেটা আমার পোশাকি চেনা, আটপৌরে রূপ আমার এখানেই।' হাসল পত্রলেখা।

'আমি কিন্তু তোমাকে দেখছি। দেখছি শাশত রমণীরূপকে। মাদাম আন্তোনিয়েত সময় মতো কবরী সজ্জা করতে পারেননি বলে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরুতে পারলেন না। ফলে গিলোটিনে তাঁর মাথা উড়ে গেল। বিপদের চেয়ে মেয়েদের কাছে প্রসাধন বড়। না না, লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। তুমি ঘরে পা দিয়েই আয়নায় তোমার ক্লান্ত কেশবাস সজ্জিত করে নিয়েছ বলেই আমি একথা বলছিনে। এটা মেয়েদের দুশ্চরিত্রের প্রমাণ নয়। প্রকৃতি আসে ঋতুসম্ভার সাজিয়ে। মেয়েদের নামও তো প্রকৃতি।' সিগারেট ধরাল চিরঞ্জীব: 'একটিমাত্র পুরুষের জন্যেই তুমি সেজেছ—একথা বলা ভুল হবে। কিন্তু বাড়িতে থাকলেও কি তুমি সাজতে? না। পুরুষের চোখে নিজেকে সুন্দর করে তোলাই মেয়েদের প্রতিভা। তোমার খোঁপায়-গোঁজা ফুলটার অস্তিত্ব তুমি নিজে দেখতে পাওনা। তুমি চাও দেখাতে……।'

পত্রলেখা ঘামতে লাগল। চিরঞ্জীবের কথা বলার ধরনে সে বিস্মিত নয়। এই একলা নির্জন পরিবেশে ওর কথাগুলো অন্য ব্যঞ্জনা আরোপ করছে।

চিরঞ্জীব বললে, 'ভেবে ত্মাখো পত্রলেখা পৃথিবীর নব্বুই ভাগ লোক তোমাদের দাসত্ব করছে। তবু অহংকারী পুরুষ কলংক রটায় তোমরা অবলা। কলে কারখানায় অসুরের মতো মানুষ শ্রম বেচে পৃথিবীর উৎপাদনের আশীভাগ তৈরি করছে কি? কেবল তোমাদের টয়লেট, পারফিউম! আর খদ্দের কারা—মেয়েরা। তোমরা যদি একদিন একযোগ হোয়ে বলো আমরা টয়লেট চাইনে, পারফিউম চাইনে—তাহলে এতগুলি লোক বেকার হয়ে যায়। তাহলে ভেবো ত্মাখো পৃথিবীর নব্বুইভাগ লোকের রুজি বাধা রয়েছে তোমাদের রুচির ওপরে।'

ভৃত্য ওভালটিনের বাটি রেখে দিয়ে চলে গেল।

বাটিতে চুমুক দিতে দিতে চিরঞ্জীব আবার বললে, 'আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না প্রেমটা মেয়েদের কাছে প্রসাধন ছাড়া কিছু নয়?'

'আমি অতো কথা জানিনে—' ওভালটিনের পাত্রে মুখ লুকোলো পত্রলেখা।

'এই সেজেগুজে থাকা, সাজানো-বানানো কথা বলা, বুফে—কাফেতে চায়ের পেয়ালায় হাসির তরঙ্গ, কিংবা গোধূলির আলোয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে পা ছড়িয়ে চিনেবাদামের খোসা ছাড়ানো—এতো জীবন নয়, জীবনের প্রসাধন। সেদিন বিলিতী কাগজে প্রেমের গল্প পড়ছিলাম। যাকে বলে আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা—সাজানো কথা, সাজানো হাসি—তারপর বিয়ের একমাস যেতে-না-যেতে তারা আলাদা হয়ে গেল। পুরুষটির অপরাধ? ঘুমোবার সময় তার নাক ডাকে……।' চিরঞ্জীব সিগারেটের টুকরো ছাইদানে গুঁজতে গুঁজতে বললে: 'মানুষের যে নাক ডাকার মতো জৈবিক ব্যাপার আছে জীবন-বিলাসিনীদের কাছে তা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আসলে জীবনকে সাদামাঠা আকারে তারা চিনতে চায় না, তাই প্রসাধিত জীবনকেই ভাবে সত্য।'

'কিন্তু…এসব কথা আমাকে বলছেন কেন চিরঞ্জীববাবু? আমি তো ……' হাতের মুদ্রায় ক্লান্তির ভাব ফোটাল পত্রলেখা।

'বলছি জীবনকে জানো।' আর একটি সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করল চিরঞ্জীব। 'আসল ব্যাপার হচ্ছে সত্যকে সত্য বলে চিনতে শেখা। জীবন লীলাও নয় তত্ত্বও নয়। এই সন্ধ্যাকে অনন্তের খণ্ড প্রকাশ বলে না ধরে ভাবো এই সন্ধ্যা নিটোল মুক্তোর মতো স্বপ্রকাশ। ধরো তুমি আর আমি আর এই দুর্লভ অবকাশ। যদি এই মুহূর্তে তোমার

ভিজে নরম হাত আমার মুঠোয় তুলে নিই, চমকে উঠোনা—তুমি সতীত্বের কথা তুলে আপত্তি করবে। কিন্তু……' হাসল চিরঞ্জীব: 'যদি বলি আমি তোমাকে বিয়ে করব, তাহলে একই মুহূর্তে তোমায় সতীত্বের বাধাগুলি ছিঁড়ে খানখান হয়ে যাবে।'

'আপনি—আপনি একী বলছেন!' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর পত্রলেখার।

'ঠিকই বলছি। বলো সত্যি কিনা, একটি কথার মধ্যোই তোমার সতীত্বের চাবিকাঠি লুকোনো কিনা।'

'আমাকে বাড়ি যেতে দিন……'

'একটা মজার গল্প বলি শোনো। আমি বরাবরই তোমাদের ভাষায় একটু পাকা। আমি বেশি বয়েসে পড়াশোনা শুরু করি। ফার্স্ট ক্লাশে উঠতেই আমার বয়েস কুড়ি পেরিয়ে গেল। তখন আমাদের গাড়ি ছিল না। ট্রামে যেতাম রোজ ইস্কুলে। আর ভরতি ট্রামে রোজই দেখা হয়ে যেত এক স্বাস্থ্যবতী উত্তর-তিরিশ মহিলার সঙ্গে। তাঁর পাশে রোজই তিনি আমাকে বসতে দিতেন। ট্রামের ঝাঁকুনিতে ওর নরম শরীরের ঢেউ যখন আমার ওপর পড়ত তখন, বলতে লজ্জা নেই, আমার নিজের মধ্যে গোপন রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। তারপর একদিন, জানতে পারলাম ভদ্রমহিলা আমারই ইস্কুলের এক সহপাঠীর মা। এর পরেও বসেছি তাঁর কাছে, কিন্তু সে উত্তেজনা আর বোধ করিনি……।'

অকস্মাৎ চুপ করে গিয়েছিল চিরঞ্জীব। ঘরময় অস্থির পদচারণ শুরু করেছিল।

আর কেমন অসাড় জড়পিণ্ডের মতো কৌচের গায়ে আটকে গিয়েছিল পত্রলেখা। মনে হচ্ছিল দীর্ঘ রোগভোগে দীর্ঘ অবসাদের শীতলতায় সমস্ত দেহ ছেয়ে গেছে। আয়নায় প্রতিফলিত ওর চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত। গ্রীষ্মের পীড়িত জন্তুর মতো মুখ ঈষৎ উন্মুক্ত করে ধুঁকছিল সে।

পিছন থেকে ওর কাঁধে হাত রেখে হাসল চিরঞ্জীব। 'একেবারে ঘামে নেয়ে গেছ। ফ্যানটা খুলে দেবো—'

কথা বলতে পারেনি। মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল পত্রলেখা।

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখের ওপর অত্যন্ত প্রখর আলো ফেলেছিল চিরঞ্জীব। অনেকক্ষণ নির্বাক তাকিয়েছিল। তারপর আবার পায়চারি শুরু করে হেসে হেসে বলেছিল: 'আর একটি প্রহেলিকা আমি কিছুতেই

বুঝতে পারিনে। একটি নির্জন সন্ধ্যায় মুখোমুখি দুজন পুরুষ-নারীর মানসিকতা! মানসিক ঘনিষ্ঠতাকে ছাপিয়ে ওঠে মেয়েদের সজ্ঞানস্তরে দেহচেতনা। আমার কি মনে হয় জানো পত্রলেখা? বিদগ্ধতার রাজ্যে মেয়েদের পশ্চাদ্‌গতির কারণ তাদের দেহের বাধা। তাই বুঝি চর্যাপদের কবিরা গেয়েছেন: অপণা মাসেঁ হরিণাবৈরী। আর সংসারের পথে লক্ষ্য করেছি: যতক্ষণ মেয়েরা আত্মদেহ সচেতন না থাকে ততক্ষণ পুরুষের কাছে তাদের কোনো ভয় নেই। কেবল নিজদেহ-সচেতন মেয়েরাই—তাদের সচেতনতার গুণেই পুরুষের চোখে শিকার হয়। কথাটা অনেকবার ভেবেছি: পুরুষে-মেয়েতে সত্যিকার বন্ধুত্ব হয় কিনা! আমার রায়? হয় না। ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় যেমন মনিব-শ্রমিকে, প্রভু-ভৃত্যে তেমনি পুরুষ-নারীতেও এক খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। অহর্নিশি আমাদের সমাজবিধায়করা কানে কানে মন্ত্র জপছেন: পুরুষকে পুরুষ হতে, মেয়েকে মেয়ে।......'

আবার একটি সিগারেট ধরাল চিরঞ্জীব। হাসল।

'এতক্ষণ বসে রইলে আমার ঘরে একবারও কি ভুলতে পারলে তুমি আদি ও অকৃত্রিম রমণী মাত্র। সত্যের খাতিরে যদি বলি আজকে এই নির্জন সন্ধ্যায় আমার ঘরে পা দেবামাত্রই অনেকদিনের অনেক সম্ভাবনার একটা অনিবার্য পরিণতি তুমি লালন করছিলে, তাহলে কি সেটা অপভাষণ হয়! কিন্তু......আর নয়। কথায় কথা বাড়ে অথচ সময়কে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। চলো তোমাকে বাড়িতে রেখে আসি—'

সেদিন রাত্রে ঘুম হয়নি পত্রলেখার।

আর একদিন।

ভাবতে গেলে লজ্জা হয়। কী মূর্খই ছিল সেদিন।

চিরঞ্জীবের ঘরে শ্বাসরোধকারী সেই নির্জন সন্ধ্যার কথা ভেবে ভবিষ্যতে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনোদিন মানুষটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। রাখেও নি। আর, কী আশ্চর্য, চিরঞ্জীবের দিক থেকেও তার এই নতুন ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ আসেনি। পত্রলেখা নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। মনে হল: এ তার হার, তার কলংক। প্রত্যেক মেয়েদের মনে রয়েছে তাদের অস্তিত্বের অহংকার। পত্রলেখার মনে হল: একটি সন্ধ্যার অবকাশে তাকে যেন বিশ্বের হাটে মূল্যহীন, খেলো করে দিয়েছে চিরঞ্জীব। আর খেলোত্বকে অপ্রমাণ করবার জন্যে আরো খেলো

কাজ করে বসল পত্রলেখা। নিজে গেল চিরঞ্জীবের বাসায়। কিন্তু দরজায় তালা বন্ধ। পরের দিনও পেল না গৃহস্বামীকে।

এক হপ্তা পর দেখা পেল বাড়িতেই।

জানলার ধারে কৌচ টেনে গীটারে গোয়ানীজ ভাঁজছিল চিরঞ্জীব। হাত ধরে টেনে নিল দরজা থেকে : 'এস—'

আয়নায় প্রতিফলিত শরীরের দিকে চেয়ে শিহরিত হবে না ভেবেও দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারল না পত্রলেখা। শ্যাম্পু-ঘষা পিঙ্গল চুলের স্ফীতি, সাবানে-স্নোয়ে-পাউডারে-রুজে গালে রক্তগোলাপ, চোখে কাজলের রেখা, অধর কৃত্রিম ন্যাচারাল কালারে রসনত্র। কপালে খয়ের রঙের টিপের সংকেত। তার সমস্ত শরীরটায় যেন ঝড়ের লাল মেঘের দ্যোতনা।

'ভেবেছিলাম আর আসবে না!' চিরঞ্জীব হাসল।

'সব ভাবনাই আপনার নখদর্পণে এমন বিশ্বাস আপনার হল কি করে।' পত্রলেখার কণ্ঠস্বরে খরপ্রদাহ।

'তুমি যুদ্ধ ঘোষণা করেই এসেছ দেখছি।'

'শান্তি তো আপনি চান না।'

'কিন্তু শত্রুপক্ষের দুর্বলতার সুযোগে পদ্মিনীর মতো একেবারে শিবিরে ঢুকে পড়েছ।'

কিন্তু ঝড়ের মেঘের সম্মুখে এতো শ্বাপদের উন্মত্ত উল্লাস নয়। চিরঞ্জীবের দুচোখে উত্তেজনার মশাল নয়, কামনাসিক্ত কণ্ঠস্বর বৈশাখের জ্বালায় ভারি বেসুরো নয়। যত্নে-পাটকরা চুলের একটি পাতাও নড়ছে না, না চোখের একটি পল্লব।

নিজের উত্তেজনার প্রখর আগুনে যেন সতীদাহের সতীদের মতো জ্বলতে লাগল, ছটফট করতে লাগল পত্রলেখা। আর মনে হল সমস্ত জ্বালা, সমস্ত প্রদাহ যেন এবার ফেটে পড়বে, নিবারণ ঝর্ণার মতো মনের দুকূল ভাসিয়ে দেবে। প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে দমিয়ে রাখাবার চেষ্টায় সমগ্র শক্তি যেন খরচ হয়ে গেল পত্রলেখার।

'বসবে না?'

'না—' আঁচলের ঘূর্ণি তুলে নিমেষে চৌকাঠের বাইরে পা দিতে উদ্যত হয়েছিল পত্রলেখা, কিন্তু তার আগেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে না কিসের আকর্ষণে হোঁচট খেয়ে পড়ল একটা শক্ত-সমর্থ পুরুষ-বক্ষের পরে।

ভারি পাহাড় যেমন হালকা মেঘকে অবলীলায় জড়িয়ে ধরে তেমনি স্বাভাবিক ধৈর্যে চিরঞ্জীব তার থরথর ভঙ্গুর দেহটাকে তুলে নিল। আর আধবোজা চোখের ফাঁক দিয়ে চিরঞ্জীবকে দেখে লজ্জায় কান্নায় ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল পত্রলেখা। তার মুখের দিকে চোখ রেখে হাসছে চিরঞ্জীব। সে-চোখে কোনো উত্তেজনা নেই, কামনা নেই। নারী-সান্নিধ্যের কোনো মাদকতা তার নিস্তেজ দেহকে চরম পুরুষ করে তোলেনি।

অথচ পুরুষের এই মোক্ষম দুর্বলতার বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দেবার প্রয়াসেই অগ্নিপরীক্ষায় মেতে উঠেছিল পত্রলেখা। আতপ্ত কামনায় ক্রীতদাসের মতো যখন তার পায়ে ছটফট করবে চিরঞ্জীব, ভেবেছিল সেই চূড়ান্ত অবস্থায় ওকে হারিয়ে নারীর বিজয়কেতন উড়িয়ে দিয়ে প্রস্থান করবে সে। কিন্তু যে লোক উত্তেজনায় অন্ধ হয়না তার কাছে আগুনের জ্বালা নেই।

পত্রলেখার কটিদেশে আঁকড়ে-থাকা চিরঞ্জীবের একটি আঙুলও আক্ষেপে হিংস্র হয়ে উঠছে না। ওর দুটো হাতই যদি পত্রলেখার শরীরের ওপর দিয়ে স্রোতের মতো বয়ে যায় একটি মুদ্রাও অংকিত হবে না বোধকরি ওর করতলে।

কিন্তু উত্তেজনায় প্রদীপ্ত না হয়েও বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তের মতো কি কোনো পুরুষ পারে দ্বৈত সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করতে? আর যদি পারেও কোনো মেয়েই কি সেই শীতল কুতূহলকে বরদাস্ত করতে পারে?

না না না। মনের ইচ্ছাগুলি চৈত্রের দুরন্ত পবনে বৃন্তচ্যুত হবার আক্ষেপে বিক্ষোভ করে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টায় বুকের ওপর থেকে ভারি পাষাণটাকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিল পত্রলেখা।

আর ঠিক সেই সময় বিশ্রী বীভৎস স্বপ্নটা ছিঁড়ে গেল।

প্রভাতের শানাইয়ের কোলাহলে মনের যন্ত্রণাকর কলস্বরকে ডুবিয়ে মারবার চেষ্টায় একটা আনন্দঘন নেশায় নিজেকে আরক্ত করে রাখতে চাইল পত্রলেখা। আজ গোধূলিলগ্নে তার বিয়ে।

বাসর রাত্রির অভিজ্ঞতা এইরকম:

সারাদিনের উপবাসের পর খাবার মুখে দিতে গিয়ে গা বমিবমি করছিল পত্রলেখার। একটু জল খেয়ে এলাচদানা মুখে দিয়ে চুপ করে বসেছিল।

প্রভাতঅরুণ আঁচিয়ে উঠে মেয়েলী উৎপীড়নের জ্বালা সহ্য করবার চেষ্টায় স্থির হয়ে খাটের বুকে বসে।

গুঁড়ি মেরে রাত্রি এল। জমাট ঘন রাত্রি।

বাসর ঘরের ভিড় পাতলা হতে হতে একসময় মিলিয়েও গেল।

মা একলা একবার এলেন। পাথরের গ্লাসে জল রেখে ঘুমোবার উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিতে ভুললেন না।

খাটের দু'প্রান্তে দুটি প্রাণী। বিবাহের মন্ত্র তাদের একতনু একমন করে দিয়েছে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে প্রথম হাওয়া বয়ে আসছে। জানলার ধারে উঠে এল পত্রলেখা। আকাশে হালকা মেঘের আস্তরণ, চাঁদ লুকোচুরি খেলছে। ঘুম পাচ্ছে না। সারাদিনের উপোসের পর আশ্চর্য হালকা ঠেকছে নিজেকে। আর বিকারহীন।

কখন চোরপায়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রভাতঅরুণ। একটা অচেনা গন্ধ। পিঠে হাত রাখল, হাসলও একবার।

'শোবে না ?'

'আমার ঘুম পায়নি—'

'কিন্তু আমার ঘুম পেয়েছে যে !' হাসল প্রভাতঅরুণ।

ফিরল পত্রলেখা। তার মুখের ওপর প্রভাতঅরুণের মুখ। হাওয়ায় কাঁপছে ওর চোখের পাতা। শক্ত দুহাত পত্রলেখার কাঁধের ওপর।

পত্রলেখা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললে, 'চলো—'

বিছানায় চিত হয়ে শুল প্রভাতঅরুণ। মাথার কাছে বসল পত্রলেখা।

'চুলে হাত বুলিয়ে দিই—ঘুম পাবে—'

প্রভাতঅরুণ চোখ বুজে রইল। রাত্রি প্রহর গণছে।

চোখ খুলল প্রভাতঅরুণ। হাসল। 'আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে ?'

হাসল পত্রলেখা। 'তোমার ?'

ওর নরম হাতদুটো বুকের ওপর টেনে নিল প্রভাতঅরুণ। বললে, 'মেয়েদের আমি চিনি না, জানি না—আমাকে চিনতে দাও, জানতে দাও—'

চমকে উঠল পত্রলেখা। যত ভীরু, নিরীহ ভেবেছিল তত নয় প্রভাতঅরুণ। নাকি ভীরুতারই চরম বিস্ফোরণ এটি! কি জানতে চায়, কি চিনতে চায় সে। পত্রলেখাকে মানুষ বলে চিনতে কি অসুবিধা হচ্ছে ওর।

প্রভাতঅরুণ ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, 'মেয়েরা আমার কাছে বিস্ময়। অজানা অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো।'

থরথর করে কেঁপে উঠল প্রভাতঅরুণ। আর ওর কাঁপুনি যেন পত্রলেখার হাড়ে হাড়ে ডম্বরু বাজিয়ে দিল। সুতীব্র উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল প্রভাতঅরুণের রক্ত। পত্রলেখার শরীরের সব ভাঁজ গোলাপের পাপড়ির মতো একটি একটি করে খশিয়ে ি ্যে জানবে তাকে, চিনবে।

'আলোটা নিবিয়ে দিই—' পত্রলেখার গলায় বিনতি।

'না।'

'না।' খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসল প্রভাতঅরুণ।

ঘোমটা খসে পড়েছে, বুকের বসন বিছানায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

রক্তলাল সিল্‌কের জামাটার গায়ে নিবদ্ধ দৃষ্টি প্রভাতঅরুণের। 'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না—রঙের আবরণ সরাও লেখা—'

'আলোটা নিবিয়ে দিই—'

'না—'

'তোমার পায়ে পড়ি—'

'পত্রলেখা!—'

পত্রলেখার নিটোল দুটো বাহু, শাদা কাঁধ, গলার হাড়, আলোয় নিরাবরণ। সে সম্রাজ্ঞী। সামনে মুগ্ধ ক্রীতদাসের মতো নতজানু হয়ে বসেছে প্রভাতঅরুণ। যেন আর্ট-এক্সিবিশনে দেখছে কোনো ভেনাসের প্রতিমূর্তি। স্থায়িত্ব দেখছে, রঙ চিনছে। যেন তার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি বলছে, এই শেষ না আরো কিছু আছে।

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল প্রভাতঅরুণ।

চোখে ঘুম নেই পত্রলেখার। আজকের রাত্রির অভিজ্ঞতা যেন তাঁকে অনেক বিজ্ঞ, প্রবীণ করে দিয়েছে। অনেকক্ষণ মূঢ়ের মতো তেমনি করেই বসে রইল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল। আয়নায় প্রতিবিম্বিত উর্ধ্বদেহের দিকে তাকিয়ে তার চোখের পাতা পড়ল না। হঠাৎ সারা শরীরে গোপন শিরশিরানি অনুভব করল। কানের কাছে কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে। চমকে উঠল পত্রলেখা। এ যে চেনা গলা। চিরঞ্জীব! হাসছে। সতীত্ব-অসতীত্বের চুলচেরা ব্যাখ্যা। ছি ছি! অবাক হয়ে গেল সে। কি করে অচেনা একটা পুরুষের কাছে নিজেকে মেলে দিতে পারল। তার

মতো গোঁড়া, বিচারী মেয়ে। চিরঞ্জীবের কাছে যা পারেনি, কেবলমাত্র মন্ত্রের জোরে তার এতদিনকার শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি এক ফুঁয়ে নিবে গেল।

আহত স্পর্ধায় ছটফট করতে লাগল পত্রলেখা।

ওই তো আয়েস করে গভীর নিদ্রায় অচেতন লোকটা। কতদিনের পরিচয়। কী ওর জোর। কোন স্পর্ধায় সে তাকে জানতে চায় চিনতে চায়? কঘণ্টার চেনা একজন মহিলাকে সে কি করে এ প্রস্তাব করতে পারে? তবে কি চিরঞ্জীবের ফিলসফির ভূত তাকে ভর করছে? হেরে যাচ্ছে সে?

সকালে যখন নতুন আলোকে চোখ মেলল পত্রলেখা তখন মনে হল রাত্রির খোলশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে নতুন নারী। অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ। প্রবীণ। প্রাচীন।

বিবাহটা মেয়েদের জীবনে শুধু ঘর পরিবর্তন। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি আর ছোট এক ননদ এই নিয়ে সংসার।

শাশুড়ি বললেন, 'এই তোমার ঘর এই তোমার সংসার একে চিনে নাও—'

ঘর চেনে, সংসারও চেনে পত্রলেখা। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। নতুনত্ব শুধু অনুভবে। বধূর নতুনবস্ত্রে গহনায়, সিঁথির উজ্জ্বলসিঁদুরে আর হাতের নোয়ায়। কিন্তু তার মন, শরীর নতুনত্বের কোনো আমেজ বয়ে নিয়ে এসেছে কি? বিয়ের নতুনজলে ত্যাখদাখ করে বাড়েনি শরীর, মন। বাপের বাড়ির বহু প্রাচীন শরীরের শিখায় মনকে জ্বালিয়ে কেবল পরিবেশ পরিবর্তন হয়েছে তার।

'অরুণ আমার একমাত্র ছেলে, বেজায় ছেলেমানুষ। ওকে মানিয়ে চলো বউমা—'

ঘোমটার ফাঁকে বিরক্তি গোপন করতে পারেনি পত্রলেখা। ছেলেমানুষ। তবে তার বিয়ে দেওয়া কেন! নিতবর শুধু যৌবনপুষ্ট পতিদেবতার শিখণ্ডী, তাকে বিয়ে করা যায় না। যৌবধর্মে যার দীক্ষা নেই, শিশুর দুরন্ত কুতুহল যার চোখেমুখে তাকে স্বামী ভাবতে মেয়েদের বুক ভেঙে যায়। বিয়ের পাঠশালা তো খুলে বসেনি সে।

রাত্রি আসে অনেক ক্লান্তি আর গুমোটের পর নিদারুণ পীড়নের মতো। প্রভাতঅরুণের উপস্থিতিকে মনে হয় স্টেথিসকোপ হাতে হাতুড়ে ডাক্তারের মতো। এনাটমিতে যার জ্ঞান নাই, চিকিৎসাশাস্ত্রেও আনাড়ী। এ যেন

গ্রাম্য অজ্ঞলোকদের কাছে ফিজ্ আদায় করার ফিকিরে অ্যাবসেস-এ স্টেথিসকোপ চেপে বসে থাকা।

রোজ ভোরে ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠতেই কেমন বিশ্রী জ্বালাময় বিরক্তিতে মনের আকাশ ছেয়ে যায়। মনের মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে। রাত্রির ক্লান্ত শরীর বিক্ষোভ করে। যেন অসার তর্জন গর্জনের পর বৃষ্টিরিক্ত উষর মৃত্তিকা মুখ ব্যাজার করে পড়ে রয়েছে। জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে এক লহমায় চিন্তাটা খেলে গেল পত্রলেখার মনে। সে কি দৈহিক কামনা-বাসনার দাস হয়ে পড়ছে? শরীর সম্বন্ধই বড় হয়ে উঠছে তার মনে?

শরীর তো ফালতু বাড়তি ব্যাপার। শরীরের কি কোনো ধর্ম আছে!

কিন্তু···দেহে আঘাত লাগলে, কেটে গেলে সে খবর শরীরে পৌঁছে দেয় কে! মস্তিষ্ক! মস্তিষ্ক শুধু কী শরীরের অংশ না মনের আধার! তাহলে মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক তো অচ্ছেদ্য। তবে একটা প্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেয়া কেন?

আর ব্যাপারটা যদি নিছক শারীরিক তাড়না হয় তবে মনের মেজাজ এত খিঁচড়ে যাচ্ছে কেন? কেন বিরক্তিতে ভরে উঠছে সমগ্র অস্তিত্ব? একটা জট খোলবার চেষ্টায় আরো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা-রাত্রি চিন্তাটা একই বৃত্তে ঘুরপাক খায়। আর প্রতি পলকে দাম দিয়ে যেন বেঁচে থাকার অনেক ইতিবৃত্ত ধরা পড়ে। অকাল-অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, বিজ্ঞ মনে হয় নিজেকে।

সেদিন বিকেলে ননদ জয়ন্তী ছুটে এল হাঁপাতে হাঁপাতে, 'বউদি—বউদি শিগ্গির—

ভ্রূকুঁচকে পত্রলেখা জিগ্যেস করল: 'কী হয়েছে? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি?'

'নাগো। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এক ভদ্রলোক। ড্রয়িংরুমে বসিয়ে এসেছি।'

'কে? কী নাম? মাকে ডেকে দাও—'

'বারে! মা তো বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন মার্কেটিং করতে।'

'ও!'

স্লীপার পায়ে গলিয়ে নিচে নেমে গেল পত্রলেখা।

ড্রয়িংরুমের পর্দা ঠেলে ঘরে পা দিতেই চমকে উঠল, 'আপনি!'

চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এল কয়েক পা, 'বিয়ের নিমন্ত্রণ থেকে আমাকে বাতিল করাটা কী যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তোমার পক্ষে? বাড়ি থেকে ফিরে এসেই সুখবরটা পেলাম তোমার বান্ধবীদের কল্যাণে। তাইতো নিয়ে এসেছি এই সামান্য উপহার!' শাড়ির প্যাকেটটা এগিয়ে দিল চিরঞ্জীব।

প্যাকেটটা স্পর্শও করল না পত্রলেখা। বললে, 'টেবিলে রাখুন। উপহার পেলেই আমি গ্রহণ করি এ ধারণা আপনার এল কোত্থেকে?'

'মানে এইটেই তো রেওয়াজ, ভদ্রসমাজে চলাফেরা করতে হয় যখন।' হাসল চিরঞ্জীব কায়দা করে।

'ধন্যবাদ। আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।'

'ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তো আনিনি পত্রলেখা। আর অমলালয় তো কেনা জিনিস ফেরত নেয় না বলেই জানি।'

'শাড়ি দেবার লোকের কী অভাব!' বিদ্রূপে ধারালো পত্রলেখার কণ্ঠস্বর, 'আমার হাতে সময় নেই। জানেন না এটা আমার শ্বশুরবাড়ি! কাজ করতে হয়।'

চিরঞ্জীব হাসল, 'এটা তোমার রাগের কথা পত্রলেখা। আমার উপহার ফেরত দেবার মানেই আমার সঙ্গে তুমি সম্পর্ক রাখতে চাও। তার চেয়ে গ্রহণ করো এটা। তোমার পাওয়া আরো সাতটা উপহারের সঙ্গেই এটার বিশেষ অর্থ একদিন হারিয়ে যাবে।'

পত্রলেখা চুপ করে রইল।

'তাহলে নিচ্ছ তুমি এটা? বাঁচলাম—' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুস্থির হয়ে কৌচে বসল চিরঞ্জীব। 'কিন্তু কেমন আছ, কেমন লাগছে সংসার—বললে না তো?'

'কেন? আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে?'

'বাইরের দেখা কি সব পত্রলেখা?'

'ভেতরে যখন দেখতে পাচ্ছেননা তখন বাইরেতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় কি?' নিজের উপরেই যেন রেগে ওঠে পত্রলেখা, 'আচ্ছা আপনার এত কৌতূহল কেন বলতে পারেন? আপনি কি মনে করেন বিশ্বশুদ্ধ মেয়েরা আপনার ল্যাবরেটরির গিনিপিগ?'

চিরঞ্জীব সামনে পা দুটো ছড়িয়ে আরাম করে বসল, 'ল্যাবরেটরি

এনালিসিসের ওপর তোমার দুর্জয় রাগ দেখছি। প্রাণিজগতটা তো স্বর্গীয় উচ্ছ্বাস বলে কিছু নয়, পত্রলেখা। বেঁচে থাকার একটা নিয়ম আছে, আইন আছে। সে নিয়ম আছে প্রাণিতত্ত্বের জীবনধারণের প্রক্রিয়ার মধ্যেই। একটা প্রাণীর কামনা-বাসনা ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্যকভাবে জানতে হলে তার গঠনপ্রণালীকেই জানতে হবে। তাহলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া উপায় কী!'

'আপনি কি প্রাণিতত্ত্ববিদ্—', ভ্রূ কুঁচকালো পত্রলেখা।

'প্রফেশনকে আমি ঘৃণা করি। প্রফেশনাল প্রাণিতত্ত্ববিদরা কি জানে! তাদের শিক্ষার সবচেয়ে বড় অভাব সমাজবোধের। সব বিজ্ঞানই যে সামাজিক বিজ্ঞান এ জ্ঞানই তাদের নেই।'

'আপনার কথা শুনলে জ্ঞান হয়। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন আমাকে সংসার করতে হয়।'

'জ্ঞান অর্জনের কি বয়েস আছে পত্রলেখা। সে নয়। কথা হচ্ছে—'

'থাক। আপনার গলা শুকিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। একটু বসুন, আপনার চা নিয়ে আসি।'

চায়ের কথা বলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারল না পত্রলেখা। নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার সাজ-পোশাকে চেহারায় তাকে কি যত্নহীন, মলিন দেখাচ্ছে! তবে কি অন্য অর্থ ধরা পড়েছে চিরঞ্জীবের চোখে। ছি ছি, কি লজ্জা! তাড়াতাড়ি আলমারি থেকে জমকালো শাড়ি-জামা বের করল। মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিল। কপালে আঁকল খয়েরিরঙের টিপ।

সাজসজ্জা করতে করতে একবারও মনে হল না পত্রলেখার: চিরঞ্জীব কে, যার কাছে তার সুখসমৃদ্ধির খবর বড় করে জানাতে হবে!

'এস—এস। গৃহস্বামিণীর কল্যাণে ইতিমধ্যেই চা এসে পৌঁছেছে। একা বসে বসেই সদ্ব্যবহার করছি এগুলো।' চিরঞ্জীব কলরব করে উঠল।

'আপনি বিচক্ষণ লোক এ বিশ্বাস আমার ছিল।'

'কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তোমার রাজকীয় আবির্ভাবে খাবারগুলো পর্যন্ত বিস্বাদ ঠেকছে পত্রলেখা…'চিরঞ্জীবের কথার পিছনে কিসের ইংগিত ছিল। সারা শরীর রাঙিয়ে উঠল পত্রলেখার।

'না—না লজ্জা পাবার কিছু নেই। প্রসাধন মেয়েদের জীবনে স্বাভাবিক

অলংকার। তাইতো এদের নাম বিউটি-এ্যড্।' কিন্তু চিরঞ্জীবের প্রবোধ বাক্যে পত্রলেখার রক্তের দুরন্তপনা বাঁধ মানবে কেন। এ তার পরাজয়, এ তার লজ্জা। ইচ্ছে হল এক ছুটে পালিয়ে যায় ঘর থেকে, খুলে ফেলে জমকালো সজ্জা, তুলে ফেলে মুখের রঙ।

বাইরে গাড়ির শব্দ। সম্বিত ফিরে পেল পত্রলেখা, 'ওঁরা এসে পড়েছেন—' কেমন ভয়ার্ত ত্রস্ত-গলায় ফিস্‌ফিস্ করে উঠল পত্রলেখা। নীরক্ত পাণ্ডাশে হয়ে উঠল ওর মুখের স্বাস্থ্য। জয়ন্তীর মারফতে খবর পৌঁছে গেছে ওঁদের কাছে। ড্রয়িংরুমে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন শ্বশুর-শাশুড়ি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়াল। সহাস্যমুখে হাত তুলে নমস্কার করল। 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। পত্রলেখা আমার ক্লাসমেট। বিয়ের সময় আসতে পারিনি তাই অপরাধ স্খালন করতে এলাম। দেখুন না পত্রলেখা কেমন রেগেছে। কিছুতেই বোঝাতে পারিনি অপরাধ আমার নয়, বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পৌঁছতেই দেরি করেছিল।'

'বোসো বাবা বোসো। বউমা ওঁকে চা খাবার দিয়েছ তো?'

'সেদিক থেকে বন্ধুকৃত্যের অভাব হয়নি—' হাসল চিরঞ্জীব: 'আপনারা ব্যস্ত হবেন না। প্রভাতঅরুণবাবুকে দেখছিনে? ওঁর সঙ্গে আলাপ না হলে…'

'বসো। অরুণ এখনিই এসে পড়বে। ওর পোস্টিং নিয়ে ঝামেলা হয়েছে কিনা। কোথাও পোস্ট খালি নেই…' শ্বশুর হাসলেন: 'দেখো বাবা, বুড়োমানুষের যা দোষ: কথা থাকে না পেটে।'

'আপনারা যে আমাকে বাইরের লোক ভাবেননি এটা আপনাদের আন্তরিকতার প্রমাণ··' হাসল চিরঞ্জীব।

'আচ্ছা, তোমরা বসে গল্প করো। অরুণ এসে পড়বে এখনি। মালক্ষ্মী এমনিতেও তো সারাদিন বাড়িতে আটকা। পুরোনো বন্ধু পেয়ে দু দণ্ড কথা বলে বাঁচবে—'

শাশুড়ি দরজা থেকে ফিরে দাঁড়ালেন, 'বন্ধুকে রাত্রে না খাইয়ে ছেড়ো না…'

পত্রলেখা দাঁড়িয়ে পাথর বনে গেছে। কিছু যেন বুঝতে পারছে না, শুনতে পারছে না।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন বোসো।'

মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করে বললে পত্রলেখা, 'আপনি চমৎকার অভিনয় করতে পারেন! জানতাম না তো।'

গম্ভীর গলায় চিরঞ্জীব উত্তর করল, 'কথাটা তোমার অপ্রশংসার মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু, জীবনে কি অভিনয়ের কোনো প্রয়োজন নেই পত্রলেখা? যেমন একটু আগেও ছিল।'

'আপনার অভিনয় প্রতিভার জন্তে ধন্যব'দ। কিন্তু অনেক তো হল। এবার কি উঠতে হয় না আপনার?'

'সে কি! গৃহকর্ত্রীর অমর্যাদা করি কি করে। শোনোনি আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে রাতের খাবারের।'

'তাহলে আপনি যাবেন না?' ঠোঁট কামড়ে জিগ্যেস করল পত্রলেখা।

'এত করে যখন বলছ তখন যেতে পারি। তবে এক শর্তে...'

'শর্ত!' পত্রলেখার দুচোখে বিস্ময় সন্দেহ।

'হ্যা। একদিন পায়ের ধূলো দেবে গরিবের কুটিরে—'

'না।'

'অতো জোরে বোলো না। কথাটার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্তে কণ্ঠনালীতে অতোটা জোর নাইবা দিলে। তাতে কথাটার গুরুত্ব কমে।'

'আপনি কি ভয় দেখিয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন!'

'ভয়? তুমি কি আমাকে শস্তা নাটকের ভিলেন না বানিয়ে ছাড়বে না? মানুষ পশুও নয় দেবতাও নয়, মানুষই। কিন্তু, প্রভাতঅরুণবাবু ফিরতে এত দেরি করছেন কেন?'

'কেন? তাকে আপনার কি দরকার?' দাঁতে দাঁত চেপে জিগ্যেস করল পত্রলেখা।

'বারে! রাম-চরিত্র না জেনেই রামায়ণ-পাঠ হবে। আলাপপর্বটা সেরে ফেলা দরকার নয় কি?'

'আপনার সৌজন্যবোধ প্রশংসনীয়।'

'তবে কি অসৌজন্যই প্রশংসা পাবে' হাসল চিরঞ্জীব: 'তাছাড়া আমার সৎ ইচ্ছাতে সন্দেহ প্রকাশ করবার কারণ নেই। মানুষের সঙ্গে সৎ সম্পর্ক গড়ে তোলাই তো একজন ভদ্রলোকের কর্তব্য।'

পত্রলেখা নিরুত্তর।

চিরঞ্জীব সিগারেটের ধোঁয়া রিঙ করতে লাগল আপন মনে। তারপর

কৌচে দেহভার ছেড়ে দিয়ে ধীরগলায় বললে, 'অতীতকে নিয়ে তোমার এত ভয় কেন পত্রলেখা? কোন্ মানুষের জীবনে অতীত নেই! কিন্তু তাকে সিন্ধবাদের ভূতের মতো ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ানোর মতো বিড়ম্বনা আর নেই। আর তাছাড়া অতীতের কাছে কি কোনো কিছুই পাওনি তুমি?'

পত্রলেখা মৃদুগলায় জানাল: 'আপনি এলে আমার অতীতকে মনে পড়ে। মনে পড়ে কী ছেলেমানুষই ছিলাম সেদিন।'

চিরঞ্জীব হাসল, 'ছেলেমানুষ তো আমরা সকলেই একদিন ছিলাম। সেটা অপরাধ নয়। অপরাধ ছেলেমানুষিতে আটকে থাকা। প্রভাতঅরুণবাবু তো এখনো ফিরলেন না। এবার উঠতে হয়। আজকের এই মূল্যবান সন্ধ্যার জন্যে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা চাই। হ্যাঁ, একটা কথা, আমার কি মনে হয় জানো পত্রলেখা? প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতার একটা সীমা আছে, সেই সীমায় যদি বারবার আঘাত আসে তাহলে হয় তাকে সীমানা ভাঙতে হয় কিংবা নতুন কোণ খুঁজে নিতে হয়। শুভরাত্রি।'

চিরঞ্জীব আর দাঁড়াল না। লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল শুধু বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত পত্রলেখা।

চিরঞ্জীব চলে গেছে কিন্তু তার অস্তিত্ববাহী সিগারেটের তীব্র গন্ধ ভরে তুলেছে নাসারন্ধ্রকে। কতক্ষণ ঘোর ঘোর আচ্ছন্নের মধ্যে ডুবে থাকত বলা যায় না, শাশুড়ির কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল।

'তোমার বন্ধু কি চলে গেল বউমা—'

অ্যাঁ? হ্যাঁ মা। বললেন কাজ আছে: আর একদিন এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যাবেন—'

'চমৎকার ছেলে,' শাশুড়ি বললেন, 'বনেদী না হয়ে যায় না। হালফ্যাশানের ছেলেদের মতো একেবারে নয়। কোথায় বাড়ি ওদের বউমা?'

'ওয়ালটেয়ারে।'

'অত দূরে—'

'ওঁর বাবা পোর্টে চাকরি করতেন। রিটায়ার করে সেখানেই বাড়ি করেছেন।'

'বাবামা আছেন তো?'

'মা নেই, বাবা আছেন।'

'এরপর এলে কিছুতেই ছেড়ো না ওকে। যখন বউ হয়ে এলাম এই বাড়িতে শ্বশুরমশায় ডেকে বললেন: তুমি সংসারের লক্ষ্মী। দেখো একজন অতিথিও যেন এবাড়ি থেকে অভুক্ত না ফিরে যায়। মানুষ চিরকাল থাকে না, বেঁচে থাকে তাঁদের নির্দেশ…'

পত্রলেখা মৌন।

রাত্রি নামল ঘন হয়ে।

রাত্রির খাওয়া চুকিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতেই প্রভাতঅরুণ জিগ্যেস করল, 'মার কাছে শুনলাম তোমার কোন বন্ধু এসেছিলেন। কই আমাকে তো বলোনি…'

পত্রলেখা ওভালটিনের বাটি স্বামীর হাতে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'সময় পেলাম কোথায়? যাক আফসোস কি, মার কাছে তো শুনেছ।'

'বিয়ের দিন ভদ্রলোককে দেখেছি বলে মনে পড়েনা—'

'না। বাড়ি চলে যাওয়ায় তিনি আসতে পারেননি।'

'মার কাছে তো ভদ্রলোকের খুব প্রশংসা শুনলাম। খুব অমায়িক ভদ্রলোক বুঝি?'

'হ্যাঁ—'

'আক্ষেপ রয়ে গেল আমার সঙ্গে আলাপ হল না।'

'খুব ক্ষতি হল কি?' বিরক্তি প্রকাশ পেতে কেমন অপ্রস্তুত দেখাল পত্রলেখাকে। পরে সংশোধন করে নিল, 'না বলছিলাম কি, আলাপ করতে চাইলে অসুবিধা কি।'

'তাই বলো।' হাসল প্রভাতঅরুণ।

আরো রাত নামল। গভীর থেকে গভীরতর।

প্রভাতঅরুণের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল পত্রলেখা। হঠাৎ দেহ-জোড়া ক্লান্তি, আর ভোঁতা-ভোঁতা লাগছে মনটা। কিসের একটা অর্থ বুঝতে চায়, বুঝতে পারে না। একটা সন্ধ্যা, চিরঞ্জীবের হঠাৎ-উপস্থিতি যেন মনের রাজ্যে লণ্ডভণ্ড-কাণ্ড করে গেছে। বিয়ের পর যেমন নিশ্চিন্তে ভাবনার সুতো বনবে ভেবেছিল, সেই সুতোয় গিঁট বেঁধে গেছে।

সেকি খুব বেশি ভাবুক হয়ে পড়ছে! বিয়ের পর কী আশা করেছিল সে। যা সব মেয়েই আশা করে। স্বামীর নির্ভয় আশ্রয়। সে-আশ্রয় সে পেয়েছে বইকি। শ্বশুর-শাশুড়ির মতো মানুষ হয় না। তাঁদের চরিত্রের

ঘরোয়া স্বভাবগুণে বউমাকে আপনার করে নিয়েছেন। তাঁদেরই স্নেহচ্ছায়ায় তার মনের শাখাপ্রশাখাকে মেলে দিতে অসুবিধে হয়নি। পূর্ণকুম্ভের মতো স্থিতধী হয়ে পড়েছে সে। অনাবিল শান্তির মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারাতেই আনন্দ।

প্রভাতঅরুণ ছেলেমানুষ। তার ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দিতে ভালোই লাগে।

কিন্তু...চিরঞ্জীব কেন এল আবার দেখা করতে। যদি না আসত সে, কী ক্ষতি ছিল। তার অপার শান্তি সুখের মধ্যে তার উপস্থিতিটুকু বড় বেসুরো, চড়া সুরে বাঁধা। যেন তখন থেকেই পায়ের তলার জমিটুকু নড়তে থাকে, শিকড়সুদ্ধ কাঁপতে থাকে।

পরদিন নিত্যকার মতো তদ্‌বিরে বেরুবার আগে প্রভাতঅরুণ বললে, 'তৈরি হয়ে থেকো। নিউ-এম্পায়ারে ভালো বই এসেছে দেখতে যাবো।'

'সে কি করে হয়।' পত্রলেখা আপত্তি তুলল।

'কেন?'

'আজকে মার কাছে যাব ঠিক করেছি—'

'তাহলে?'

'আজ থাক। অন্য একদিন লক্ষ্মীটি—'

'আচ্ছা—।' প্রভাতঅরুণ চলে গেল।

স্বামী চলে যেতেই নিজের মনে হাসল পত্রলেখা। সত্যিই কি মায়ের কাছে যাবার কোনো তাড়া ছিল! ছিল না। তবু যাওয়াই ভালো। সিনেমা দেখার চেয়ে সেটা কি খুব কষ্টের হবে। হাই তুলল পত্রলেখা। আবার দুপুরের আলোকে মন বিরক্তিতে ছেয়ে যাচ্ছে। এক-একটি দিন যেন অনর্থক, দিদিমার রুদ্রাক্ষমালা জপার মতো বিরক্তিকর! কী করে সকাল এসে দুপুরের রোদে গলে যাবে যেন চোখ বন্ধ করে মুখস্তের মতো বলে দিতে পারে সে। চার দেয়ালের চাপে সারা দুপুর অস্বস্তির মধ্যে কাটানোর চেয়ে মার কাছে যাওয়াই ভালো।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ঘরে ফিরে এসে খাটে হেলান দিয়ে একটা বই খুলে বসল পত্রলেখা। ভালো লাগল না। উঠে জানলার কাছে এল। সুদূর নীল আকাশের বুকে সঙ্গীবিহীন একটি চিল চক্র দিচ্ছে। ভালো লাগল না। আচ্ছা, কেন সে গেল না সিনেমা

দেখতে? দুপুরে ঘুম দিয়ে ফুলো চোখমুখ নিয়ে চা খেয়ে বিকেলে গা ধুতে বাথরুমে যেতে কি খারাপ লাগত? খারাপ লাগত এলোচুল খোঁপায় বেঁধে দেহটাকে সুসজ্জিত করতে? লাগত না। হয়তো স্বাভাবিক হত। কিন্তু, ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না ভালোলাগাতে! চিরঞ্জীবকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এখানে আসতে? কোন সাহসে এল সে? না, কিছুই ভালো লাগছে না। ওই একটা কথাই যেন মন্ত্রোচ্চারণের মতো বারবার আউড়াল পত্রলেখা।

তারপর শাড়ি পালটাল, মুখে পাউডার ঘসল। কপালে সিন্দুর টিপটিও এঁকে দিতে ভুলল না। ছোট্ট মানিব্যাগটা রুমালের সঙ্গে মুঠোয় আঁকড়ে ধরল। স্লীপার পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল পত্রলেখা।

'মাআমি বাবার কাছে যাচ্ছি—'

'জয়ন্তীকে সঙ্গে দেবো?'

'দরকার নেই। ওর আবার ক্ষতি হবে।'

'শিগ্‌গির—শিগ্‌গির ফিরো বউমা—'

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল পত্রলেখা। ট্রামে, না বাসে? ট্রাম থেকে নেমে গলি পেরিয়েই বাড়ি। না। রিক্সায় যাবে।

'কোথায় যাবেন দিদিমনি?'

'সোজা চলো—'

রিক্সা ছুটল।

রাস্তা নয়, জনস্রোত নয়, দোকানপাট নয়। অন্যমনস্ক কী ভাবছে পত্রলেখা। মা কি বলবেন? একলা এলি? ওঁরা ছেড়ে দিলেন! ননদকে নিয়ে এলে পারতিস? কেমন লাগছে সংসার? যেমন লাগে, যেমন তোমার লেগেছিল! মা হাসবেন। তারপর কি করবে? মার কোলের কাছে শুয়ে পড়বে। মা আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন। বড্ড রোগা হচ্ছিস—বলবেন। পত্রলেখা হাসবে। বলবে: শ্বশুরবাড়িতে খেতে দেয় না যে! মা হাসবেন। পত্রলেখাও হাসবে। তারপর জামাই কেমন মানুষ? ওকে আসতে বলবি। বিয়ের পর তোদের একসঙ্গে দেখতে ইচ্ছে করে। বলব—উত্তর দেবে পত্রলেখা। পোস্টিং হল কোথাও? না—হবে। শরীরের যত্ন নিস। নেবো—বলবে পত্রলেখা, হাসবে।

'কোনদিকে যাব দিদিমণি' রিক্সাঅলার গলা।

'অ্যা!' তাইতো ভুল রাস্তায় এসে পড়েছে। ফিরবে? না। 'বাঁয়ে চলো।'

রিক্সা ছুটল। লোকটার পিঠ ঘেমে গেছে। কালো পিঠের ওপর সূর্যের কিরণ পিছলে যাচ্ছে।

'এই—রোকো—'। রাস্তাটা চেনা। দোতলা বাড়িটাও। রিক্সার পয়সা দিয়ে বারান্দায় উঠল পত্রলেখা। কড়া নাড়ল।

'কে?'

'চিরঞ্জীব বাবু আছেন?'

'বাবু বেরিয়ে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'তাতো জানিনে। অপেক্ষা করবেন?'

'না চলি।'

রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল পত্রলেখা। চলতে-চলতে যেন সংজ্ঞা ফিরে পেল। সে কি, কেন এসেছিল সে চিরঞ্জীবের বাড়িতে! লজ্জা, দুরন্ত লজ্জায় ছেয়ে ফেলল মন। ভাগ্যিস দেখা হয়নি চিরঞ্জীবের সঙ্গে।

রাস্তাটা একনিশ্বাসে পার হয়ে হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল। কে জানে কোথায় চিরঞ্জীব নামক বিদ্রূপটা ওঁৎ পেতে রয়েছে এখুনিই হা হা করে এসে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

'কে বউমা?'

'হ্যাঁ—'

'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে!'

'পার্স ফেলে গেছি।' বেমালুম বলে ফেলল পত্রলেখা: 'মার ওখানে যাওয়া হল না।'

'ট্যাক্সি ডেকে তো যেতে পারতে...'

'না। আর যাব না।'

নিজের ঘরে উঠে এল পত্রলেখা।

শয্যায় উত্তপ্ত অবসন্ন দেহটাকে ছুঁড়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এই তার নিরাপদ দুর্গ। এখানে থেকে কোনো মূর্তিমান উপদ্রবই তাকে লুঠ করে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু নিজের মনে এত দুর্বল, অসহায় হয়ে

পড়ল কেন সে? জোর গলায় জানিয়েছিল, কোনোদিন আর কিছুতেই যাবে না চিরঞ্জীবের বাসায়। কিন্তু সব জেদ, সব অহংকার এমন করে গলে গেল কেন।

কি দেবে, কি পাবে চিরঞ্জীবের কাছে। ওর নিরাসক্ত গবেষক দৃষ্টির সামনে কেবল তার নারী প্রকৃতি—নারীত্বকে মেলে ধরা। সে দৃষ্টিতেও আবার পুরুষের স্পর্ধা নেই। এমন নিরাভরণ নিরাবরণ জীবন-ব্যাপারীর কাছে বারবার যাওয়া অর্থহীন। হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী নয়, মন বস্তুটি তার কাছে স্নায়বিক বিকার মাত্র। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, চিরঞ্জীবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়নি।

কয়েকদিন পর প্রভাতঅরুণই বিস্মিত হতবাক করে দিল পত্রলেখাকে, 'আজ তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হল।'

'বন্ধু?' ভ্রূ কুঁচকালো পত্রলেখা।

'হ্যাঁ গো, চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে। চমৎকার লোক। ধরে নিয়ে গেলেন ওঁর বাড়িতে। এত কথা বলতে ভালোবাসেন ভদ্রলোক। আমার মতো মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে ওঁর আবেগ ছাপিয়ে উঠেছিল। সত্যি তোমার বন্ধুভাগ্যকে ঈর্ষা করতে হয়।'

'একদিনেই ভক্ত হয়ে উঠলে যে। তা মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হল কোথায়?'

'হ্যাঁ মহাপুরুষই বটে, তবে ভেক্ নেননি। আমাদের বাড়িতেই আসছিলেন, গেটে দেখা। কিছুতেই ভেতরে এলেন না, ধরে নিয়ে গেলেন ওঁর বাড়িতে।'

'আর কি হল?'

'কী আর হ'বে—' প্রভাতঅরুণ হাসল। 'তোমার যেমন কথা।'

'না। জিগ্যেস করছি, আসবার সময় আবার যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন না?'

'তা আবার করলেন না! আবার "কবে আসছি" প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে ছাড়লেন।'

'ভালো।'

'তোমার সম্পর্কে অনেক কথা বললেন…' হাসল প্রভাতঅরুণ।

চমকে উঠল পত্রলেখা, 'কী, কী বললেন?' কেমন ভীত শোনালো ওর গলা।

'বললেন: তোমার মতো মেয়ে পাওয়া যে কোনো পুরুষের ভাগ্য।'

রুদ্ধ নিশ্বাসকে আস্তে আস্তে মুক্তি দিল পত্রলেখা। কিন্তু ভয় যায় না একেবারে। শীর্ণ হাসি টেনে বললে, 'গর্বে বুক ফুলে উঠল নিশ্চয় তোমার ?'

'না', হাসল প্রভাতঅরুণ, 'পালটা জেরায় ঘায়েল করলাম ওঁকে। বললাম, ভাগ্যবান হবার অব্যর্থ সুযোগটা তাহলে আপনি ছেড়ে দিলেন কেন ? ভদ্রলোক হেরে গিয়ে প্রাণ খুলে হাসলেন। অবশ্য উত্তর দিলেন। বললেন, তার কারণ হয়তো এই হবে যে আমি ভাগ্যবিশ্বাসী নই। হেসে বললাম, বন্ধুত্ব সব সময়েই পক্ষপাতদুষ্ট। বিচারের সময় আসামীর বন্ধুর সাফাইকে আমরা গুরুত্বের মধ্যে আনিনে।'

ভেতরে ভেতরে সমস্ত শরীর কাঁপছিল পত্রলেখার। কানের দু'পাশ গরম হয়ে উঠছিল। ফাঁসা গলায় কোনো রকমে বললে, 'তাহলে সন্ধ্যাটা ভালোই কেটেছে…'

প্রভাতঅরুণ হাসল, 'সময় অপচয় হয়নি বলতে পারি। অদ্ভুত ভদ্রলোক। উজ্জ্বল ঝকঝকে কথাগুলো! যখন বলছিলেন মনে হচ্ছিল হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে। আমরা আরো দশজন কথা বলি শুধু বলবার জন্যে। হৃদয়কে মেলে ধরি ক'জন ?'

'হৃ-দ-য় !' অস্ফুট উচ্চারণ করল পত্রলেখা।

ঘুমিয়ে পড়বার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চিরঞ্জীবের কথা বলে গেল প্রভাতঅরুণ।

গায়ে আঁচল জড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল পত্রলেখা। কত রাত হবে, কে জানে। আজ চাঁদ নেই আকাশে। হঠাৎ মেঘের ডাকাতিতে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে বুঝি। অন্ধকার আকাশপটে নক্ষত্রদের চোখ কটাক্ষ হানছে।

কী বলল প্রভাতঅরুণ কথাটা ? হৃদয়। চিরঞ্জীবের হৃদয় আবিষ্কার করেছে প্রভাতঅরুণ ! হ্যাঁ, একটা আবিষ্কারই বটে। স্বামীর নিদ্রিত মুখের দিকে পলকবিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দ হাসির ঠাণ্ডা স্রোত কাঁপিয়ে দিয়ে যায় শরীরকে। এত শিশু, ছেলেমানুষ, যেন মেলা দেখে এসে তার রূপ বর্ণনা করছে প্রবীণদের কাছে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস যে হৃদয়কে খুঁজে পায়নি চিরঞ্জীবের মধ্যে, কয়েক ঘণ্টায় আলাপে তাই আবিষ্কার করে ফিরেছে প্রভাতঅরুণ। চিরঞ্জীবের হৃদয় ! অধরোষ্ঠ বংকিম হয়ে ওঠে পত্রলেখার, উষ্ণ জ্বালায় জ্বলতে থাকে চোখের ভাষা। মেয়েরা তার কাছে ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম মাত্র। দু'পাশে মেয়েদের পংক্তি সাজিয়ে এক্জিবিশন

করতেই সে ভালোবাসে। পীড়েই আনন্দ। ফুলকে কেটে ছিঁড়ে জানবার নেশায় পাগল মানুষটা। চিরঞ্জীবের যদি হৃদয় থাকত তাহলে ইতিহাস অন্য আদল নিত। একটা ভগ্ন নিশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মিশে গেল পত্রলেখার।

ইচ্ছে করে চিরঞ্জীবের মুখোশটা খুলে দিতে। সত্যিকার দাম না দিয়ে, চুরি করে সে সকলের কাছে ভালোমানুষ হবে? স্নেহ পাবে, শ্রদ্ধা পাবে? ভাবতেই জ্বলে ওঠে পত্রলেখা। চিরঞ্জীবের ফিটফাট পোশাক-আশাকের গায়ে কালির দোয়াতটা উপুড় করে দিয়ে সকলকে বলতে ইচ্ছে করে, এই-এই-ই ওর আসল রূপ। কিন্তু, সাহস জড়ো করতে পারে না সে। সন্ত তৈরি শ্রদ্ধার গায়ে এই কলংক দেখে যখন সবাই জিগ্যেস করবে, কি করে জানলে তুমি এই ওর আসল রূপ? বলবে, চেষ্টা করে জানতে হয় না—জানা যায়। কিন্তু, একথা কে বিশ্বাস করবে। সন্দেহে কুটিল হবে ওদের মুখের চেহারা।

ঘরময় অস্থির পদচারণা শুরু করে পত্রলেখা। তার ভালোত্বের বেড়াজাল পেতে পত্রলেখাকেও যেন জড়িয়ে ফেলতে চাইছে চিরঞ্জীব। সবাই যদি ওর জন্যে আসন পেতে দেয়, হাত গুটিয়ে কোথায় পালিয়ে বেড়াবে সে।

চিরঞ্জীবের প্রসঙ্গ উঠলেই পত্রলেখার সমগ্র চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সারা শরীর জ্বালা করে ওঠে। হয়তো ওর আলুগা স্বভাবের জন্যে কেমন ভীতু-ভীতু অস্বস্তি রয়েছে পত্রলেখার মনে। যে পুরুষ অতীত জানে তাকে মেয়েরা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সত্যিই কি ভয় পাবার কিছু আছে। চিরঞ্জীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরকালই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেহে ময়লা লাগেনি। মনে···? না। মনেও নয়। মনের অগোচরে পাপ নেই। চিরঞ্জীব কোনদিন কি বলতে পারবে—পত্রলেখার দুর্বলতা ছিল তার ওপর? পত্রলেখা মঞ্জুলিকা-বিনতার দলের মেয়ে নয়। তারা তো চিরঞ্জীবের পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করবার জন্যে গড় হয়ে রয়েছে। কিন্তু···

দিন কাটল। বিয়ের রঙ মুছতে-না-মুছতে দিন দিন কেমন বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল পত্রলেখা। তার মনের আকাশ শীতের মরামেঘের মতো পাণ্ডুর, বিষণ্ণ। কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই উত্তেজনা নেই। যেন চলাফেরা হাবভাব সবকিছুই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। শ্বশুরবাড়ির মহলের মধ্যে আর একটি ছোট্ট মহল গড়ে তুলেছে পত্রলেখা। একটা শক্ত নিরাপদ নিভৃতি। কাজের শেষে যেখানে অবসরের চিন্তাগুলিকে বন্দী করে রাখতে পারবে।

ছাড়াছাড়া নিস্পৃহ বিকারহীন জীবনছন্দের মধ্যেই বাঁচার নিরাপত্তা আছে ঃ সংসারের স্রোতকে সিল্কের মতো পিছলে যেতে দাও গায়ের উপর দিয়ে। কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে রাখবার চেষ্টা না-করলেই আঘাত খাওয়ার বিপদ নেই। সম্ভাবনা নেই বাড়তি দুঃখের।

কিন্তু প্রবীণের চোখকে ফাঁকি দেয়া কি এত সহজ! শাশুড়ি কাছে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'বউমা, তোমার কি শরীর ভালো নেই?'

'আমার তো কিছু হয়নি মা।'

শাশুড়ি আবার বললেন, 'নিজের মা নই বলে-ই কি আমাকে এড়াতে চাও বউমা—?'

'না মা। সত্যি বলছি আমার কিছু হয়নি।'

প্রভাতঅরুণ এলে শাশুড়ি বললেন, 'হ্যাঁরে অরুণ, তোর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান হবে না। মেয়েটা বাড়িতে একলা থাকে। ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসতেও তো পারিস।'

প্রভাতঅরুণ হাসে, 'বউমা বুঝি তোমার কাছে নালিশ করেছে?'

'নালিশ করবে কেন? আমি কি বুঝতে পারিনে।'

'তোমার বউমা যদি বেড়াতে যেতে না চায় আমি কী করতে পারি?'

'তোর যেমন কথা। নিয়ে যেতে চাইলে আর যাবে না কেন। এই বয়েসেই তো বেড়াবে। নইলে আমার মতো গিন্নি হয়ে আর কি বেড়াবার সুযোগ পাবে, না সে মন থাকবে?'

'না মা। আমার ভালো লাগে না।' পত্রলেখা ভয়ে ভয়ে বললে।

শাশুড়ি ধমক দিয়ে উঠলেন। তুমি চুপ করো বউমা। তোমার মতো বয়েস আমারও একদিন ছিল। আমি জানি, কোন্ বয়েস কি চায়। আচ্ছা এক কাজ করনা অরুণ, তোর পোস্টিংএর তো দেরি আছে, যা না বাইরে কোথাও চেঞ্জে, শরীরমন দুইই তাজা হবে।'

'আচ্ছা, দেখি।'

দুতিনদিন পর প্রভাতঅরুণই খবরটা ঠোঁটে করে নিয়ে এলো।

'মা—ওমা—চিরঞ্জীববাবু খুব করে ধরেছেন ওয়ালটেয়ারে ওদের ওখানে যাবার জন্যে। তুমি কি বলো?'

'কিন্তু ওঁদের কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

'উনি তো বলছেন হবে না…'

'তাহলে তো ভালোই। তোরা দুজনে যেমন আনাড়ী, বিদেশ-বিভুঁয়ে কোথায় থাকবি, কোথায় খাবি ভাবতে-ভাবতে আমারই শরীর খারাপ হত…। বউমাকে গিয়ে বল।'

ছাদে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল পত্রলেখা, পেছন দিক থেকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল প্রভাতঅরুণ।

'তুমি কতক্ষণ ফিরলে!' চমকে উঠে হাসল পত্রলেখা।

'চমকে উঠলে কেন?'

'বারে! চমকাবো না! আমার ভয় করে না?'

'ভয়! নিরাপদ ছাদে দাঁড়িয়ে ভয়ের চিন্তা! তুমি হোপ্‌লেস।' হাসল প্রভাতঅরুণ। 'বলোতো তোমার জন্যে কি সুখবর এনেছি?'

'পোস্টিং হয়েছে—এই তো?'

'গোল্লায় যাক পোস্টিং। আজ না হয় কাল হবেই। তার চেয়েও সুসংবাদ।'

'কি, শুনি?'

'শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। বখশিশ?'

'দেবো।'

'এখুনি।'

'না। রাত্রে।'

'তবে শোনো। আমাদের চেঞ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা। কবে রওনা হবে বলো?'

'তোমার সঙ্গে চেঞ্জে যাওয়া! তবেই হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে এক ফোঁটা জয়ন্তীও তোমার চেয়ে কাজের। পৃথিবীতে মায়ের আঁচল ছাড়া কি কিছু চেনো তুমি?'

প্রভাতঅরুণ গম্ভীর গলায় বললে, 'চিনি। তোমার কোল।'

'অসভ্য! খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে—লজ্জা করে না।'

প্রভাতঅরুণ বললে 'বিদেশে আমার মতো আনাড়ীর হাতে যাতে না পড়তে হয় তাই সঙ্গে অভিভাবকের ব্যবস্থা থাকবে।'

'কে?' পত্রলেখার দু'চোখে কুতূহল।

'চিরঞ্জীববাবু।'

'সে কি! কোথায় যাচ্ছি আমরা। চিরঞ্জীববাবু আমাদের সঙ্গে যাবেন কেন?' আকুল গলায় বললে পত্রলেখা।

'আমরা যে ওয়ালটেয়ারে তাঁর বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করছি।'

'না না। সে কি করে হয়।' হঠাৎ সবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠল পত্রলেখা।

'কেন? ভদ্রলোকের আন্তরিকতাকে অবিশ্বাস করবার কারণ কি? তাছাড়া একেবারে অজানা কেউ নন, তোমার বন্ধু··· ।'

'কারুর গলগ্রহ হওয়া কি ভালো?'

'গলগ্রহ! একে গলগ্রহ বলবার কারণ কি! চিরঞ্জীববাবুর ওপর তোমার অনর্থক রাগ। আমরা না গেলে তিনি কি ভাববেন, বলতে পারো?'

ছাদ ছাড়িয়ে সুমুখের বাড়িঘর রাস্তা পার হয়ে আকাশটা যেখানে নারকেল গাছের আড়ালে ভেঙে পড়েছে পৃথিবীর বুকে—শক্ত আঙুলে কার্নিশ আঁকড়ে উত্তেজনা চাপবার চেষ্টায় নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল পত্রলেখা সেই দিগন্তের দিকে চেয়ে। না, উত্তেজিত হবে না সে। উত্তেজনার মুখে অর্থহীন কথাগুলি বেরিয়ে আসছে। দুর্বল যুক্তিগুলি ছাপিয়ে চিরঞ্জীবের প্রতি তার তীব্র বিদ্বেষই উলংগ হয়ে পড়ছে। তার মনের গোপনকে অনাবরণ করে দিচ্ছে সে। মাথার ভেতরটা যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চায়। দৃঢ়হাতে চেপেধরা কার্নিশের গায়ে আঙুলগুলো যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠবে। কোথায় পালাবে, কোথায় যাবে পত্রলেখা। মুখের রেখা শক্ত হয়ে এল তার। আর লড়াই করতে পারে না। আকাশের চন্দ্রাতপের তলায় নিজেকে অনেক ক্ষুদ্র, অনেক অশক্ত মনে হলো পত্রলেখার। তারপর বুক উপচানো বেদনা ঠেলে রাখবার চেষ্টায় যেন কান্না চাপতেই খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল গমকে গমকে, ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠল শরীর। তারপর হাসি চেপে প্রভাতঅরুণের দিকে স্পষ্ট ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দস্যি মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'কী বোকা বাপু তুমি! রহস্যও বোঝো না?'

'রহস্য।' প্রভাতঅরুণকে বিব্রত দেখাল। 'তোমরা মেয়েরা নিজেরাই তো অফুরন্ত রহস্য। দয়া করে আর ধুনোর গন্ধ ছড়িয়ো না। তাহলে কবে যাবে, বলো?'

'বারে। যেদিন খুশি। কালই যেতে পারো।' মুখ টিপে হাসল পত্রলেখা।

চিন্তিত মুখে নিচে নেমে গেল প্রভাতঅরুণ।

আর সে চলে যেতেই হাওয়ায় উড়ে এসে চোখে ধুলোবালিই বোধহয়

পড়ল পত্রলেখার। খচখচ করে উঠল চোখ। জ্বালা—জ্বালা। তারপর যন্ত্রণাকে সহ্য করবার অক্ষমতায় ঝাপসা হয়ে উঠল দৃষ্টি। আকাশ সরে গেল। দিগন্তের নীল কলঙ্করেখা গেল বিলীন হয়ে। দুচোখে রইল শুধু সমুদ্রের ফেনিল উচ্ছ্বাস। পত্রলেখা নির্জন ছাদে দাঁড়িয়েই সমুদ্রের আস্বাদ পেতে লাগল। লোনা লোনা। তপ্ত। উর্মিল।

তারপর একহপ্তা ধরে তোড়জোড়। এটা সেটা। বোঝা হালকা করবে ভেবেও বোঝা বাড়ে। মেয়েরা নিজেরাই বোঝা,—যখন স্থানান্তরে যায় তখন একটা আস্ত সংসারই যেন ঘাড়ে নিয়ে যেতে ভালোবাসে। কাটছাঁট করেও মালের যা বহর হল বুকিং করা ছাড়া পথ নেই। স্টেশনে গিয়ে মাল বুক করাও হল। পরের দিন মাদ্রাজ মেলে যাত্রা শুরু।

এ কদিন পত্রলেখার নিজস্ব কোনো চিন্তা নেই। তাদের বাইরে পাঠাবার জন্যে সারা বাড়ি যেভাবে মেতে উঠেছে নিজেকে নিয়ে চিন্তার জাল-বোনা এ সময় চরম স্বার্থপরতা। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বাপের বাড়িও যোগ দিল—গঙ্গার সঙ্গে পদ্মার যোগ সাজসে যে বিপুল প্রবাহ শুরু হল তার সামনে কুটোর মতো ভেসে গেল পত্রলেখা। যত মানুষ তার দ্বিগুণ উপদেশ। প্রবাসগমনের ব্যাপারে যাঁর যতখানি অভিজ্ঞতার ঝুলি, সব উজাড়। লক্ষ্যকে ছাপিয়ে উপলক্ষ্যের তেরো হাত বহর। সমুদ্রস্নানে ইতিপূর্বে যাঁরা ঠোকর খেয়ে অভিজ্ঞ হয়েছেন তাঁরা এই সুযোগে এই অর্বাচীন যুগলের ওপর যথারীতি কর্তব্য নির্দেশ করতে ভুললেন না। হাঁটুজলে কাকস্নান সেরোনা, তাহলে ব্রেকারের ধাক্কায় বারবার বালিতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। গলাজল এগিয়ে যেও, ব্রেকার এলে হয় ডুব দেবে, আর নাগর দোলার আরাম যদি পেতে চাও ব্রেকারের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিও। মাদ্রাজীরা নারকোল তেলে রান্না করে, সর্ষের তেল পাওয়া যায় না মোটে, প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে, তবে গরম গরম যদি খাও কিছু খারাপ লাগবে না। জাতিতত্ত্ব—ভাষাতত্ত্বেও কেউ কেউ কেতাবী বিদ্যা পরিবেশন করলেন। বিশাখাপত্তম্ অংশে তেলুগু প্রধান, তামিল কি কানাড়ীভাষীও কিছু আছে। জলকে বলে নীলু, দেশলাই আগুপেটি অর্থাৎ অগ্নিপেটিকা। আর ওখানকার লোকজন যা ইংরেজি বলে হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরবে, তবে গুণী বটে, চমৎকার ক্ল্যারিওনেট বাজায়।

ছেঁড়া-ছেঁড়া অস্পষ্ট যার যতকিছু অনুভূতি কালের প্রহর পেরিয়ে আজ

পর্যন্ত স্মৃতি হয়ে টিকে ছিল, সব বলা হল। সময় পেলে আরো বোধকরি বর্ষণ হত। কিন্তু···দুয়ারে রথ হাজির। গুরুজনদের প্রণাম করল পত্রলেখা।

'ভালোভাবে থেকো মা—'

মাথা নাড়ল পত্রলেখা।

গাড়িতে উঠল পত্রলেখা। উঠল প্রভাতঅরুণ। ওর বাবাও স্টেশনে সী-অফ করবার জন্যে এলেন। চিরঞ্জীব স্টেশনেই অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। গাড়ি ছাড়ল।

গাড়ির দোলায় সহসা একটা প্রশ্ন নিজের মনের মধ্যেই খচ করে বেজে উঠল পত্রলেখার। আচ্ছা রামায়ণে সীতা যখন চতুর্দশ বৎসর বনবাসের জন্যে রামের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন তখন, তখন কি অমঙ্গলের কোনো ছায়া তাঁকে পীড়িত করেছিল? আভাস দিয়েছিল যে একদিন রাক্ষসরাবণের হাতে তাঁকে নিগৃহীতা হতে হবে?

প্ল্যাটফর্মে সহাস্য মুখে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল চিরঞ্জীব। ভিড়ের মধ্যে ওর চোখে চোখ পড়তে কেমন যেন শিরশির করে উঠল পত্রলেখার বুকের ভেতরটা। তেমনি ছিমছাম সাহেবী পোশাক। দীর্ঘ যষ্টির মতো ওর দেহটা। জনারণ্যের মধ্যে বনস্পতির আকারে শোভা পাচ্ছিল। অবাক হয়ে যায় পত্রলেখা। একটু রোগাটে হওয়া ছাড়া বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন হয়নি চিরঞ্জীবের। মুখের হাসি, ঠোঁটের ভাঁজ শারীরিক প্রতিটি ভঙ্গি পর্যন্ত অনেকপড়া পুঁথির মতো পরিচিত। অনর্গল বকবার প্রতিভা চিরঞ্জীবের সহজাত। কী আশ্চর্য, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছে ওর কথা। পৃথিবীতে কি এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নেই যে ওর আবেগকে এক পলকে পাথরচাপা দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারে? প্রভাতঅরুণ পর্যন্ত নিঃশব্দ স্মিতহাস্য সংগত করে যাচ্ছে চিরঞ্জীবের কথার পিঠে।

এতগুলো মানুষের তুলনায় স্পর্ধায় বীর্যে যেন গগন চুম্বন করেছে চিরঞ্জীবের মাথা। অত্যন্ত বিশ্রী রকমের খর্ব, খণ্ড, ভগ্ন দেখাচ্ছে ওর আশেপাশের মানুষদের। শ্বশুরমশায়কে, প্রভাতঅরুণকে, বাবাকে। সবাইকে।

অথচ ইচ্ছে করলে এখুনি কি পারে না পত্রলেখা শাখাপল্লবিত চিরঞ্জীবের অস্তিত্বকে বৃক্ষের মতো ধূলিলুণ্ঠিত করে দিতে? পারেনা তার ভদ্রলোকের পেলব আবরণ খসিয়ে দিতে? পারে। কিন্তু, কি করে হবে? সবাই

যাকে শ্রদ্ধায়-স্নেহে-প্রীতিতে মহাপুরুষ করে তুলেছে, সেই মূল্যমান থেকে চিরঞ্জীবকে নামিয়ে দিলে পত্রলেখার নিজের মান বাড়েনা কিছু।

প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির কাঁটা সময়ের দূরত্ব মাপছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় এবার উঠে পড়ে সকলে।

চিরঞ্জীবই আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে বিছানা ছড়িয়ে দিল কোণের দিকে বাংকে। পত্রলেখার শয্যা। পাশাপাশি একটা বাংকে ভাগাভাগি করে প্রভাতঅরুণ ও চিরঞ্জীব। কামরায় আরো একজোড়া দম্পতি উঠেছেন, ইউরোপীয়ান। আছেন একজন বাঙালী। মাদ্রাজী যুবকও রয়েছেন জানলার ধারে পাইপ মুখে।

লাউডস্পীকারে থেকে-থেকে বামাকণ্ঠে ঘোষণা আসে। প্ল্যাটফর্মের নম্বর, গাড়ি ছাড়ার সময় জারী। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন প্রভাতঅরুণের বাবা। জানলায় দাঁড়িয়ে পুত্র বিদায় সম্ভাষণ জানাবার চূড়ান্ত সময়ের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ ত্রস্তব্যস্ত কয়েক পা এগিয়ে গেলেন প্রভাতঅরুণের বাবা। 'এদিক-এদিক।' তাঁর চিৎকারের সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে প্ল্যাটফর্মে ছুটে আসতে দেখা গেল প্রভাতঅরুণের মাকে।

'শিগগির-শিগগির, নামতে বলো অরুণকে—'

প্রভাতঅরুণ দ্রুত ছুটে নেমে পড়ল।

হাঁপাতে-হাঁপাতে হাতের হলদে টেলিগ্রামের কাগজখানা প্রভাতঅরুণের হাতে তুলে দিলেন মা, 'তোমরা বেরিয়ে যাবার পর এই টেলিগ্রামখানা দিয়ে গেল পিওন। পত্রপাঠ তোমাকে জয়েন করতে বলেছে কৃষ্ণনগরে...'

সমস্ত আয়োজন যখন প্রস্তুত, হঠাৎ এই টেলিগ্রামের গোলমালে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সবকিছু।

ঘড়িতে চার মিনিট।

প্রভাতঅরুণ দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'ট্রেনে যখন চেপেছি ফিরে যাওয়ার মানে হয় না। জয়েনিং টাইম অ্যালাউ করতে ওরা বাধ্য। ঠিক আছে। সাতদিন পরেই জয়েন করব।'

তিন মিনিট ঘড়িতে।

প্রভাতঅরুণের বাবা এমনিতেই নার্ভাস মানুষ, আরো ভীত হয়ে

পড়লেন। প্রথম চাকরি। পোস্টিংও কলকাতার কাছে কৃষ্ণনগরে। এরপর কোথায় ঠেলে দেবে বালুরঘাট কি মালদা। না বাপু, চাকরিতেই জয়েন কর আগে।'

কামরার মধ্যে পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রয়েছে পত্রলেখা। এই মুহূর্তে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে পারলে বাঁচত সে। কিন্তু, চুপ করে বসে ডাকের অপেক্ষায় স্থির হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। একবার শুধু চিরঞ্জীবের মুখটা দেখতে ইচ্ছে করল, ওর মুখের ভাবনাগুলি পড়তে ইচ্ছে করল। কিন্তু চিরঞ্জীবও বোধকরি আকস্মিক ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

প্রভাতঅরুণের মা বললেন, 'বউমাকে তাহলে নামতে বল।'

শেষ পর্যন্ত প্রভাতঅরুণই পাকা মাথার পরিচয় দিল। আর একমিনিটও দেরি নেই গাড়ি ছুটতে।

প্রভাতঅরুণ বললে, 'লেখার আর নামবার দরকার নেই। চিরঞ্জীববাবু তো সঙ্গেই যাচ্ছেন। ওরা চলে যাক। আমি কালই কৃষ্ণনগরে জয়েন করে হপ্তাখানেক ছুটি নিচ্ছি। কয়েকটা দিনও তো থাকতে পারব ওয়ালটেয়ারে।'

দুরন্ত কানাড়িয়ান এঞ্জিন তখন হুইশল দিয়েছে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল।

'চিরঞ্জীববাবু আপনি উঠে পড়ুন—'

'অ্যাঁ।'

গাড়ি তখন স্টার্ট দিয়েছে। ঘাবড়ে গিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে দরজায় উঠে পড়ল চিরঞ্জীব।

'পৌঁছেই চিঠি দিয়ো বাবা। আমরা চিন্তায় থাকব।' প্রভাতঅরুণের মা চিৎকার করে বললেন।

জানলার ধারে কয়েকটা কথা ফিশ্ ফিশ্ করে ছড়িয়ে দিল প্রভাতঅরুণ, 'মন খারাপ করে থেকো না। আমি পরশুই স্টার্ট করছি।'

কুলিকামিন হকার-ভেণ্ডারে-ব্যস্ত প্ল্যাটফর্ম চোখ থেকে মুছে গেল। পিছনের কলরব, হৈ চৈ হারিয়ে গেল নিমেষে। নিথর নিষ্কম্প কোলের ওপর হাতদুটো জড়ো করা। জানলার বাইরে অপসৃয়মান গাছগাছালি, মেঘ, ধোঁয়া, রোদের রঙ—কিছুই চোখে পড়ল না, কোনো কিছুরই যেন অর্থবোধ হল না পত্রলেখার। স্বপ্ন না মায়া, না মতিভ্রম। তারপর সন্ধ্যার আকাশ-চিরে যেমন একটি দুটি নক্ষত্র ফুটে ওঠে তেমনি করে আবার যেন

চেতনা ফিরে এল। বাস্তব সম্পর্কে অবহিত হল পত্রলেখা। বিস্ফারিত দৃষ্টি কামরার মধ্যে ফিরে এল। ওধারে বাঙালী দম্পতি, ইউরোপীয়ান কাপ্‌ল। মাদ্রাজী যুবকটি প্লে এণ্ড পাসটাইম খুলে বসেছে। মুখোমুখি বাংকে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখা চিরঞ্জীবের আধখানা মুখের চেহারা। কি ভাবছে চিরঞ্জীব? সেও কি হঠাৎ-দুর্বিপাকে হতভম্ব হয়ে পড়েছে? ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন আবিল কুয়াশাকে সরাচ্ছে দুহাত দিয়ে? শান্ত সমাহিত হয়ে এরপর কি বলবে সে? কেমন দেখতে হবে ওর মুখের কারুকার্য? কান্না নয়, আর্তি নয়। কেমন নিরুত্তেজ নিষ্প্রভ লাগছে নিজেকে। যেন্ নিষ্ঠুর নিয়তির হাতের ক্রীড়নক মনে হচ্ছে তাকে। যে-ভয়টা হৃদয়ের মধ্যে এতক্ষণ আকুলি-বিকুলি করছিল, সেই ভয়টাই বিরাটাকার দৈত্যের মতো জড়িয়ে ধরল তার সর্বাঙ্গ। আর, কি আশ্চর্য, অনাগত সে-ভয়টা সত্যি সত্যি আগত হলেও ভয়ের কোনো শিহরণ বোধ করল না পত্রলেখা।

'চা খাবেন, ফ্লাস্‌কে রয়েছে?' প্রথম কথা পত্রলেখাই শুরু করল।

'অ্যাঁ।' ঘাড় ফেরাল চিরঞ্জীব।

এই মুহূর্তে পত্রলেখার মনে হল: প্ল্যাটফর্মের ভিড় ছাপিয়ে চিরঞ্জীবের বৃষস্কন্ধ অস্তিত্বটুকু কেমন খর্বিত ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। বাংকে বসা ওর শক্ত কাঁধটা যেন অনেক নুয়ে কুঁজো হয়ে পড়েছে।

চিরঞ্জীব শীর্ণ গলায় জানাল: 'খাব।'

চায়ের বাটিতে কর্মনিপুণ পত্রলেখার আঙুলগুলি কেমন আগুনের ইশারায় মতো দেখাচ্ছে। আংটির পাথরটা কোনো শ্বাপদের চোখের মতো জ্বল জ্বল করছে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসে। একটা সিগারেট ধরাল চিরঞ্জীব। কিন্তু, কেন এমন হচ্ছে? কেন দুর্বল, অশক্ত হয়ে পড়ছে সে?

কেন পত্রলেখা আপত্তি করল না, কেন নেমে পড়ল না ট্রেন থেকে! ও যদি বলে, সামনের স্টেশনেই ওকে নিয়ে নেমে যেতে পারি। ফিরতি গাড়িতে আবার কলকাতায়। কিন্তু, কিছুই কেন বলে না পত্রলেখা।

'চা খান।'

'তুমি?'

'আমি এখন খাব না।'

পত্রলেখা কেন ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে। ও চোখে কি

ভৎর্সনা? ও কি বলতে চাইছে, 'এই আমি চেয়েছিলাম।' না। কখনোই না। ওটা ভদ্রতা, বেড়া বেঁধে আব্রু-দেওয়া। না না।

'কী ভাবছেন?'

'না। কিছু না।' চিরঞ্জীব হাসবার বিকৃত চেষ্টা করে বললে, 'ভাবছি তোমার কষ্ট হবে।'

'কেন?' পত্রলেখা হাসল, 'আমার কষ্ট দূর করতে তো আপনি রইলেন।'

'না। প্রভাতঅরুণবাবু আসতে পারলেন না, তাই—'

'তাতে আপনার কষ্ট হ'তে যাবে কেন। বারে মানুষ! সে কষ্ট তো আমার।' পত্রলেখা হাসল না ব্যঙ্গ করল?

'অবশ্য দুদিন পরেই উনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন...'

'আমার ভাবনায় আপনার শরীর খারাপ হবে দেখছি।'

আর কোনো কথা পেল না চিরঞ্জীব। এক লহমায় সবাক বক্তৃতাপ্রবণ লোকটা কেমন বোকা বোবা হয়ে গেছে। কিন্তু বোবা তো থাকছে না মস্তিষ্কের ভেতরটা। একটা অস্থিরতা। দমবন্ধ ভাব। যেন পাঁকে ডুবে যাচ্ছে গলা পর্যন্ত শরীরটা। সমস্ত কার্যকারণ বিচার করে তার সিদ্ধান্তই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। পত্রলেখাকে চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। সত্যিই কি পত্রলেখার সঙ্গে তার এই ভ্রমণ আকস্মিক ব্যাপার? পারত না কি মেয়েটা বাধা দিতে? পারত না স্বামীর সঙ্গেই ট্রেন থেকে নেমে পড়তে? নাকি কুমারী জীবনের মতোই অন্য স্পর্ধায় দৃপ্ত সাহসিক হয়ে পড়েছে পত্রলেখা! সহজ স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় আরো জটিল হয়ে পড়েছে মনের জগতটা।

পত্রলেখার হাসির জলতরঙ্গে সম্বিত পেল চিরঞ্জীব, 'আপনি মুখটা এমন করে আছেন, অন্য যাত্রীরা ভাববে আপনি আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো চিরঞ্জীব পত্রলেখার দিকে। তার মনের প্রতিবিম্ব কী মুখে এসে পড়েছে? কেন, কেন পত্রলেখা এমন উপমা দিল! হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু এমন ঘটনা ঘটবে, কে জানত। তার কী গুপ্ত হাত ছিল এ-ঘটনা ঘটাবার! না। পত্রলেখা যদি এ কথাই ভাবতে পারে, তাহলে বলুক না কেন সে, আমি সামনের স্টেশনেই ওকে নিয়ে নেমে যাচ্ছি। যাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দিতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই। আর তা যদি না করবে তাহলে চিরঞ্জীবকে ঠেস দিয়ে

এমন বাক্যবাণ ছোঁড়বার কি তাৎপর্য থাকতে পারে? যা ভাবতে চায় না, সেই মিথ্যা ভাবনাতেই কেন তাকে ভাবিত করে তুলবে। পত্রলেখা বন্ধু, পরস্ত্রী। এ সীমানা লঙ্ঘন করবার কোনো অভিলাষই নেই তার।

'এই কিন্তু বেশ হল…' পত্রলেখা ফ্লাস্কটা ঝুড়ির মধ্যে রাখতে রাখতে বললে।

'কি?'

'বাড়ির লোকের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে সব সময় মনে হয় যেন বাড়িতেই আছি।'

চিরঞ্জীব যেন সাহস ফিরে পাচ্ছে। বললে, 'বেড়ানো তাহলে বাইরের লোকের সঙ্গেই ভালো…'

'নয়? আপনিই বলুন। বাইরে বেরিয়ে যদি বাইরেকেই না পাই তাহলে আনন্দ কোথায়?'

চিরঞ্জীব হাসল।

'হাসলেন যে?'

'হাসি পেলে দোষ কি। মনের মতো সঙ্গী পেলে, মানে প্রভাতঅরুণ বাবুর কথা বলছি, বেড়াতে খারাপ লাগবে কেন?'

'প্রভাত একটা হোপ্‌লেস। বাইরে বেরিয়েও সে নির্ঘাত একটা ঘর গড়ে তুলবে।'

'ঘর গড়ে তোলাই তো মেয়েদের একমাত্র কাম্য।'

'আবার ঘর-গড়া-মেয়েরাই ঘর ভাঙে।'

কথাটা হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই বললে পত্রলেখা, চিরঞ্জীব অস্বস্তি বোধ করল। তবু, আলোচনাকে চালিয়ে যাবার জন্যেই সবাক হল, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না পত্রলেখা। মেয়েরা ঘর ভেঙে আর এক ঘরেই আসে।'

'জানি না। হয়তো আপনার কথাই ঠিক।' পত্রলেখা হাই তুলল। 'গাড়িতে উঠলেই আমার ঘুম পায়।'

'বেশ তো। আমি ততক্ষণ এই ম্যাগাজিনটার ওপরে চোখ বুলোই।'

বালিশে মাথা রেখে পাশ ফিরে পত্রলেখা আবার বললে, 'আপনার বাড়িতে আমাকে একলা দেখে নিশ্চয়ই ওঁরা আশ্চর্য হবেন।'

চিরঞ্জীব হাসল শুধু। ম্যাগাজিনটা টেনে নিল হাতের ওপর।

মাদ্রাজ মেল ছুটেছে। কামরাটা এবার দিবানিদ্রার আমেজে ঝিমোচ্ছে। পত্রলেখা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

এক বর্ণও মগজে ঢুকছে না চিরঞ্জীবের। মস্তিষ্ক প্রদেশে এক ঝাঁক ভোমরা ভীষণ গুঞ্জন শুরু করেছে। মুখের কাছ থেকে ম্যাগাজিন সরিয়ে একবার পত্রলেখার দিকে চোখ রাখল। গালের কাছে বাঁ হাত রেখে পত্রলেখা ঘুমোচ্ছে। সত্যিই কি সে ঘুমিয়েছে? ঘুমোতে পেরেছে কী সে! এমন নিশ্চিন্ত স্বস্থির হল কি করে। সে কি বুঝতে পারছে না চিরঞ্জীব জেগে আছে, আর সময় পেলেই ওর নিদ্রিত শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে ভুল করবে না সে? চিরঞ্জীবকে কি জানে না পত্রলেখা? মেয়েদের শরীরকেই শুধু চিনতে চায়, স্বীকার করতে চায়। মন-অতিরিক্ত দেহ। সেই সন্ধ্যার স্মৃতি। ভেসে ওঠে চোখে। অনেক স্থূল পরিচয় জানে চিরঞ্জীব। ওই গ্রীবাদেশ, কপোল, চিবুক একগুচ্ছ সিল্কের মতোই ওই দেহকে মুঠোয় বন্দী করা যায়। পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে যে নিখুঁত হাতছানি, যে রহস্য স্মৃতিকে আলুথালু করে দেয়, নিরাসক্ত নির্বিকার অনুসন্ধিৎসায় চুলচেরা বিচার করতে চায় চিরঞ্জীব।

কিন্তু, জানা হয়নি। সব জানা হয়নি। প্রাণিবিশেষের খোলসের গায়ে থাকে তার অনুভূতি, তার বোধ। নারীর শরীরের খোলসে কি লুকিয়ে আছে, তার সত্তার কী গভীরতা! তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। শরীর কি মন্দির, না বিগ্রহ? মেয়েদের যে-শরীরটা তার মনকে বুদ্ধিকে ছাপিয়ে ওঠে সেটা কি স্থূল জিজ্ঞাসা? সেটা কি শুধু জৈবিক, না প্রাণীন।

একটা ক্ষুধার্ত জিজ্ঞাসায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে চিরঞ্জীবের চোখ। আর সেই সময় সে নিজেকে মনে করে নিরাসক্ত বিজ্ঞানী, নিরাবেগ অসামাজিক। তার পৃথিবী তখন শূন্য হয়ে এক ল্যাবরেটরির আকার নিয়েছে। যুক্তির টেস্টটিউব হাতে পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাগল চিরঞ্জীব।

একটা সিগারেট ধরাল সে।

জংশন স্টেশনে এসে গাড়িটা থেমে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নামল চিরঞ্জীব। প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর এখানে অপেক্ষা করে গাড়িটা। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল চিরঞ্জীব। কি যেন ভাবছে। দুপুরের রোদ বিকেলের তরলতায় ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। এলোমেলো হাওয়ায় চুল কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দ্রুত পদচারণা করতে করতে

ভাবতেই থাকে চিরঞ্জীব। কুলিটার দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছু জিগ্যেস করল। তারপর ওভারব্রীজ পেরিয়ে স্টেশনের গেট ছাড়িয়ে খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় সোজা নেমে পড়ল সে। একটু জোরেই পা চালাল। কুলির কথা ঠিক। সামনেই পোস্ট আপিস। কাউন্টারে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্রহাতে টেলিগ্রামের ফর্ম চেয়ে নিয়ে কী লিখল, স্ট্যাম্প আঁটল, তারপর ফর্মটা তুলে দিয়ে রসিদ নিয়ে বেরিয়ে এল। চিরঞ্জীবের মুখ দেখে মনে হয় যেন অদ্ভুত কিছু একটা ঘটে গেছে।

আবার প্ল্যাটফর্ম। পদচারণা।

পত্রলেখা এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। হাসল চিরঞ্জীব। ঢেউয়ের মতো ঠোঁট কেঁপে উঠল। সিগারেট ধরাল আবার। ঘুমোও, তুমি ঘুমোও পত্রলেখা। ঘুমের নদীতে স্নান করে নতুন প্রভাতে পরিপূর্ণ হয়ে নতুন হয়ে জেগে ওঠো। সে নতুন অনুভূতিকে নদী নেই, সব নদী সাগরে মিশে সাগর, নিরবধি তরঙ্গ উথালপাতাল, তরঙ্গের লহরে লহরে নৃত্য করো, তোমার দেহের ইচ্ছা বাসনা তরঙ্গের আবেগে তরঙ্গিত হোক।

পরদিন দুপুরে ওয়ালটেয়ার স্টেশনে গাড়ি থামল।

চিরঞ্জীবের পিছনে নামল পত্রলেখা। তার চোখে হাজারো বিস্ময়। এরই নাম ওয়ালটেয়ার স্টেশন—এমন নিরাভরণ, শূন্য! মন দমে গেল পত্রলেখার। সমুদ্র কই! নদীদেখা বাঙালী-কন্যার চোখ সমুদ্র-বিস্ময় নীল হয়ে উঠল কই! তাম্রাভ আকাশ। রোদের বর্ণালী।

'এই যে দাদাবাবু। বেশ বাহাদুর ছেলে! বলা নেই কওয়া নেই। এস, এস মা লক্ষ্মী।'

চিরঞ্জীব পরিচয় করিয়ে দিল। 'জলধরদা—ছেলেবেলায় এই বুড়োটাই আমাকে মানুষ করে তুলেছে-কথাবার্তা দেখেই বুঝতে পারছ—একেবারে নবাব বাহাদুর।'

পত্রলেখা হাসল।

'চলো—চলো বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

'বাবা এলেন না?' চিরঞ্জীব জিগ্যেস করল।

'তুমি হুট করে এমন কাণ্ড করবে জানলে কর্তা কি আর তীর্থে যেতেন! এই তো সবে পরশু রামেশ্বর রওনা হয়েছেন।'

গাড়ি ছুটল মেন রোড ধরে। মহিষের পিঠের মতো পীচ-মসৃণ রাস্তা।

ট্রাম নেই, বাস নেই। কৌতূহল, ব্যস্ততা নেই। মোড় ঘুরল গাড়ি। পথ হয়ে এল সংকীর্ণ। পাশাপাশি গলাগলি সেকেলে পুরানো বাড়ি। রাস্তাটা পার হতেই দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল পত্রলেখার। কোথাও কি বৃষ্টি নেমেছে? নাকি সমবেত কলধ্বনি? শব্দটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। আর একটু পরেই দু'চোখে তীব্র কৌতূহল—বন্যার বেগে উপছে পড়ল পত্রলেখার। বীচরোডে পড়েছে গাড়িটা। বাঁ দিকে অনন্ত অপার নীল। নীলের সমুদ্র। উঁচু উঁচু ব্রেকার বারবার ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে ফেনায়। আর দুরন্ত ক্ষোভে গর্জন করে উঠছে জলরাশি। দূরে, অনেক দূরে হলদে পাল-তোলা জেলে নৌকা ঢেউয়ের আড়ালে এক-একবার হারিয়ে যাচ্ছে। পার থেকে দূরে দরিয়ায় একটা জাহাজ নোঙর করে বন্দরের কাল গুনছে। সামনে ওটা কি? প্রকাণ্ড পাহাড়টা হুমড়ি খেয়ে পড়ে জলের আয়নায় মুখ দেখছে। জাগ্রত প্রহরীর মতো লাইটহাউস। সতর্ক দৃষ্টি। ধূসর পাহাড়ের কোলে উপত্যকা আর উদ্যানের সবুজ উদ্ভিদগুলি নরম কার্পেটের মতো দেখাচ্ছে। ব্যাকওয়াটার। পাশ দিয়ে গভীর খালের সীমা চলে গেছে বিশাখাপত্তম বন্দরের দিকে।

বাঙলোটাইপ দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামলো।

হঠাৎ এই দুরন্ত সামুদ্রিক বাতাসে পালখাটিয়ে কোথা থেকে যেন শব্দের তরী ভেসে এল। শানাইয়ের শব্দ। কনসার্ট পার্টি বসেছে গেটের সামনে। ফুলে-লতায় বাড়িটা রূপসী সেজে উঠেছে।

বিস্ময়, কেবল বিস্ময়।

বন্ধুর জন্যে, পরস্ত্রীর জন্যে যে এমন আয়োজন করতে পারে চিরঞ্জীব, কে ভেবেছিল! ছি ছি, কী লজ্জা। পত্রলেখার মুখ লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে। মাথার ওপর ঘোমটা ভালো করে তুলে দেবার চেষ্টায় আরো ব্রীড়াবনত দেখাল পত্রলেখাকে।

উঁচু সিঁড়ি ভেঙে ওদের বাড়িতে উঠতে হয়।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সুবেশ ভদ্রলোক কয়েকজন। এগিয়ে এল চিরঞ্জীবের দিকে। করমর্দন করে জানাল স্বাগতম্। পত্রলেখার দিকে করজোড়ে নিবেদন করল অভিনন্দন।

চিরঞ্জীবের পায়ে-পায়ে উঠে এল পত্রলেখা।

শতগুণ বিস্ময়ে লজ্জায় তখন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সে। চিরঞ্জীব যে তাদের

অভ্যর্থনার জন্যে এমন রাজকীয় ঘটা করে রাখতে পারে, ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে। কেউ তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। সব প্রশ্নের উদ্যত চিহ্নকে যেন বুক দিয়ে আগলে রেখেছে চিরঞ্জীব।

কারুর মনে কোনো কৌতূহল নেই; কেন পত্রলেখার স্বামী এলেন না, কেন মেয়েটা একলা এল! কবে আসছেন তাহলে প্রভাতঅরুণ। না কারো মনে কোনো অস্বাভাবিকতার লক্ষণ নেই। যেন এইই স্বাভাবিক। যেন চিরঞ্জীবের সঙ্গে একলা আসাটাই ঠিক হয়েছে।

অপরিচয়ের ঘোর কাটবার পর জলধর তাকে ঘরে বিশ্রাম করতে বলে চলে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল পত্রলেখা। কিন্তু এত ফুল কেন? খাট-পালঙ্ক ড্রেসিংটেবিলে এমন করে ঘর সাজিয়েছে কেন? বাসি-বিয়ের ফুল তো শুকিয়ে গেছে। এখনও কি স্বামীস্ত্রীর মনে ফুলশয্যার স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চিরঞ্জীব চায়? তাদের দ্বৈত-ভ্রমণ-পর্বে হানিমুনের মিষ্টি আমেজ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা নাকি?

সহাস্যমুখে চিরঞ্জীব ঘরোয়া পোশাকে ঘরে এল, 'আমাদের এই মাদ্রাজী আয়াটিকে প্রয়োজনে তোমার কাজে লাগবে। ওর নাম প্যারাম্মা'।

'কিন্তু এসবের মানে কি?' বিরক্তির ভান করে জানতে চাইল পত্রলেখা।

'আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওটা জলধরদার ডিপার্টমেন্ট। আর তাছাড়া, খুব খারাপ লাগছে কি?'

'এতটা বাড়াবাড়ি কার সহ্য হয়!'

'প্রভাতঅরুণ বাবু কিন্তু খুব খুশি হতেন...'

'ততদিন কি ফুলের শোভা থাকবে? শুকিয়ে যাবে না?'

'ফুল শুকোয় বলেই কি শোভা অর্থহীন পত্রলেখা? ফুল তো মানুষের মনে।' হাসল চিরঞ্জীব।

পত্রলেখা ভ্রূ-ধনু তুলে বলে, 'মানুষের মনকে আপনি বিশ্বাস করেন?'

চিরঞ্জীব বললে, 'বিশ্বাস নাইবা করলাম। কাব্যি তো করা যায়। কিন্তু আর কথা নয়। তুমি আমার সম্মানিত অতিথি। খানিক বিশ্রাম করে নাও। প্যারাম্মাকে বললেই তোমার স্নানের ব্যবস্থা করে দেবে।'

'ধন্যবাদ।'

'এখুনি ধন্যবাদ দিলে পরে দেবার আর কিছু থাকবে না। কাজেই ওটা আপাতত বন্ধ থাক।' হাসতে হাসতে প্রস্থান করল চিরঞ্জীব।

বিকেলে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সারাক্ষণ এই বাসর-স্মৃতিবাহী ঘরখানা যেন ঠাট্টার মতো লাগছে। ঘরে বসে থাকতে-থাকতে মনের ভেতর কী একটা ঠেলে ঠেলে উঠছে। নিরবয়ব শূন্যতা। সমস্ত পরিবেশ যেন এক পুরুষের অবর্তমানে ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর খাটের নরম শয্যায় গা মেলে দিয়ে মনে হচ্ছে; এখুনি সেই বাঞ্ছিত পুরুষটি এসে পড়বে। চিন্তায় ফুলগুলি জমে জমে পাথর, মুহূর্তগুলি নিরেট, যন্ত্রণাদায়ক। তার চেয়ে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

চিরঞ্জীবের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বীচরোড ধরে সোজা এগিয়ে চলল। বিকেলের রক্তমেঘের আলোয় বিচিত্রবর্ণ এবার সমুদ্র। রামধনুর সপ্তরঙের বাহার ছুটেছে সমুদ্রের বুকে। কোথাও লোহিত, পিংগল, কোথাও নীল, সবুজ। ব্রেকারের শেকলে-বাঁধা বন্দী তরঙ্গ ক্রীতদাসের মত একঘেয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করে চলেছে। হাওয়ায় দুরন্ত খেপামি। চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, মন উড়ছে। ভালো লাগছে। হাঁটতে-হাঁটতে সেই উঁচু পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল দু'জন।

'পাহাড়ে উঠবে?' চিরঞ্জীব জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ—'

খাল পেরিয়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ। ভয় করছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। পা টিপে টিপে যেন আসন্ন পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে চলল পত্রলেখা। এবার পাহাড়ের চুড়োয়। এবার দৃষ্টিপথে সমুদ্র তার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য মেলে ধরল। জল, জল আর জল। পাহাড়টা মাথা হেঁট করে যেন সমুদ্রকে ছুঁয়েছে। ছুঁতে পেরেছে?

চিরঞ্জীব বললে, 'এর নাম ডলফিন্‌স নোজ্। ডলফিন্‌স মাছের নাকের মতো পাহাড়টা সমুদ্রকে ছুঁয়েছে বলে এই নাম। আর ওই যে কবরটা দেখছ, ওটা আলফোঁস সাহেবের কবর।'

পিছন ফিরে দেখাল চিরঞ্জীব—চার্চ হিল, সিন্ধিয়া শিপইয়ার্ড, ডক। পাহাড়ের ওপর থেকে ছবির মতো ফুটে উঠেছে ছোট্ট শহর। নারকেল গাছের বর্ডারে শহরকন্যার মুখের আরতি।

'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চলো এবার নামি।'

সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণার্থীদের ভিড়। লাউডস্পীকারে শুভলক্ষ্মীর ভজন। ফেরবার সময় মেনরোড ধরে এগোল ওরা।

'কফি খাবে?'

'চলুন—'

বাড়িতে যখন ফিরল ওরা সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। বাড়ির সামনে লনে কয়েকটা বেতের চেয়ার। এখানে থেকে নিচে সমুদ্রকে দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে জলরাশি এবার গাঢ় কৃষ্ণ। ফসফরাসের চোখ জলছে। আকাশে লঘুডানা মেঘ। হু হু হাওয়ার প্লাবন।

সারা বিকেলের ব্যস্ততার পর নীড়েফেরা পাখির মতো ক্লান্ত অবসন্ন পত্রলেখা। দু'দুটো নির্জন নিঃসংগ রাত্রি। তারপর আসবে প্রভাতঅরুণ। কি ভাবছে এখন মানুষটা? প্রভাতঅরুণের অজস্র দুর্বলতা ভীরুতা ছেলেমানুষি সত্ত্বেও এখন, এই মুহূর্তে, তার সঙ্গ-লিপ্সায় আতুর মন পত্রলেখার। হঠাৎ মনে পড়ল, চিরঞ্জীব তাদের নিরাপদে পৌঁছোনোর সংবাদ টেলিগ্রাম করে দিয়েছে তো?

রাত্রে ঘুমোবার আগে আর একবার দর্শন দিল চিরঞ্জীব, 'যদি মনে করো প্যারাম্মা তোমার ঘরে বিছানা করে রাতে থাকতে পারে—'

'না। দরকার নেই।'

'তাহলে শুয়ে পড়ো। গুডনাইট। রাত্রে দরকার হলে আমার ঘরে নক্ করতে পারো। আমি পাশের ঘরেই আছি।'

'না। দরকার হবে না।'

পরের দিনের অভিযানে লসনস্‌বে, অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি, সীমাচলম্‌। আর বাড়ির কাছে কিংজর্জ হস্‌পিটাল।

সারাদিনের উত্তেজনার পর দেখার নেশা জুড়িয়ে গেলে আর কি থাকে। লন থেকে চোখ মেলে দাও—অনন্ত জলধি—ছান্দসিক তার ওঠানামা, তার গোঙানি। যদি চোখ বুজে পড়ে থাকো মনে হবে দূরে থেকে কোথায় যেন বৃষ্টির নূপুর ধ্বনি উঠেছে। টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে শিকড়ে—সচকিত শিকড় ভাঙা ঘুম শাবকের মতো আধফোটা চোখ মেলে অপুষ্ট ডানা ঝাপটাবার প্রয়াস করছে।

চিরঞ্জীব এসেই আবার বেরিয়েছিল যখন ফিরল আকাশে তখন পূর্ণচাঁদের

মায়া। সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত, জ্যোৎস্নার গলিত-সোনা রঙ। মনে হচ্ছে একখণ্ড লিরিক-কবিতা।

চিরঞ্জীব এল সারাগায়ে জ্যোৎস্নার পরাগ মেখে। 'কেমন লাগছে ?'

'ভালো।'

'কিন্তু জ্যোৎস্নার চাদর মুড়ে এখন যে সমুদ্রকে ভদ্র পেলব দেখাচ্ছে, আসলে ওটাই ওর সর্বনাশী রূপ। এই রকম এক জ্যোৎস্নার রাত্রিতে এক ইউরোপীয়ান দম্পতি কারুর নিষেধ না শুনে ডলফিনস্ নোজের চূড়োয় উঠেছিল। তাদের মাথার ওপরে আকাশ, পায়ের নিচে পাহাড়। পাতাল আর সমুদ্র সব জ্যোৎস্নার কারিগরিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সে যে কী বিস্ময়—অপার্থিব উন্মাদনা! বিদেশিনী তন্বী তখন জ্যোৎস্নার বিপুল সৌন্দর্যে আকুল হয়ে উঠেছেন। পাখির মতো গান গাইতে-গাইতে নাচতে-নাচতে তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছেন পাহাড়ময়। সেই গানই তার সোআনসঙ হবে, কে জানত! পার্থিব বন্ধন দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব কিছু তার চোখ থেকে মুছে গেছে তখন। তিনি নিজেই এক সমুদ্র-সত্তা হয়ে গেছেন। আর সাহেবের চোখের সামনেই নাচের মুদ্রা তুলে গান গাইতে-গাইতে তরুণী ডলফিনস্ নোজের চূড়ো থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অতল সমুদ্রগর্ভে…'

আতংকে ভয়ার্ত চিৎকার তুলল পত্রলেখা। থরথর করে কাঁপছে শরীর। যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা। তারপর কোনো রকমে চাপা গলায় জিগ্যেস করল : 'আর সাহেবটার কি হল ?'

চিরঞ্জীব ছোট্ট উত্তর দিল, 'সাহেব সেই থেকে পাগল হয়ে গেলেন ?'

পত্রলেখা নির্বাক, নিস্পন্দ। চিরঞ্জীব ওর পিঠে হাত না রাখলে বোধহয় সম্বিত ফিরে পেত না সে। কিন্তু হঠাৎ এ-কাহিনী চিরঞ্জীব কেন বলল। তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে কি ? সমুদ্র-জ্যোৎস্না দেখে সত্যিই কি মানুষ এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়। ভয়ার্ত চোখ মেলে সমুদ্রের ওপর দৃষ্টি রাখল আবার। জ্যোৎস্নার শুভ্রচাদরে মোড়া যে-সমুদ্রকে এখন একগুচ্ছ লিরিক কবিতার মতো লাগছে তার পিছনে এমন ভয়াল হাতছানি।

চিরঞ্জীব আবার বললে, 'মানুষের প্রকৃতি ওই সমুদ্রের মতো। ভয়ংকরতা ছাড়া সৌন্দর্য নেই। গোলাপের কাঁটার সার্থকতা সেখানেই…। আজ, এই মুহূর্তে সমুদ্র যদি তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ওঠে—পারো তাকে উপেক্ষা করতে ?'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পত্রলেখা তাকাল চিরঞ্জীবের দিকে। জ্যোৎস্নার রঙ ওর দীর্ঘ শরীরকে রঙিন করে তুলেছে। ব্যাকব্রাস চুলে জ্যোৎস্নার ঢেউ, চোখে মুখে জ্যোৎস্নার সম্মোহন। ওর শাদা শাদা দাঁতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'পারো কি বাধা দিতে জ্যোৎস্নার আহ্বানকে?' চিরঞ্জীব ফের বললে, 'পারো না।'

ধড়মড় করে উঠে পড়ল পত্রলেখা, 'চলুন, ভেতরে যাই—'

চিরঞ্জীব হাসল, 'চলো—'

নিজের ঘরে ফিরে এসে ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল পত্রলেখা। সারা শরীরে এক উত্তেজনার ঢেউ তাকে খেপিয়ে তুলেছে। ওর মুখের চেহারা দেখে মনে হবে: এইমাত্র তার শাস্তির রায় দিয়ে শাস্তিদাতা বেত আনতে গেছেন! ভয়ে-আতংকে নীল হয়ে উঠল পত্রলেখা। এতক্ষণ সমুদ্রের মুখোমুখি বসার প্রতিক্রিয়াই বোধহয় এটা। ভয়টা যেন তার নিজের মধ্যেই, নিজেকে নিয়েই। দরজাটা বন্ধ করে দেবে। নিজেকে আটকে রাখবে এই দুদিন যতদিন না তার রাজপুত্র প্রভাতঅরুণ এসে মুক্ত করে নিয়ে যায়!

সময় কাটে। দীর্ঘ প্রহর। চিরঞ্জীব আসে না। এল না। হঠাৎ অনেক আক্ষেপের পর তার সর্বাংগ যেন ভিজে শীতল হয়ে এল। খাটের ওপর পত্রলেখা মূৰ্ছিত অবশতনু। ঘুম আসছে। বাইরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে—দূরাগত অস্পষ্ট সংগীতের লহরের মতো শব্দ ভেসে আসছে। ঘুম।

রাত্রে আর কিছু খেল না পত্রলেখা।

অনেক—অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসল পত্রলেখা। কী রকম এক গুমোট প্রদাহে সর্বাংগ জ্বালা-জ্বালা করছে। কানের দু'পর্দা যেন গরম লাগছে। আর চোখদুটো ব্যথা-ব্যথা। দু'হাতে আঙুলগুলিকে বন্দী করে ভূতগ্রস্তের মতো ঘরজোড়া পায়চারি শুরু করল সে। কেমন এক নিরেট শূন্যতা মস্তিষ্ককে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

কেন এমন হল? ড্রেসিং টেবিলে নিজের প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করল সে। চোখদুটো কী ফুলেছে? চোখের কোণে গভীর ক্লান্তির কালি। ঠোঁট এত টকটকে লাল দেখাচ্ছে কেন, নাকি ঘুমঘোরে কখন ঠোঁটে কামড় দিয়েছে! খোঁপা-ভাঙা কালো চুলের অরণ্য ছড়িয়ে পড়েছে দুই গাল বেয়ে, আলুথালু

বেশবাসে কেমন অশ্লীল নোংরা দেখাচ্ছে তাকে। বুকে থেকে উঠে আসা শক্ত খশখশে কেমন এক অনুভূতি আটকে গেছে গলার ভেতরে। শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজোবার চেষ্টায় আরো উগ্র উৎকট দেখাল তাকে।

জানলার সামনে দাঁড়াতে সাহস পেল না পত্রলেখা। সেখানে সমুদ্র অসীম সৌন্দর্যের আড়ালে কুৎসিত হাতছানি দিচ্ছে। চিরঞ্জীবের চোখে সেই সমুদ্রের প্রতিবিম্ব, 'পারো তুমি সমুদ্রের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে?' পারি-পারি-পারি। পত্রলেখার সবাক মস্তিস্ক যেন প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে স্পর্ধিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যে মন রয়েছে গভীর প্রত্যন্ত প্রদেশে, সে মন বলে, 'হয়তো পারিনে।' অসার রুগ্ন বিবর্ণ সত্যর চেয়ে জীবন-সত্যকে স্বীকার করাই ভালো।

কত রাত হবে, কে জানে! কখন ঘুমিয়ে পড়েছে পত্রলেখা। একবার বোধহয় জলধর এসেছিল রাতের খাবারের কথা বলতে। যায়নি। মাথা নেড়ে বলেছিল, 'খিদে নেই।' ঘুম ঘুম সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে কেবল ওই টুকুই মনে আছে পত্রলেখার। তারপর আরো রাত হয়েছে। আরো ঘুম। চিরঞ্জীব কি খোঁজ নিতে এসেছিল একবার? না। কিন্তু…

দরজাটা ভেজানো। বাইরে থেকে কি মনে হতে পারে দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে পত্রলেখা। কিন্তু একবার ঠেলা দিলেই তো খুলে যেতো দরজা।

দরজাটা দুহাতে মেলে ধরল পত্রলেখা। ভেতরের বারান্দাটুকু এখন নির্জন। মূর্ছাহত। অন্ধকার। লোমশ, কালো। চোখে উৎসুক দীপ জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে। অতলান্ত সমুদ্রের কৃষ্ণতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফসফরাস-জ্বলা চোখ নিয়ে কেউ কি হেঁটে আসবে সময়ের সিঁড়ি পার হয়ে।

সামনে চিরঞ্জীবের ঘর। রুদ্ধদরজার আড়ালে মানুষটা কি সত্যিই ঘুমিয়ে এখন? সমুদ্র তাহলে নীরব হয়েছে। হয়েছে। কিন্তু, কান পেতে এখনো তো সোচ্চার সমুদ্র-ভাষা শুনতে পাচ্ছে সে। এগিয়ে গেল পত্রলেখা। দরজাটা কি ঠেলবে, টোকা দেবে? না, ভেতর থেকে বন্ধ। আওয়াজ করলে হয়তো বেরিয়ে আসবে চিরঞ্জীব। কিন্তু কী কথা বলবে তাকে? দেহের ওপর ওর নির্লিপ্ত নিরুত্তেজ দৃষ্টি সহ্য হবে না পত্রলেখার। জমে পাথর হয়ে যাবে। বড় ভয়ংকর, ক্রুর সে।

আরো কিছুক্ষণ ওর বন্ধ দরজায় মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইল পত্রলেখা। তারপর টলমল করতে করতে ফিরে এলো নিজের ঘরে।

পরদিন আরো কতক্ষণ পত্রলেখা ঘুমোত, বলা যায় না। চিরঞ্জীবের ডাকে ঘুম ভাঙল। ইশ! কত বেলা হয়েছে! জানলা টপকে রোদ আলপনা এঁকে দিয়েছে মেঝেয়।

'চট করে তৈরি হয়ে নাও, আজ তোমার ঘরেই ব্রেকফাস্ট সারতে হবে। লনে রোদ ছেয়ে গেছে।'

গতরাত্রের কথা ভেবে হঠাৎ সর্বাংগ লজ্জায় শিহরিত হল পত্রলেখার। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল চিরঞ্জীবের দৃষ্টির সামনে দিয়ে। মানুষের জীবনে এমন দিশেহারা রাত্রি যেন না আসে। ছি ছি! সকালের তরুণ আলোকে মনে জোর পেল পত্রলেখা। নিজেকে অপাপবিদ্ধ শুচিস্নিগ্ধ মনে হল।

'রাত্রে কি ঘুম হয়নি তোমার?' ঘরে পা দিতেই চিরঞ্জীবের জিজ্ঞাসা। পত্রলেখা চিবুকের জল মুছতে মুছতে জ্বালাময় বড় বড় চোখে তাকায় চিরঞ্জীবের দিকে। দুচোখে অবিশ্বাস, সন্দেহ। সব জেনে, সব বুঝে কি ঠাট্টা করছে চিরঞ্জীব? নাকি তার দুর্বলতা আবিষ্কার করেছে? ব্যাধের দৃষ্টিতে জালে আটকা হরিণের মতো পত্রলেখার দুর্গতি দেখে পরিহাস করছে? সকালের আলোয় আবার সাহস জড়ো হয়েছে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণার মতো শোনাল ওর গলা, 'কেন? ঘুম হবে না কেন?'

চিরঞ্জীব হাসল, 'না এমনি জিগ্যেস করছিলাম।'

চায়ের বাটিতে দুধ ঢালল চিরঞ্জীব, লীকার ঢালল। তারপর জিগ্যেস করল, 'তোমার চায়ে ক চামচ চিনি দেবো?'

চিনির বাটি টেনে নিল পত্রলেখা।

টোস্টে কামড় দিয়ে চিরঞ্জীব বললে, 'আজ সকালে কি প্রোগ্রাম?'

'কোনো প্রোগ্রাম নেই।'

'আমি একটু বেরোব লসনস্‌বে'র দিকে। ফিরতে দেরি হতে পারে। অপেক্ষা না করে খেয়ে নিও।'

পত্রলেখা কোনো উত্তর করল না।

উঠতে-উঠতে চিরঞ্জীব বললে, 'মন খারাপ করে থেকো না। কাল সকালেই প্রভাতঅরুণবাবু এসে পড়বেন নিশ্চয়।'

'ওঁর জন্যে আপনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়!' এক্স-রে চোখে তাকাল পত্রলেখা। দৃষ্টি তীব্র।

চিরঞ্জীব হাসল। 'আসার কথা যখন আছে তখন সে নিঃসন্দেহ থাকা কি ভালো নয়?'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তাই।'

দুপুরটা আলস্যের আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ হল পত্রলেখার। হাই তুলে, চুল খুলে, চুল বেঁধে সময় কাটাল। তারপর একসময় স্নান সেরে নিল।

জলধর খবর নিতে এল, এখন পত্রলেখা খাবে কিনা।

'বাবু আসুন—'

জলধর দাঁড়িয়ে রইল।

'কিছু বলবে?'

জলধর ইতস্তত করল। তারপর বললে, 'ছাখো মা, আমি বুড়ো হয়েছি। তোমাদের কালের হালচাল আমি কিছু জানিনে। তব একটা কথা না বলে পারছিনে। তোমরা দুজনে এত ঝগড়া করো কেন?'

'ঝগড়া।'

'হ্যাঁ মা। খোকাকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। ওর মা যখন মারা যায় তখন ও সাত আট বছরের। তখন থেকে ওকে চিনি, জানি। একালে ওর মতো ছেলে মেলে না।'

'কিন্তু…এসব কথা আমাকে বলছ কেন?'

'শোনো কথা! তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব। তুমি আপনার জন। বড়ো হলেও এখনো চোখের মাথা খাইনি মা। মানুষ কতদিন বাঁচে, কিই-বা করতে পারে। চোখের সামনেই তো এই সংসারকে দেখলাম! ঝগড়া করে যদি জীবনের এই ক'দিনের আয়ু কেটে যায় তাহলে—'

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জলধরের দিকে চেয়ে রইল পত্রলেখা কি বলতে চাইছে, কি বোঝাতে চাইছে জলধর! সে কি জানে, কতদূর জানে তাদের পরিচয়ের। ওর কথায় সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতরে। আপনজন বলতে কী মনে করেছে সে! সে কি জানে না আমি পরস্ত্রী, চিরঞ্জীবের বন্ধু ছাড়া আর কিছু নই! তবে কি তার সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ককে ঘোলাটে করে, সাতকাহন বানিয়ে বলেছে চিরঞ্জীব তার

জলধরদাকে ? পত্রলেখাকে নিয়ে তামাশা করেছে, মজা করেছে। কি কুৎসিত, কি স্থূল ইয়ার্কি। রাগে আপাদমস্তক রি-রি করে উঠল পত্রলেখার। যাকে পারেনি নিজস্ব করে নিতে, তার সম্পর্কে রঙিন গল্প ফাঁদতে সম্ভ্রমে বাধেনি চিরঞ্জীবের ! আসুক, আসুক একবার চিরঞ্জীব। প্রভাতঅরুণ পৌঁছবার আগেই এ ব্যাপারে পরিষ্কার হতে হবে।

সারা দুপুর ফিরল না চিরঞ্জীব, বিকেলেও নয়। ফিরল রাত্রে খাবার সময়।

'আপনার সঙ্গে কথা আছে—' বললে পত্রলেখা।

'আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত···সকালে বোলো।'

'না। আজ রাত্রেই।'

মুখ বুজে খাওয়াদাওয়া সেরে নিল দুজনে। খাওয়াদাওয়ার পর চিরঞ্জীব গেল নিজের ঘরে। পত্রলেখা প্রস্তুত হয়ে বসল নিজের ঘরে। এলোমেলো অন্যমনস্ক চিরঞ্জীব এলো ওর ঘরে। রাত এখন কত হবে, কে জানে।

চিরঞ্জীব ঘরময় অস্থির পদচারণা শুরু করল। খদ্যোতের মতো জ্বলছে মুখের সিগারেট। দেয়ালে ওর দীর্ঘ ছায়া নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। কী ভাবছে, কী চিন্তা করছে চিরঞ্জীব ? পত্রলেখার উদ্যত জিজ্ঞাসা যেন ওর অস্থির হাবভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

বাইরে সমুদ্রের আওয়াজ ভেসে আসছে। এলোমেলো হাওয়ায় ঘরের জানলা-পর্দা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তগুলি দমবন্ধ। ভারি রোড-লেভেলার যেন ঘর্ঘর শব্দে ছুটে যাচ্ছে ঘরের মাঝখান দিয়ে। হঠাৎ কি ফিরে দাঁড়াল চিরঞ্জীব। দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এলো পত্রলেখার দিকে। তারপর জলদমন্দ্র স্বরে স্পষ্ট বলল সে, 'তুমি ঠিক শুনেছ পত্রলেখা। জলধরদা তোমাকে যা বলেছে বর্ণে বর্ণে সত্যি···'

'মানে ?'

'ট্রেনে আসতে আসতে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে মনে আছে ? হ্যাঁ, সেই সময় একটা জংশন স্টেশনে গাড়ি থামতে আমি নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। একজন কুলিকে জিগ্যেস করতে সে জানাল স্টেশনের বাইরেই পোস্টাপিস। তোমাদের ওয়ালটেয়ার রওনার খবর আমি আগে দিতে পারিনি বাড়িতে। কেন আমার শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল তুমি কিছুতেই আসবে না। টেলিগ্রাম করতে চাইলাম সেই স্টেশন থেকে। কিন্তু লিখতে বসে হঠাৎ লিখলাম, "সস্ত্রীক রওনা হচ্ছি। স্টেশনে গাড়ি ঠিক রেখো"।

মাথায় বাজ পড়লেও এত চমকাতো না পত্রলেখা। 'আপনি—আপনি আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন?'

'দিয়েছি। আর এখানে সবাই তাই জানে।'

এক লহমায় বিবর্ণ পাংশু হয়ে উঠল পত্রলেখার মুখ। ভয়ে আশংকায় থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। মূর্ছাহত দেহটা বোধহয় আছড়ে পড়বে মোজাইকের ওপর, তার আগেই ধরে ফেলল চিরঞ্জীব। ওর বাহুবন্ধনের মধ্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল পত্রলেখা, চূর্ণ হচ্ছিল তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সৎ-অসত্তের দ্বন্দ্ব। 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে। আপনি পশু, আপনি নীচ।' রাগে যন্ত্রণায় অপমানে কটিদেশ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল পত্রলেখার। মনে হল মসৃণ মোজাইকের ওপর ওর পা দুটো নৃত্য করে উঠেছে, তারপর মোজাইক থেকে পা সরে গেলো, নাচের তরঙ্গটা পৃথিবীর সংস্পর্শ হারিয়ে শূন্যে আকাশের বুকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কটিদেশ ছাড়িয়ে আবক্ষ লহরিত হল দেহভঙ্গি। 'কী চান, কী চান আপনি আমার কাছে?' তরঙ্গের আবেগে তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ডলফিনস্ নোজের চুড়ো কাঁপছে, ইন্দ্রের ভয়ে মৈনাক এখুনি সমুদ্রতলে ডুব দেবে। এমনি করে নাচতে-নাচতে রাজহংসীর মতো ডানা মেলে দিয়েছে তন্বী শ্বেতাঙ্গিনী, বায়ুস্তরে ভাসতে-ভাসতে একসময় ডুব দিয়েছে সমুদ্র-গভীরে। সে কি যন্ত্রণা—না আনন্দ? 'না না। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে।' আকাশটা অন্ধকার হয়ে আসছে, চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে কে পুরু পর্দা, হাওয়ার ঠোঁট কে টিপে ধরেছে। ল্যাবরেটরির টেস্টটিউবের সামনে বিজ্ঞানীর ধ্যান-নিমগ্ন দৃষ্টি। এক-একটি পাপড়ি খশিয়ে, ছিঁড়ে-ছিঁড়ে তন্নতন্ন করে প্রাণিতত্ত্বের আবিষ্কারের নতুন তোরণ খুলে দেবে সে। ত্বক যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয় হয় তাহলে ত্বক স্থূল আবরণ হবে কেন শুধু! ইন্দ্রিয় তো চৈতন্য, সংজ্ঞা! নারীর মানসিক প্রকৃতির রহস্য এখানেই নিহিত। যোগীর তন্ময়-দৃষ্টির প্রখর আলোয় ভয়ে চোখ বন্ধ করল পত্রলেখা।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল পত্রলেখার। ফ্যালফ্যাল চোখ মেলে তাকাল ইতস্তত। কিছু বুঝতে পারছে না। সব কি স্বপ্ন না মায়া। তারপর দুর্বল শরীরে উঠে দাঁড়াল পত্রলেখা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চোখের তারা-দুটো ঘুরতে লাগল বনবন করে। আর হঠাৎ, সকালের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে গমকে গমকে ফুলে ফুলে হেসে উঠল পত্রলেখা। একটানা, দীর্ঘ। প্যারাম্মা

ছুটে এল, জলধর ছুটে এল। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই পত্রলেখার। এক নাগাড়ে খিল্ খিল্ করে হেসে চলল সে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো।

কেবল চিরঞ্জীব রইল না এর সাক্ষী। সে ভোরবেলায় বেরিয়ে গেছে গুরুতর কাজে।

সকাল গলে দুপুর। ঘড়িতে দশটা বেজে গেল। কিন্তু একবারও কি মনে করতে পারল পত্রলেখা যে আজ সকালেই প্রভাতঅরুণের পৌঁছনোর কথা। ওয়ালটেয়ার স্টেশনে মাদ্রাজ মেল এতক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রী নামল, যাত্রী উঠল। প্রভাতঅরুণও নিশ্চয়ই আছে যাত্রীদের সঙ্গে। প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে সে হয়তো খুঁজছে কোনো গাড়ি, অভ্যর্থনা করবার লোক। লোক হয়তো আসেনি। একটা ঝটকা নিজেই ডেকে নিল প্রভাতঅরুণ। ঠিকানা তো জানা। বীচরোড চলো। ঠিক বাড়িতেই হয়তো পৌঁছে দিল চালক। তারপর?

অনেক দুপুরে চিরঞ্জীব বাড়ি ফিরতে জলধর ছুটে এল। 'কী যে গোলমাল বাঁধিয়েছ বাপু, কিছুই বুঝতে পারিনে। ঘুম ভেঙে ওঠার পর থেকেই বউমা কেবল হাসছেন। ওঁর কি হিস্টিরিয়ার ব্যামোটামো আছে?'

'হতে পারে।'

'আরে, কোথায় যাচ্ছো! শোনো—' ফিসফিস করে বললে জলধর, 'তুমি যে বলেছিলে ঠিক তাই ঘটেছে। একটু আগে কলকাতার সেই পাগল বাবুটিই এসেছিল এখানে। ওই যে গো বউমার রূপে যে পাগল হয়ে গেছে। বলছিলে না?'

'এসেছিল!' চমকে উঠল চিরঞ্জীব: 'কোথায়, কোথায় আছে?'

'আর কোথায় থাকবে। কোনো হোটেল-টোটেলে উঠেছে এতক্ষণ। গেট থেকেই ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। কে বলবে বাপু, পাগল লোক। আমাকে হেসে বলে কি, তুমি ভুল করছ। পত্রলেখা দেবী আমার স্ত্রী। চিরঞ্জীববাবু, আমাদের বন্ধু...'

'পত্রলেখা ব্যাপারটা জানতে পারেনি তো?'

'না। একে তো ওঁর শরীরের এই অবস্থা। এসব উৎপাত ওঁর সহ্য হবে কেন!'

'ঠিক আছে। গেটে ভালো করে লক্ষ্য রাখবে। আমার অবর্তমানে যেন কখনো বাড়িতে না পা দিতে পারে।'

'তা আর বলতে।'

চিন্তিত মুখে পত্রলেখার ঘরে ঢুকল চিরঞ্জীব। অনেক হাসির পর এখন ক্লান্ত হয়েছে সে।

গম্ভীর গলায় বললে চিরঞ্জীব: 'আচ্ছা কী এমন ঘটতে পারে, বলতে পারো? স্টেশন থেকে এই মাত্র আসছি। প্রভাতঅরুণবাবু তো আসেননি।'

পত্রলেখা প্রশ্নহীন চোখে চিরঞ্জীবের দিকে চেয়ে রইল।

'টেলিগ্রাম করবো?'

'জানি না। কেন আমাকে জিগ্যেস করছেন? কেন?'

'তোমার রাগ পড়েনি দেখছি।'

'রাগ! আমি বুঝতে পারছিনে চিরঞ্জীববাবু আপনি মানুষ না পাথর!'

'কী আশ্চর্য! একটা জিনিসও সহজভাবে নিতে পারো না পত্রলেখা। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বলে কী তোমার কিছু নেই।'

'স্পোর্টস! আপনার কাছে যা স্পোর্টস জানেন আর একজনের কাছে তা মৃত্যু। আপনাকে বিশ্বাস করবার এই প্রতিফলই আমি পেয়েছি।'

'ডোণ্ট বি সেণ্টিমেণ্টাল প্লীজ—আমি বুঝতে পারছিনে এতে করে তোমার কি হানি হল? তোমার নারীত্বকে চিনতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি। কুমারী জীবনে সে সুযোগ তুমি নিজের হাতে তুলে দিয়েছিলে। তারপরও যদি তোমার অমর্যাদা না হয়ে থাকে, তাহলে আজই বা হবে কেন। ভেবে দেখো ওদেশের মেয়েরা শিল্পীর মডেল হয়েছে কিন্তু তাদের পাতিব্রত্যের বিন্দুমাত্র অপযশ ঘটেনি। তোমার ঘরোয়া শরীরের আবেদন রইল একমাত্র তোমার স্বামীর কাছে, কিন্তু তোমার শরীরকে ঘরোয়া অভ্যাসের দৃষ্টি নিয়ে দেখবার লালসা আমার এতটুকু নেই। আমার চোখে বিজ্ঞানী কুতূহল ছাড়া কিছু নেই।'

'আপনি মিথ্যেবাদী, প্রবঞ্চক। আমি ঘৃণা করি আপনার এই বৈজ্ঞানিক ভড়ঙকে। আপনি জানেন না, এতে মেয়েদের অপমান, অসম্মান···কেন, কেন আপনি আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন।'

'এটা অনেকটা সামাজিক সংস্কারকে স্বীকার করে নেবার মতো। সমাজে থেকে একেবারে সমাজের বাইরে যাই কী করে বলো? জানো না আমাদের দেশের অনেক কৃতী বিজ্ঞানী সকাল সন্ধ্যেয় গায়ত্রী না জপে ল্যাবরেটরিতে যান না!'

'চুয়িংগাম চিবোনোর মতোই ব্যাপারটা আপনার কাছে খুব সহজ

মনে হচ্ছে তাই না? এতই যদি কৌতূহল তাহলে আমাকে বিয়ে করলেন না কেন?'

'ওই একই কারণে—' চিরঞ্জীব হাসল, 'তোমার ঘরোয়া অভ্যাসের মধ্যে তোমার আসল নারীত্বকে আবিষ্কার করতে পারতাম না বলে! স্বামী কথাটার মধ্যে কোনো জাদু নেই। পবিত্র বস্তু বলে তাকে শ্রদ্ধার ধণ্ডে তুলে রাখবারও কোনো অর্থ নেই। সেই কারণেই স্বামী মারা গেলে কোনো মেয়েই বিধবা থাকতে চায় না।'

'এটা কি আপনার সমাজতত্ত্বের ওপর নবতম গবেষণা!'

'ঠাট্টা করছ বুঝতে পারছি। তাহলে আর কথা চলে না।'

'দাঁড়ান যাবেন না।'

'বলো—' ফিরে দাঁড়াল চিরঞ্জীব।

'আমি আজ রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাবো। আপনি যেতে দেবেন কি না?'

'বেশ তো যাবে। আরো কয়েকদিন পরে। তুমি অসুস্থ পত্রলেখা।'

'এখানে থাকলে আমি সুস্থ হবো না। আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন।'

'তা হয় না পত্রলেখা। তোমাকে একলা ফিরে যেতে আমি কিছুতেই দিতে পারি না। তোমার দিক থেকেই কথাটা ভেবে বলছি। তোমার একলা ফেরা কি ভালো দেখাবে? বেশ তো আমি টেলিগ্রাম করছি। উত্তর আসুক আমিই তোমাকে পৌঁছে দেবো।'

পত্রলেখা স্থির নির্বাক বসে রইলো। কিছু একটা ভাববার প্রয়াস ছিল তার। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারছে না। বিরাট এক ভূমিকম্পের পর ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে আছে সে, চারিদিকে ধূসর মৌন শূন্যতা ছাড়া আর কিছু সংজ্ঞায় আসছে না তার। জীবনটা যেন ইয়ার্কি করেছে তার সঙ্গে। গ্রাম্য চাষাড়ে ইয়ার্কি।

প্রভাতঅরুণ আজো এল না। কিন্তু কেন এল না সে? বোধহয় এখন না এসেই বাঁচিয়েছে তাকে। আজ এই মুহূর্তে যদি এসে দাঁড়াত, চোখ তুলে চাইতে পারত না পত্রলেখা। গতরাত্রির অনিদ্রায় অবসন্ন ভারি চোখের পাতা আঠার মতো জড়িয়ে থাকতো। তাকে প্রস্তুত হবার সময় দিয়ে ভালো করেছে প্রভাতঅরুণ। কিন্তু, প্রস্তুত কী হতে পেরেছে সত্যিই! চিরঞ্জীবের ঠাট্টাটা যেন আর্তনাদের মতো কানের পর্দায় আওয়াজ করে চলেছে। এখানে,

হঠাৎ যেন পরিত্রাণের উপায় পেয়ে গেলো পত্রলেখা। টিপয়ে ছিল ধারালো ফলকাটা ছুরিটা। পেছন দিক থেকে শক্ত মুঠোয় তুলে নিলো। আর চিরঞ্জীবের বাহুপাশে বন্দী হবার সঙ্গেই ভয় পেয়ে ভয়কে দূর করবার মরিয়া জেদে বিপুল শক্তিতে চালিয়ে দিলো ছুরিটা ওর বুক লক্ষ্য করে। কাঁপছে পত্রলেখা। থরথরিয়ে উঠছে সর্বাংগ। আর সেই দুর্বলতাকে জয় করবার জন্যে অনন্যোপায় হয়ে কাপুরুষের মতো সর্বশক্তি জড়ো করে ঠেলে দিয়েছে তীক্ষ্ণ ছুরিটা। দৃঢ়মুষ্টি আল্‌গা হয়ে গেছে চিরঞ্জীবের। তীব্রকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো সে। আরো ভয় পেয়ে দেয়ালের গায়ে ঢলেপড়া ওর দেহটাকে পিষে মারবার আয়োজন করলো পত্রলেখা। ছুরিটা আমূল ঢুকে পড়েছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত ছুটেছে বুক থেকে, লাল তাজা রক্ত।

এদিকে চিৎকারের শব্দে সারা বাড়ি জেগে উঠেছে। জলধর ছুটে এলো, প্রভাতঅরুণ এলো। রক্ত-স্নাত চিরঞ্জীবের নির্জীব দেহটা তখনো আটকে আছে দেয়ালের গায়ে। আর বিকৃত ধূসর চোখে স্থির অকম্প পত্রলেখা। হঠাৎ ঝড়ের চেয়েও তীব্র তীক্ষ্ণ খন্‌ খন্‌ আওয়াজে হেসে উঠলো পত্রলেখা। দুলে দুলে গমকে গমকে ফুলে ফুলে উঠলো ওর শরীর।

পাথরের মতো নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলো জলধর আর প্রভাতঅরুণ। শুধু দাঁড়িয়ে রইলো।

এরপর কাহিনীর যবনিকা উঠলো বিচারকের এজলাসে।

পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো সহজ জটিলতাবিহীন মামলা। ডিফেন্সে ল-ইয়ারকে বাকচাতুর্য দেখিয়ে কোন কূটতর্কজাল বিস্তার করতে হয়নি। তার মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে চিরঞ্জীব যেন আগে থেকেই তার নথিপত্র ঠিক করে রেখেছিলো। ওয়ালটেয়ারে আসার পর থেকে চিরঞ্জীবের উদ্দেশ্য এত প্রকট যে সন্দেহের অপেক্ষা রাখে না। পরস্ত্রী পত্রলেখাকে নিজের স্ত্রী বলে প্রচার করার নোঙরামোতে চিরঞ্জীবের চরিত্রহীনতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জলধরের সাক্ষ্যই তার প্রকাশ। এমন কি প্রভাতঅরুণকে ব্যর্থ প্রণয়ী পাগল সাজিয়ে লাঞ্ছিত করা এবং স্ত্রীর অসুখের অজুহাত তুলে তাকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের মতলব হাঁসিল করার অপরাধীসুলভ উদ্দেশ্য ছিলো চিরঞ্জীবের। পাপের বেতন মৃত্যু।

এ ছাড়াও চিরঞ্জীবের সেলফ্‌ ঘেঁটে এলোমেলো কিছু কাগজগুচ্ছ পাওয়া গেলো। রাত্রির অবকাশে দু'তিনদিনকার অনুভূতি—অভিজ্ঞতার জমা খরচ লিখে রাখতো চিরঞ্জীব ওই দিনপঞ্জীতে। মৃত্যু তার একান্ত মনের সংগুপ্ত-

বিবরণকে তুলে ধরল দশজনের হাটে। মৃত্যুতে বিশেষ মানুষ নির্বিশেষ সর্বসাধারণ হয়ে পড়ে। ধারাবাহিকতার সঙ্গে দিনপঞ্জীর বিচার সম্ভব হলো না। অত্যন্ত উচ্ছৃংখল ভাবে সাজানো হ য ব র ল। কোনোটার তারিখ আছে, নেই আবার কোনোটায়। কখনো লিখতে লিখতে বর্তমানের তীর থেকে অতীতে সাঁতরে গেছে, কখনো ভবিষ্যতে। কার্যকারণ সূত্র হারিয়ে যায়। তবু, এ দলিল মূল্যবান এই জন্যে যে চিরঞ্জীব নামক একটি ব্যক্তিমানসের নিভৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে এখানে। একটি আধুনিক সমস্যা-পীড়িত মানুষের চিন্তা থেকে পাওয়া গেল—"আমার মা দার্জিলিঙের এক সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের মেয়ে। তাঁর শিক্ষা ঘটেছে মিশনারিদের কাছে। মা গাউন পরতেন। স্কার্ট পরতেন। শ্যামপু ঘষে ঘষে শুনেছি তাঁর বব্‌ড চুল পিঙ্গল রেশমের মতো হয়ে উঠেছিলো। রঙবেরঙের ফিতে দুলত চুলে। চোখের মণিদুটো সমুদ্রাভ না হওয়ার জন্যে প্রায়ই আফশোস করতেন মা। কারণ ওই চোখ দুটোর জন্যেই মা পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গিনী হতে পারেননি। বিয়ের পর মা এলেন ওয়ালটেয়ারে। পাহাড়দেখা চোখ সমুদ্র-বিস্ময়ে উচ্চকিত হয়ে উঠলো।

একদিনের পঞ্জীতে লিখেছে চিরঞ্জীব তার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি—"আমি যখন জন্মালাম, জানি না মা কতখানি খুশি হয়েছিলেন। নার্সারিতে মাদ্রাজী আয়া আর খ্রীস্টান নার্সের তত্ত্বাবধানে আমার শৈশব কাটলো। মার এ সময়কার স্মৃতি আমার মনে নেই। তারপর শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণ ঘটলো আমার। জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মার সঙ্গে যখন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সম্ভব হলো তখন প্রথম আফশোস শুনলাম মার কণ্ঠে, এ ছেলেটা এত কালো হলো কেন! পরেও দেখেছি মার স্নেহ, মার বাৎসল্য বারবার প্রতিহত হয়েছে ওই একটি দেয়ালের গায়ে। আমার কালোত্ব তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে। মার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ওই একটি দুশ্চিন্তাই বোধহয় তাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল—আমি কালো হলাম কেনো, আমি কালো হলাম কেনো! পরে কতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি, নিজেকে কালো ভাবতে পারিনি। হয়তো মার মতো শাদা ছিল না আমার চামড়া, হয়তো শাদার সঙ্গে কালোর ভাগটা কিছু বেশি পরিমাণেই মিশে গিয়েছিলো।

আর-একদিনের রোজনামচায় লেখা: "এই কালোফোবিয়া থেকে আমার মানসিক কাঠামোটাই কেমন ভেঙেচুরে অন্য ছাঁদে গড়ে উঠলো। চামড়ার যে রঙটার পরে মা এতো গুরুত্ব দিতেন সেটা কি এক ধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ততা, নাকি

ওয়ালটেয়ারে, সবাই জানে সে চিরঞ্জীবের স্ত্রী। এ জানাটার কোনো গুরুত্ব নেই চিরঞ্জীবের কাছে। এ তার নিষ্ঠুর রসিকতা। কিন্তু এ রসিকতার পরিণাম জানে না চিরঞ্জীব। জানে না কি দাম দিয়ে এই রসিকতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবে পত্রলেখা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার দিকটার কথা কি একবারও ভেবে দেখল না চিরঞ্জীব? ভেবে দেখল না; কী অর্থ হতে পারে এই মিথ্যা সম্পর্ক গড়বার পিছনে। যদি প্রভাতঅরুণের কানে এ খবর যায়। সে কী আলোকে নেবে এটাকে? ছি ছি! সন্দেহ—অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি কল্পনা করে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে পত্রলেখার। যদি সে বিশ্বাস করে বসে ওর অবর্তমানে অবিশ্বাসী হয়েছে পত্রলেখা। কুমারী জীবনে যা পারেনি বিয়ের পাসপোর্ট পেয়ে তাই করেছে সে, তাহলে—কী বলবার থাকবে পত্রলেখার, কিসের জোরে সাফাই গাইবে? যদি চিরঞ্জীবই বলে বসে পত্রলেখাই এর জন্যে দায়ী, ওর দুর্বলতার জন্য চিরঞ্জীবকে এ পথ বেছে নিতে হয়েছে—তাহলে, তাহলেই-বা কী করে অস্বীকার করবে পত্রলেখা!

না। আর ভাবতে পারে না পত্রলেখা। যা হবার হোক। সে আর পারছে না। কাঁদতে পারলে বাঁচতো একটু। কিন্তু কান্না পায় না। কাঁদবার কারণটার চেয়ে ভবিষ্যতের সর্বধ্বংসী অমঙ্গলের চেহারাটার কল্পনা করেই সর্বশরীর হিম-বরফ হয়ে যায় পত্রলেখার। একটা রাত্রির ব্যবধানে তার জীবনের আদলই যেন বদলে যেতে বসেছে। এ জীবন যেন তার নয়—তার মুঠো থেকে নিজের জীবনটাই আলগা হয়ে গেছে। যেন অপরের অনুগ্রহে তার জীবন নির্ভর করছে।

আহত শ্বাপদের মতো জ্বলতে লাগল ওর চোখের তারা। একটু পরে আবার সমস্ত শরীরটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল। হাতেপায়ে কেমন একটা খিঁচুনি। মনে হল অসভ্যদেশের কোনো এক নির্যাতনকারী তার মাথার খুলিটা ফুটো করে তার মধ্যে হাওয়ার নল চালিয়ে দিয়েছে। ভীষণ শূন্য মনে হচ্ছে মগজের ভেতরটা। কেমন সুড়সুড় করছে। অধরোষ্ঠ দাঁত দিয়ে চেপে নিজেকে সামলাবার চেষ্টায় ক্লান্ত ফতুর হয়ে গেল পত্রলেখা। মাথার ভেতর থেকে হাওয়াটা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চালু হয়েছে, সারা শরীর দুমড়ে মুচড়ে একশা হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অশ্রান্ত হাসির হিল্লোল দুপুরের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিল।

আরো কয়েকটা দিন কেটে গেলো। না এল প্রভাতঅরুণ, না টেলিগ্রাম।

দুশ্চিন্তায় আশংকায় পত্রলেখার সমস্ত শরীর যেন ঝিমিয়ে এলো। মনে হলো একটা কিছু ঘটেছে। বড় রকমের ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে চিরঞ্জীব। প্রভাতঅরুণ আর তার মধ্যে যেন একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে। আর এসব ঘটনার জন্যে একা চিরঞ্জীব দায়ী।

চিরঞ্জীব সব পারে। যে পরস্ত্রীকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারে, তার কিছুই আটকায় না। কিন্তু, তাই যদি হয় তাহলে কী হবে পত্রলেখার! তার চোখের সামনে বিশ্বসংসার লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ির মুখ, মা-বাবার মুখ, পুরু অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে যায় বুঝি। তার অস্তিত্ব কেবল ধিকিধিকি করে নিষ্ফল জ্বলে। প্রভাতঅরুণের পৌঁছনোর সময় যত বিলম্বিত হয় ততই যেন ক্লান্ত ভীত হয় পত্রলেখা। মনে হচ্ছে জোর ফুরিয়ে যাবে, কুৎসিত অন্ধকারটাই তাকে গ্রাস করে ফেলবে।

এ'কদিন চিরঞ্জীবেরও যেন বিশ্রাম নেই। ভোর হতেই বেরিয়ে যায়। সারাদিন কী করে, কে জানে। ফেরে অনেক রাত্রে।

জলধর রোজই খবর দেয়, 'সেই কোলকাতার পাগলাবাবুটি আজো এসেছিলো। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তুমি যদি ওর চেহারাটা দেখতে না, কষ্ট হতো। জামাকাপড় ময়লা। চুল উস্কোখুস্কো, আর চোখের চাউনি পর্যন্ত ঘোলাটে। করুণ গলায় যখন বলে, বউমার সঙ্গে দেখা করব—তখন সত্যিই কষ্ট হয়।'

চিরঞ্জীব ওকে সতর্ক করে দিয়ে ঘরে চলে যায়। ঘরে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই খুলতে খুলতে দীর্ঘদিন পর নিজের শরীরের দিকে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল চিরঞ্জীব। কপালে কুটিল কয়েকটি রেখা, চোখের কোলে গভীর আঁকজোঁক, আর কানের গোড়ায় কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে। তার মানসিক চিন্তাজগতের বাহ্যিক রূপ এমন কুদর্শন হতে পারে, কল্পনা ছিল না।

কিন্তু…অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে সে, আর ফেরা যায় না। সৎ-অসৎ পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব নেই তার। একযুগের এক পাপ পরযুগে পুণ্য হয়ে ফুটে ওঠে। কুশ্রীতা যুগসীমাকে অতিক্রম করে—সৌন্দর্যের সূর্যমুখী হয়ে বিকশিত হয়। অস্তিধর্মই বড় কথা। অস্তিবাদের সূত্রটা জানাটাই সারবস্তু। মানব-সংসারটা চলেছে আধোঘুমে আধোজাগরণের মধ্যে। প্রতি পদক্ষেপে

অতন্দ্র জিজ্ঞাসা নেই কারুর। যা কিছু মূল্যবোধ—শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, দয়া ক্ষমা—বাস্তবের কষ্টিপাথরে তাদের যাচাই হয়নি। মানুষ জেনে এসেছে 'এই হয়'—অতএব গড্ডলিকাস্রোতে ভেসে যাও। হঠাৎ এক উজ্জ্বল প্রভাতে কোনো মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে: সব ঝুটা হ্যায়। যা কিছু সামাজিক মূল্যবোধ তা কেবল বিশ্বাসের জোরে টিকে আছে, যুক্তিতে নয়। এইসব মূল্যবোধ ছাড়াও সমাজ কল্পনা করো—কল্পনা করো এর চেয়েও বেঁচে থাকা, মূল্যবোধ অতিরিক্ত মানবধর্ম।

মেয়েলী সমস্যাটাও এই বিধানের মধ্যে পড়ে। সতীত্ব-অসতীত্বের হিসেব তো মনগড়া। দৈহিক শুচিতার প্রশ্নই যদি বড় করে দেখো তাহলে স্বামী-অস্বামীর প্রচলিত বোধটাই বাজে। একদিনের সন্ধ্যায় যে পুরুষটি স্বামীর তকমা এঁটে আবির্ভূত হলেন পোশাকে-আশাকে আঁটোসাঁটো কন্যার তাঁর সামনে স্বপ্রকাশ হওয়ার মধ্যে কোথাও পবিত্রতা নেই। ফুলশয্যার রাত্রে সন্থ-পরিচিত পুরুষের সামনে নির্দ্বিধায় নিজেকে মেলে ধরার মধ্যে সতীপনা নেই। তিনশ-পঁয়ষট্টির মধ্যে কদিনই বা স্বেচ্ছায় মেয়েরা আত্মদান করে, অন্যপরবশ হয়ে অন্যের কামনার মধ্যে নিজেকে বলিদেয়ার ব্যাপারটা কোন নীতিতে সমর্থন করা যায়! অথচ পতিধর্মের কেতাবে একেই নারীর পরমনীতি বলে ধ্যান করা হয়েছে। হৃদয়হীন স্থূল শরীর-সম্বন্ধ।

সতীত্বের কথাই যদি ওঠে তাহলে ট্রামে বাসে প্রতি মিনিটে মেয়েদের সতীত্ব বিনষ্ট হচ্ছে। স্বামীগর্বে গর্বিত নারীরও চোখ ঝলসে ওঠে সহযাত্রী কোনো পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখলে। সতীত্বের নিয়মে যে চোখ সেই পুরুষকে দেখে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, সেই ব্যাভিচারী চোখকে নষ্ট করে দেয়াই রীতি। তাহলে পাপের পচন থেকে অন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি রক্ষা পায়! নইলে, রাত্রে স্বামীর আশ্লেষে সে সেই ক্ষণিক দেখা পুরুষশ্রেষ্ঠরই প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করবে। মেয়েদের কাছে স্বামী শুধু দেহধারী একটি ভাবমূর্তি বিশেষ।

প্রভাতঅরুণ পত্রলেখার স্বামী, কিন্তু অভিধা অর্থে। যার সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে কিছুমাত্র কাঁপনি ধরে না তার, পোশাক বদলাতে সংকোচ নেই। ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তে স্বামীর কোন উক্তি যার অশোভন মনে হয় না।

সকালে উঠে কেউ মিথ্যা টেলিগ্রামের কাগজ হাতে নিয়ে এসে ওকে

যদি জানায়: এইমাত্র খবর এসেছে পারনিসাস ম্যালেরিয়ায় একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গেছে প্রভাতঅরুণ! তাহলে? কী করে পত্রলেখা? কাঁদবে। তারপর কান্না যখন থামবে তখন, তখন কি চিরঞ্জীবের বিবাহ প্রস্তাব সোজাসুজি নাকোচ করে দিতে পারবে সে। মৃত আইডিয়ার চেয়ে জীবন্ত চিরঞ্জীবকেই অনেক বেশি কাম্য মনে হবে না তার?

কতক্ষণ এমন ভেবে চলত চিরঞ্জীব কে জানে। জলধর খাবারের তাগিদ না করলে ভাবনার উর্ণনাভ জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারত না।

পরদিন ভোরে রোজকার মতো বেরিয়ে পড়বে চিরঞ্জীব, গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, হঠাৎ আলুথালু বেশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রভাতঅরুণ কোথা থেকে ছুটে এল গাড়ির সামনে। ওকে দেখে একটু নার্ভাস বোধ করছিল চিরঞ্জীব, কিন্তু কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর তৎপরতায় ক্ষিপ্র হয়ে উঠল সে।

গাড়ি থেকে নেমেই জড়িয়ে ধরল প্রভাতঅরুণকে।

'আরে, আপনি! এ কী বেশবাস! কখন এলেন। বাঃ, এতদিন চুপচাপ! আসুন—আসুন।'

প্রভাতঅরুণকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে ওকে নিয়ে একেবারে ড্রয়িংরুমে বসালো চিরঞ্জীব। অনর্গল কথা বলে গেল। পত্রলেখা কিরকম ব্যস্ত হয়ে পড়ে হঠাৎ অসুখ বাধিয়ে বসেছে। ডাক্তার বলছে: 'হিস্টিরিয়া। ওদের বংশে এই ব্যারাম ছিল নাকি মশায়? কী মুশকিল যে হয়েছে! চেনা মুখ দেখলেই ওর ব্যাধির উপসর্গ বাড়ছে। ডাক্তার একেবারে চেনা লোকদের ওর কাছে যেতে বারণ করে দিয়েছেন। মাদ্রাজী আয়া রেখেছি। সেই ওর দেখাশোনা করে…। আপনি দেখা করবেন ওর সঙ্গে? বেশ তো। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ যদি শুনতে হয়—আরো কয়েকদিন তিনি স্টাডি করতে চান পেসেণ্টকে। তিনি একজন সাইকট্রিস্ট। দিন পনেরো অবসার্ভ করে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। অবশ্য ইতিমধ্যে পেসেণ্ট যদি ডিস্টারবড না হন। বেশ তো। এসে পড়েছেন যখন ব্যস্ত কী। আমি না হয় ডাক্তারকে দিয়ে আপনার আসার খবর আস্তে আস্তে ওর কাছে ভাঙতে বলব। পেসেণ্টের রিঅ্যাকসেন দেখে যথোচিত কাজ করা যাবে তখ ।

প্রভাতঅরুণ তার দুর্দশার কথা বললে চিরঞ্জীবকে। তার কথা মতো

নির্দিষ্ট দিনেই স্টেশন থেকে চিরঞ্জীবের বাড়িতে পৌঁছেছিল সে। কিন্তু চিরঞ্জীব বাড়িতে ছিল না। বাড়ির চাকরেরা কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করেছিল তার সঙ্গে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না পত্রলেখা আমার স্ত্রী আর চিরঞ্জীব তাদের বন্ধু। তারা আমাকে হয় মাথা খারাপ না হয় পাগল ভেবে গেট থেকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনদিন ধরে দেখা না পেয়ে আজ শেষরাত্রি থেকেই ওর বাড়ির সামনে নীচে বসেছিল। চিরঞ্জীবের গাড়ি দেখেই ছুটে এসেছে সে।

সব শুনে চিরঞ্জীব বিস্ময়ের ভান করে তাকিয়ে রইল। তারপর কি একটা মনে পড়ে যাওয়ায় হো হো করে হেসে উঠল, 'একে বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। চাকরদের দোষ নেই মশায়। আমার মা বেঁচে ছিলেন তখন, এক দুপুরবেলায় এই রকম এক অজানা অচেনা পাগলা লোক ঢুকে পড়ে সোজা বাড়িতে। বলে, সে নাকি মায়ের মামা! তারপর? পরে জানা গেল লোকটা জেল ফেরত দাগী আসামী। সেই থেকে বুঝলেন না, চাকররা ভীষণ কড়া। অবশ্য ওদের বুদ্ধির দোষ। পত্রলেখাকেও তো একবার খবর দিতে পারত। যাকগে। যা হয়ে গেছে, আমাকে দোষী করবেন না মশায়।'

ড্রয়িংরুমে শয্যা রচনা হল চিরঞ্জীবের। দিন কয়েক গায়ের ধকল ভাঙুক প্রভাতঅরুণ। দেখাশুনা করুক। পাহাড়, সমুদ্র। সীমাচলম্। গাইড, ফিলসফার চিরঞ্জীব। চোখের ভোজে মনের অনেক ক্ষোভ জুড়াবার প্রশ্রয় পায়। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তীসহ বর্ণনা করবার ক্ষমতা চিরঞ্জীবের দুর্লভ। এমন ভাবে সে অতীতকে তুলে ধরছে যেন চোখের সামনে বাস্তব হয়ে ফুটে উঠছে প্রভাতঅরুণের।

সারাদিনের দেখার উত্তেজনার পর যখন ক্লান্ত রাত্রি ড্রয়িংরুমে ঘনিয়ে আসে উন্মনা হয়ে ওঠে প্রভাতঅরুণ। নিজেকে মনে হয় অভিশাপগ্রস্ত যক্ষের মতো। সমুদ্রের কলভাষে চিত্ত কোলাহল করে ওঠে। তরঙ্গের শীর্ষে ফুটে ওঠে একটি মুখের প্রদীপ। সে-মুখ পত্রলেখার। তিনটে দিনের আয়ু ক্ষয়ে গেল। নিশ্ছিদ্র নির্জনতা দ্বীপের মতো। একাকী। বিরহী।

একবারও কি দেখা হবে না পত্রলেখার সঙ্গে? রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে মনের কোন নকসিকাঁথা বুনে চলেচে সে? বিয়ের সৌরভ ফুরোতে না ফুরোতেই সে কেন অতীত রোমন্থনের মধ্যে তার বর্তমানের সুখকে খরচ করে

দিল! ভেতরের দিকে কোন ঘরে শুয়েছে পত্রলেখা? নিঃশব্দ পায়ে একটিবার যদি ওর ঘুমন্ত মুখটা দেখে আসতে পারে! কিন্তু সংকল্পের জোর ফুরিয়ে যায়। ডাক্তারের বারণ তাকে নিরস্ত করে। আর কটা দিন পরে রোগমুক্ত পত্রলেখাকে পাবে নিশ্চয়ই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল প্রভাতঅরুণ।

সেদিন বিকেল থেকে আবহাওয়া দপ্তর বিপজ্জনক রিপোর্ট দিচ্ছে। সারা দিন সোঁ সোঁ হাওয়ার কশাঘাত। লাইটহাউস থেকে বিপদসূচক লাল আলোর নিশানা মাঝদরিয়ার জাহাজকে সতর্ক করছে। সন্ধ্যেবেলায় হাওয়ার বেগ বাড়ল, তীক্ষ্ণ শরের মতো বালিকণা বিঁধতে লাগলো দ্রুত বাড়িফেরা পথচারীকে। আকাশ কালো, সমুদ্র কালো। মহাপ্রলয়ের ধ্বনি পৃথিবীকে বোবা করে দিয়েছে। তারপর বৃষ্টি শুরু হলো, এলোমেলো, ছন্নছাড়া, সারা বিশ্ব দুর্যোগের তিমিরে হারিয়ে গেলো। দুরন্ত পবন ক্ষণেক্ষণে কাঁপিয়ে দিতে লাগলো ঘরের দরজা জানলা। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে ঝড়ের প্রচণ্ডতা বাড়লো। ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মতো গর্জায় সমুদ্র। লক্ষ লক্ষ মদমত্ত হস্তী যেন বেলাভূমির ওপর মল্লক্রীড়া শুরু করেছে।

খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে প্রভাতঅরুণকে শুভরাত্রি জানিয়ে চিরঞ্জীব ফিরে এলো নিজের ঘরে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হল।

ঘুম নেই চিরঞ্জীবের চোখে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করল সে। তবে কী এটা তার জীবনে প্রলয় রাত্রির সূচনা? কে বলতে পারে? আজ রাত্রেই হয়তো পৃথিবীর শেষ। শেষ—কথাটা মন্ত্রোচ্চারণের মতো মৃদুস্বরে উচ্চারণ করল চিরঞ্জীব। যাক পৃথিবী রেণু রেণু হয়ে। নোয়ার তরীতে আজকের লোকের স্থান হবে না। চিরঞ্জীব থাকবে না, থাকবে না পত্রলেখা, প্রভাতঅরুণও নয়। আগামীযুগের মানুষ এই ধ্বংসস্তূপের কাঠামো থেকে কী খুঁজে পাবে? নর-কঙ্কাল, করোটি। সেদিনের কোনো চিন্তা কোনো জাদুঘরে জীবিতের কৌতূহল মেটাবে না।

কি চেয়েছিল চিরঞ্জীব, কী জানতে চেয়েছিল? কী পেলো সে জীবনের কাছ থেকে। আজকের কোনো অনুভূতি সেদিন কেউ ধরে রাখবে না মৃৎপানপাত্রে। সব মিথ্যা, সব ঝুট। তার আবিষ্কারের পাত্রে কোন সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো? শরীরধর্মকে জানতে চেয়েছিলো, বুঝতে চেয়েছিলো সে।